"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করুন

"ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ও উৎকর্ষের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। কিন্তু দেশের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ যেমন অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে চাইছেন, তেমনই সাংস্কৃতিক জগৎকেও তাঁরা এক বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভরিয়ে তুলতে চাইছেন। দেশের চিন্তাশীল নাগরিক মাত্রই সচেতন আছেন যে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে—যেমন চলচ্চিত্র, নাটক, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে—বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে কয়েকটি সাধারণ মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শনের নামে যে কার্যাবলী সংগঠিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। খুন-জখম, অপরাধ প্রবণতা, অশ্লীলতা, বিকৃত মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের সুসংগঠিত প্রচার চলেছে। সমাজ-জীবনে এই বিকৃত সাংস্কৃতিক প্রচারের ফলাফল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী—বিশেষ করে যুব সমাজের নৈতিক জীবনের ওপর।

"কোনো দায়িত্বশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। আমরা পশ্চিমবাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং এই রাজ্যের সচেতন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিমুখী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাই—আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন এবং সংস্কৃতির নামে এই সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগী হোন।"

—**মুখ্যমন্ত্রী**, পশ্চিমবঙ্গ

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ১৩১১৪ / ৭৭

একের পর এক

একের পর তো এক হয় না, দুই হয়। কথাটা সত্যি।

সি. এম. ডি. এ-র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একটা কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় কাজ শেষ করতে হয়।

যে কাজ এবার শেষ হল,—অর্থাৎ বড় রকমের কাজ, সেটা হল, বালিগঞ্জ-কসবা সেতু। অবশ্য এর আগে যে কোনও কাজ শেষ হয় নি তা নয়। হাওড়া সাবওয়ে, চেতলা, কালীঘাট আর অরবিন্দ সেতু, ব্রাবোর্ণ রোডের উড়াল পুল নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে। এবার শেষ হল বালিগঞ্জ-কসবা সেতুটি।

এতে লোকের যে কি উপকার হবে সেটা ভাল করে বলতে পারবেন যাঁরা এর আগে লেভেল ক্রসিং-এর শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ বাস, ট্যাক্সী, রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে দুদিকে, অফিস যেতে বা বাড়ি ফিরতে দেরী হচ্ছে। মেজাজ তিরিক্ষি। অথবা যখন সময় সংক্ষেপ করবার জন্য বন্ধ লেভেল ক্রসিং-এর বাধা উপেক্ষা করে হাজার হাজার লোক ঝুঁকি নিয়ে এপার ওপার করার চেষ্টা করছেন এবং দ্রুতগতি ইলেকট্রিক ট্রেণের জন্য দুর্ঘটনায় পড়ছেন।

আরও আছে। এদিকে বালিগঞ্জ-জমজমাট, ওদিকে কসবার ভবিষ্যৎ কি অন্ধকারে থাকতে পারে? বালিগঞ্জ-কসবা সেতুটি সেই রকম একটা সেতুবন্ধন। এর ফলে কসবা বাড়বে, ভাল হবে। এমনকি (আপনারা অনেকেই জানেন না) কসবার পেছনে একটা নতুন উপনগরী স্থাপিত হতে চলেছে। একদিন গিয়ে দেখবেন সল্ট লেক থেকে গড়িয়া পর্যন্ত ইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটন রাস্তাটি রূপ নিচ্ছে।

প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ হল বটে, অনেক দিন সময় লাগলো তাও সত্যি, কিন্তু আজ যখন বালীগঞ্জ-কসবা সেতুর কাজ শেষ, তখন ভাববেন, একের পর এক নয়, একের পর দুই।

সি. এম. ডি. এ-র দু-নম্বর কাজ কোনটা শেষ হবে? এসপ্লানেডে বিরাট বাস টার্মিনাস? অক্ল্যাণ্ড স্কোয়ারে বিরাট জলাধার? সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুরূপ? গার্ডেনরীচের বিরাট জল প্রকল্প? নাকি হাওড়ায়? ইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটন বাইপাস? নাকি বারাকপুর থেকে কল্যাণী পর্যন্ত এক্সপ্রেস-ওয়ে?

আরও আছে। নতুন নির্দেশে বস্তী জীবনে আসছে নতুন স্বাচ্ছন্দ্য। বহু জায়গায় জলনিকাশী ব্যবস্থা, বহু ক্ষেত্রে কলকাতার উন্নতি। সবই হবে। একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন, তিনের পর চার। আপনার কাছে সি. এম. ডি. এ-র প্রশ্ন অঙ্ক নিয়ে নয়। এক, দুই, তিন, চার নয়। প্রশ্নটা কলকাতাকে নিয়ে। ভালবাসার শহর আর একটু ভাল হতে পারে না?

উত্তরসূরি ২৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৮৪

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য প্রচ্ছদ : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

দপ্তর : ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড কলিকাতা ৫০

স্কেচ : রবীন মণ্ডল

গুস্তভ ফ্লবেয়ার

অমলেন্দ্র ভাদুড়ী

প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক হেনরী জেমস্ ফ্লবেয়ার সম্বন্ধে বলেছেন, "He was born a novelist, grew up, lived, died a novelist, breathing, feeling, thinking, speaking, performing every operation of life only as that votary, and this though his production was to be small in amout and though it constituted all his diligencc,"[১] ফ্লবেয়ার ১৮২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তার মৃত্যু হয় ১৮৮০ সালে। সারাজীবন উপন্যাস রচনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেও তিনি মাত্র পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন, তার কোনটারই কলেবর খুব বৃহৎ বলা চলে না, এবং তার মধ্যে সর্বশেষেরটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই পাঁচটি উপন্যাস ছাড়া তিনটি বড় গল্প বা ইংরাজীতে যাকে নভেলেট্ বলে তার একটি সমষ্টি-গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরি বালজাক্ তাঁর চেয়ে অনেক অধিক বয়সে উপন্যাস রচনা সুরু করে একান্ন বছর বয়সে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মাত্র কুড়ি বছরে যে বিপুল উপন্যাস-সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ফ্লবেয়ার প্রাক-যৌবন কাল থেকে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েও প্রায় চল্লিশ বছরের সাহিত্য জীবনে তার এক ভগ্নাংশ মাত্র রচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর আর একজন বিখ্যাত পূর্বসূরি ডুমার তুলনায় ফ্লবেয়ারের সাহিত্যসৃষ্টি এক চুতুর্থাংশ মাত্র। ফ্লবেয়ারের সমসাময়িক, তাঁর বিশিষ্ট সহানুভূতিশীলা বান্ধবী

ও বিশ্বাসের পাত্রী জর্জ স্যাঁদ নব্বই খানা উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বিদগ্ধ সমালোচকদের মতে ফ্লবেয়ার যদি একটি মাত্র উপন্যাস তাঁর ম্যাদাম বোভারী বইখানি লিখে যেতেন অন্য আর কোন বই না লিখে, তবু বিশ্বসাহিত্যে তাঁর স্থান গৌরবের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত, যেমন এখনও আছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ম্যাদাম বোভারী তাঁকে যে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা দান করেছে তার পরবর্তী পাঁচটি রচনা সেই গৌরব ও প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে বটে কিন্তু উজ্জ্বলতর করতে পারে নি। তার সৃষ্ট ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মাত্র তিনটির উপরই তাঁর চিরস্মরণীয় যশ নির্ভরশীল এবং এই তিনটির জন্যই তিনি 'novelist's novelist' বলে খ্যাত। এই তিনটি হ'ল ম্যাদাম বোভারী, দি সেন্টিমেণ্ট্যাল এডুকেশন ও থ্রী টেলস। এ ছাড়া তিনি অতীত ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে লিখেছিলেন দুটি উপন্যাস সালাঁবো ও টেম্পটেশন্ অফ্ সেণ্ট এনথনি এবং নিম্নশ্রেণীর বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ফরাসী সমাজের প্রতি তার ব্যাঙ্গাত্মক অসমাপ্ত গ্রন্থ বুভার এ পেকুশে।

বিশ্বসাহিত্য ফ্লবেয়ার যে উচ্চ আসনে সমাদৃত হয়ে আছেন তা মুখ্যতঃ ম্যাদাম বোভারীর রচয়িতা হিসাবে এবং এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে শুধু যে তিনি প্রকৃত আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টা কেবল তাই নয়, এই উপন্যাসের দৃষ্টান্তে তিনি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস-রচয়িতাদের সর্বজনগ্রাহ্য পথ-প্রদর্শক। বিখ্যাত উপন্যাস-সমালোচক পার্সি লুব্বক বর্তমান যুগের অন্যতম সমালোচন-গ্রন্থ The Craft of Fiction-র প্রারম্ভিক অধ্যায়ে ম্যাদাম বোভারী-র রচনাশৈলীর বিস্তৃত আলোচনা করে এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে লিখেছেন, "The leading notions that are to be followed are already laid down in it, and I shall have nothing more to say that is not in some sense an extension and an amplification of hints to be found in Madame Bovary"[২] বাস্তবের কঠোর বিরুদ্ধ পরিবেশে রোমান্টিক আবেশাশ্রিত মানসের নিগ্রহ ও পরাভবের এমন সজীব, সূক্ষ্ম ও সুসঙ্গত চিত্র এই বইখানিতে চিত্রিত হয়েছে যে তদানীন্তন ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদ মহলে এই ভাবধারা 'bovarism' বলে প্রসার লাভ করেছিল।

অপূর্ব রচনাশৈলী ও শিল্পসৃষ্টিতে অসামান্য শ্রমনিষ্ঠার অধিকারী হয়েও যে

মাত্র এই কয়েকখানি গ্রন্থ ফ্লবেয়ার আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন এবং এর বেশী যে দেন নি এই বিষয়টিই তাঁর প্রতিভা। উপলব্ধির চাবিকাঠি বলা যেতে পারে অথচ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতুলতার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির অভাব তাঁর জীবনে কখনই ছিল না। ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি অঞ্চলের রুআঁ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাবান স্বচ্ছল সার্জেনের দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর দাদাও রুআঁ হাসপাতালের সার্জেন ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর হাসপাতালে পিতার পদ লাভ ক'রে বরাবরের জন্য সংসার থেকে আলাদা হয়ে যান।

চব্বিশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন বুর্জোয়া সমাজের মানদণ্ড অনুযায়ী সেই আয়ের পরিমাণ স্বচ্ছল জীবন যাত্রার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পুত্রের প্রতি সতত যত্নবতী স্নেহশীলা মা ও পরম স্নেহের পাত্রী এক ছোট বোন ছাড়া সংসারে তাঁর আর কেউ ছিল না। পিতার মৃত্যুর মাত্র দু'মাস পরে তাঁর বড় আদরের বোন সন্তান-প্রসবের সময় মারা যায়। তার বাবা রুআঁ থেকে অদূরে ক্রোয়াসেসতে সে-ন্ নদীর তীরে যে সুপরিসর গৃহ নির্মাণ করেছিলেন ফ্লবেয়ার কখনও সখনও ছাড়া সেই গৃহেই সুখে শান্তিতে বাস করতেন এবং অবিচল অধ্যয়ন ও সাহিত্যরচনায় আত্ম-নিয়োগ করতেন। তাঁর এই সাহিত্যসাধনায় যে কোন রকম বাধা তাঁর বিশেষ বিরক্তি উৎপাদন করত। ক্রোয়াসেসের সেই দোতলা বাড়ীর চারিদিকের পরিবেশ শান্ত ও নীরব, অদূরবর্তী সে-নের বুকে নৌকার দাঁড়ের শব্দ সেই নীরবতাকে আরও ঘনীভূত করত। সেই বাড়ীর ছাদ থেকে দেখা যেত মন্দগতিতে অপস্রিয়মান নৌকো, বাতাসে প্রসারিতবক্ষ পালগুলি। মাত্র বার দুই দূরদেশে ভ্রমণ ও পরবর্তী জীবনে বছরে অন্ততঃ মসাখানেকের জন্য প্যারী-অবস্থান ছাড়া প্রায় মানবসম্পর্কের আলোড়ন-বর্জিত এই শান্ত নীরব পরিবেশ তাঁর সাহিত্যসাধনার আত্মাহুতি ক্ষেত্র ছিল। তাই সাহিত্য সমাজে তাঁর নাম ছিল 'hermit of Croisset' বলে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সাধনানিষ্ঠ ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত প্রায় চল্লিশ বছরের সাহিত্য জীবন, তিনি এই গৃহেই ব্যাপক অধ্যয়ন ও উপন্যাস রচনার নিগ-ব্রতপালনের মতো উদ্‌যাপন করেছিলেন। তিনি সারাজীবন ছিলেন অবিবাহিত।

স্বভাবতই তার এই শৃঙ্খলাবদ্ধ একান্তিক জীবনধারায় বহুমুখী অভিজ্ঞতার

পরিসর বিস্তৃত ছিল না। তাঁর জীবনে মাত্র তিনটি ঘটনার প্রভাব গভীর ও সুদূরপ্রসারী বলে লক্ষিত হয়। মত্রে পনর বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে সমুদ্রতটের গ্রীষ্মাবাস একটি গ্রামীণ হোটেলে অবস্থানকালে, তাঁর চেয়ে এগার বছরের বড়, একটি সন্তানের জননী, বিবাহিতা এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়; ও প্রচুর বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও সেই রমণীর প্রতি তিনি এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আকর্ষণ ক্রমে গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হয়, এবং চিরজীবন সম্পূর্ণ অচরিতার্থ থেকে গেলেও সে প্রেমের প্রভাব থেকে তিনি কোনদিন মুক্তি-লাভ করেন নি; শুধু তাই নয়, এই প্রেম তাঁর জীবন-দৃষ্টি ও দর্শনকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছিল। এই মহিলা এলিজা স্লেসিঙ্গার তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি সেন্টিমেণ্টাল এডুকেশনের' অন্যতম নারী-চরিত্র ম্যাদাম আর্নুর বাস্তব প্রতিলিপি। দ্বিতীয় ঘটনা, মার্সাই বন্দরে একদিন সমুদ্রস্নান থেকে হোটেলে ফিরে প্রাঙ্গনে উপবিষ্টা প্রবাসী স্বামীর আগমন প্রতীক্ষমানা এক রমণীর সঙ্গে সেই হোটেলের একই প্রকোষ্ঠে সারাদিন যাপন। (তাঁর মৃত্যুর আগে অপ্রকাশিত রচনা 'নভেম্বর' এই ঘটনার উপর আশ্রিত)। তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর। তৃতীয় ঘটনা, প্যারিসের সংস্কৃতি-সমাজে স্বনামধন্যা স্ত্রী কবি লুইস কোলের সঙ্গে প্রণয়। কোলের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক, তার পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ নয় বছর ছিল। পরে এই সম্পর্ক তিনি নিজেই ছিন্ন করেন। বলা হয় যে ফ্লবেয়ারের দিক থেকে এই প্রণয় সম্পর্কের সত্যিকার সজীবতা মাত্র নয় মাস স্থায়ী ছিল। তার পর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তিনি প্রকারান্তরে সুস্থ স্বাভাবিক, সুসম জীবনকেই অস্বীকার করেন। "Without the phanton of Trouville he might very well have settled down and adapted himself to life which was the last thing he wanted."[৩] এই phantom of Trouville এলিজা স্লেসিঙ্গারের প্রতি তার অচরিতার্থ অথচ অবিচল প্রেমানুভূতি।

তাঁর জীবনের উপর গভীর ছায়াপাত করেছিল আর একটি ঘটনা। তেইশ বছর বয়সে একবার রুআঁ থেকে অদূরে কোন গ্রাম থেকে গৃহে ফিরবার পথে রাত্রে গাড়ীতে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। চিকিৎসায় সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু এই মূর্চ্ছা রোগ তার জীবনের চিরসঙ্গী হয়ে রইল। অনেক মতভেদ

ছিল এই রোগের সঠিক নির্ণয় সম্বন্ধে—কেউ বলতেন মৃগী, কেউবা অন্যকিছু। বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে তিনি কখনও কখনও এই মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়তেন। অনেকে মনে করেন ফ্লবেয়ারের পক্ষে এই রোগের প্রথম আক্রমণ ছিল "end of his ordinary life and beginning of ascetic life of literature'.

উপরোক্ত তিন চারটি ঘটনা ও তাঁর মধ্য-পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলিতে ১৮৪৯ সালের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ছাড়া তাঁর জীবন ছিল "uninteresting, uneventful and drab." শাঁত্রে বদ্‌লেয়ারের জীবনকে "an experiment in the vacuum" বলেছিলেন। কারো কারো মতে এই উক্তি ফ্লবেয়ারের জীবন সম্বন্ধে আরও বেশী প্রযোজ্য।[৪] হেন্‌রী জেম্‌স্‌ বলেছেন, "It was obviously his strange predicament that the only spectacle open to him by experience and direct knowledge was the bourgious, which on that ground imposed on him successively his three intensely bourgious themes."[৫] অপরপক্ষে, মিডল্‌টন্‌ মারি বলেছেন যে ফ্লবেয়ার দু'জন আছেন; একজন ১৮২১ সালে ১২ই ডিসেম্বর রুআঁ হাসপাতালের সার্জেনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; আর একজন জন্মগ্রহণ করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে উৎসাহী মানবচিত্তে। একজন ছিলেন লম্বা চওড়া, বলিষ্ঠ, প্রিয়স্বভাব, সরলচিত্ত মানুষ, চাষীর মত চেহারা ও হাসিখুসি …the other was an incorporeal, giant, a symbol,a war cry, a banner under which youthful army marched and marches still to the rout of the bourgious and the revolution of literature," এডমণ্ড উইল্‌সন্‌ ফ্লবেয়ারের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এমন একজন সমাজবাদী "Who had observed something of which Marx was not aware."[৬] এই দু'জনের উক্তি, ফ্লবেয়ারের সাহিত্যসৃষ্টির পরিসর তাঁর বুর্জোয়া সমাজের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার প্রাচীর উত্তীর্ণ হতে পারে নি, এ মতের সাক্ষ্য বহন করে না। তদোপরি এ কথাও সত্য যে সাহিত্যিকের প্রতিভাদীপ্তি কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টি অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে তাঁর সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

২

মূলতঃ ফ্লবেয়ার ছিলেন রোমান্টিক। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের বিস্ফোরণের ধূমাচ্ছন্ন আকাশ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হ'লে দেখা গেল তাতে শুধু স্বৈরতন্ত্র ও দমননীতিই পুড়ে ছাই হয় নি, বিগত দু'শো বছরের প্রধান কৃষ্টিধারার ভিত্তিও সেই প্রচণ্ড আঘাতে ধ'সে পড়েছিল। ফলে জনচিত্তে দেখা দিয়েছিল সেই কৃষ্টিধারার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এবং সাহিত্যক্ষেত্রে একটা অনুর্বর দীর্ঘায়িত বিশ্রাম প্রহর প্রায় চল্লিশ বছরের। ইত্যবসরে যখন সাহিত্যক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে দেখা দিল নব ভিত্তি রচনার অনিবার্য্যতা, তখন এই ভিত্তিরচনা প্রয়াসের প্রেরণা এল সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তি ও অনুভূতির সুসমন্বয়মণ্ডিত গৌরব যুগ থেকে নয়, তার চেয়েও সুদূর অতীত মধ্যযুগের মোহময় রোমান্টিক আবেশ থেকে এবং এই প্রেরণার সূতিকাগৃহ থেকে জন্মলাভ করল ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিক বিপ্লব যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর নিরলঙ্কার যুক্তিবহ সাহিত্য—নীরস পদ্য ও বিরস গদ্যের বিরুদ্ধে রোমান্টিক বিপ্লব নিয়ে এল উগ্র বিপরীত প্রতিক্রিয়া —সে যুগের সূক্ষ্ম বাস্তববোধের বদলে তরল ভাববিলাসিতা, ভাষার সংযমের বদলে অসার অলঙ্কারবাহুল্য। এককথায় "The pendulum sung violently from one extreme to the other".[৭] দিদরো ও রুসোর রচনায় নিহিত অঙ্কুর থেকে এই প্রতিক্রিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুক্তাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করে' নব নব রূপে মঞ্জুরিত হয়ে সর্বোচ্চশিখর সীমায় পৌছল ফরাসী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সন্ধিক্ষণে, ১৮৩০ সালে। লিটন্ ষ্ট্রেচে বলেছেন, "Every sentence, every verse that has been written in French since then bears upon it, somewhere or other, the imprint of the great Romantic Movement which came to a head in that year."[৮] ফ্লবেয়ার তখন নয় বছরের বালক; তার এক বছর পরে তিনি স্কুলে যেতে শুরু করেন। স্বভাবতঃই বালক ফ্লবেয়ারের চরিত্রেও রোমান্টিক মুভ্মেণ্ট গভীর রেখাপাত করে, যাকে মার্টিন টার্ণেল বলেছেন 'deadly impress'. পনর বছরের কিশোর ফ্লবেয়ারের মনে এলিজা শ্লেসিঞ্জার যে অদম্য মোহ সৃষ্টি করে,—যে মোহ তাঁর পরবর্তী ব্যবহারিক ও সাহিত্যিক জীবনের

উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এই রোমান্টিক বিপ্লবেরই ফলপ্রসূত মনে হয়।

অতএব, আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টা সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রথম পথিকৃৎ ফ্লবেয়ারের মানসপ্রকৃতিতে রোমান্টিক ভাবধারা ছিল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাস্তবতা ও রোমান্টিকতা এই দুই বিপরীত ভাবধারায় বিভক্ত ছিল তাঁর শিল্পীমানস। ফলে, তাঁর বাস্তবতার অন্দরে ছিল রোমান্টিকতার অনুপ্রবেশ এবং রোমান্টিকতার অন্দরে বাস্তবতার। হেন্‌রী জেম্‌স্‌ একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এই দ্বৈতভাবকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি ফ্লবেয়ারকে দুই ডানাবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে তাঁর ডান পাখাটি হবে গাঢ় লাল এবং বাঁ পাখাটি গাঢ় হলদে। লাল পাখাটির উপর থাকবে দুটি মণি 'ম্যাদাম বোভারী' ও 'দি সেন্টিমেণ্টল্‌ এডুকেশন'; আর হলদে পাখার দুটি মণি হবে 'দি টেম্পটেশন্‌ অফ সেণ্ট এনথনি' ও 'সালাঁবো'। সামঞ্জস্যের খাতিরে রঙীন মাথার চূড়া হবে 'থ্রী টেলস্‌' আর লেজ হবে 'বুভার এ পেকুাশে'।[৯]

৩

এই দ্বৈত ভাবধারায় দ্বিধাবিভক্ত মন নিয়ে তিনি লেখনী ধারণ করলেন। দীর্ঘ তিন বছর পরিশ্রম করে রচনা করলেন 'দি টেম্পটেশন অফ্‌ সেণ্ট এন্‌থনি।' আশা ছিল তাঁর এই বই প্রথম প্রকাশেই আশ্চর্য সৃষ্টি বলে সমাদৃত হবে। পড়ে শোনালেন তার দুই বন্ধুকে। পড়া শেষ হলে দুই বন্ধুই খুব হতাশ হলেন, বইটিকে তাঁরা তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে বললেন, বললেন মন থেকে ঐ বইয়ের কথা একেবারে মুছে ফেলতে। উপদেশ দিলেন লিখতে, অলীক কল্পলোক নিয়ে নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাস্তব জগৎ নিয়ে। অচিরেই বন্ধুদ্বয়ের একজন তাঁর লেখার বিষয় হিসাবে একটি কাহিনীর প্রস্তাব করলেন। কাহিনীটি তদানীন্তন খবরের কাগজের মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং ফ্লবেয়ারও সেই কাহিনীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। এমন কি সেই বিয়োগান্ত কাহিনীর নায়িকা যে নারী ফ্লবেয়ারের মায়ের তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় পর্যন্ত ছিল। ফ্লবেয়ার যথেষ্ট আপত্তি করলেন, নানা

অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করলেন, বললেন যে তার পারিপার্শ্বিক জীবনের স্থূলতা ও নির্বুদ্ধিতা এত প্রকট যে—এদের নিয়ে কি লিখবেন; কিন্তু অবশেষে দ্বিধাচ্ছন্ন চিত্তে এই গল্পটিকেই রচনার জন্য গ্রহণ করলেন এবং সৃষ্টি করলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ম্যাদাম বোভারী'।

কাহিনীটি হল এই—ডেলামেয়ার নামে এক ডাক্তার রুআঁ থেকে কিছুদূরে এক গ্রামে প্র্যাক্‌টিস্ করত। তার আগে সে কিছুকাল রুআঁ হাসপাতালে শিক্ষানবীশ চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেছিল। সে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক বিধবাকে বিয়ে করেছিল। বিবাহের কিছুকাল পরেই সেই স্ত্রী মারা যায়। দ্বিতীয়বার, সে তার প্রতিবেশী এক কৃষিপরিবারের সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করে। এই যুবতী ছিল ইন্দ্রিয়াসক্তা, প্রেমাতুরা ও অমিতব্যয়ী। নীরস স্বামী সংসর্গে অতৃপ্ত হয়ে সে এক পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমলিপ্তা হয়; কিন্তু সেই প্রেমিক তাকে ছেড়ে চলে যায়। সে আবার আর একজন পুরুষের সঙ্গে প্রণয়লিপ্তা হয় এবং অচিরেই সাধ্যাতীত গুরুঋণভারে জড়িত হয়ে পড়ে। অবশেষে সে আর্সেনিক বিষপানে আত্মহত্যা করে।

বলা বাহুল্য যে ফ্লবেয়ার ম্যাদাম বোভারীতে হুবহু এই কাহিনীটিই গল্প হিসাবে গ্রহণ করেন। ম্যাদাম বোভারীর নায়িকা এম্‌মার রম্যকল্পনা রঙীন ভাবাশ্রিত জীবনের কঠোর বাস্তবের নিগড়ে অসার্থক পরিণতি উপরোক্ত ভ্রষ্টা রমণীর বিয়োগান্ত পরিণতির বিশ্বস্ত অনুলিপি। তিনি অপূর্ব উৎসাহে এই নীচ গল্পটি নিয়ে যেন প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে নিজস্ব যে কল্পনাজীবন তার অঙ্গে কর্দমা ও আবর্জনা ছড়িয়ে শিল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাতৃক্রোড় না পেলে সার্থক সাহিত্যের জন্ম হয় না। বাস্তব জীবনের যথাযথ প্রতিচ্ছবি তুলে ধ'রে তিনি হলেন সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রথম পুরোহিত। এতকালের সম্ভ্রান্ত পাত্র-পাত্রী অধিকৃত উপন্যাস প্রাঙ্গনে আমদানী করলেন সাধারণ লোককে, ভিক্টর হুগোর মত সাধারণ লোককে অসাধারণ চিন্তার উন্নত বাহন করে' নয়; সাধারণ লোককে তার সাধারণ অনুচ্চ, এমন কি অপবিত্র ভাবধারণা নিয়ে। সাহিত্যের সম্ভ্রান্ত দ্বার সাধারণের প্রবেশের জন্য খুলে দিয়ে করলেন আধুনিকতার পত্তন এবং মানব জীবনের অ-মহান, আদর্শহীন, মৃত্তিকাশ্রিত, কল্পনাদীন অস্তিত্বের নিখুঁত আলেখ্য সাহিত্যে আয়ত্ব করে, পূর্বসূরী স্তেধাঁল

ও বালজাকের অর্দ্ধ-অঙ্কুরিত বাস্তববাদকে পূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করে একদিকে রচনা করলেন রোমান্টিক মুভমেণ্টের অন্তিম শয়ান ও অন্যদিকে স্থাপন করলেন বাস্তবতার পথে উপন্যাস-রচনার নতুন ভিত্তি।

ম্যাদাম বোভারীর প্রায় সবগুলি চরিত্রই নীচাশয়, ক্ষুদ্রচিত্ত, নির্বোধ, অকিঞ্চিৎকর, অমার্জ্জিত (একমাত্র ব্যতিক্রম ডাঃ লা রিভিয়ের। এম্‌মার স্বামী চার্লস অর্থের লোভে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক বিধবাকে বিয়ে করেছিল। চিকিৎসাবিদ্যায় তার পারদর্শিতার পরিচয় ইপেলিতের পায়ের ভুল চিকিৎসা ও পরিনামে অঙ্গচ্ছেদ। ইপেলিতে ভারী কাঠের পায়ের খট্‌ খট্‌ শব্দ যেন চার্লসের ডাক্তারী বিদ্যার উপর ব্যাঙ্গাত্মক ধিক্কার। কাহিনীর আরম্ভ বালক চার্লসের স্কুলে প্রথমে আবির্ভাবের দিন। চার্লসের দেহের বর্ণনায় লেখকের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ পাঠকের মনযোগ এড়ায় না। সেদিনের তার পাঁচতলা টুপির সঙ্কেতবহ বর্ণনা সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি, "............part woollen comforter, part military headdress, part pill-box, part fur bonnet part cotton night cap........." চার্লসের এই পাঁচমেশালো টুপি তার বাবার সৈনিক জীবন ও তার পরিবার ও সমাজের অধোগতির সূচনাবহ। বিভিন্ন শ্রেণীর টুপির অবয়বাংশ জোড়াতালি দেওয়া এই টুপি কোন একটা বিশিষ্ট সমাজ শ্রেণীর দ্যোতক নয়—"It is a stupid, shapeless muddle like the wearer and the society in which he lives"[১০] এ হেন টুপিধারীর ভবিষ্যৎ জীবন যে এই টুপির মতই muddle হবে, এই আশঙ্কা ও সঙ্কেত সূচনাতেই পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়। কাহিনীর শেষভাগে প্রিয়তমা পত্নীর অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরে স্ত্রীর ড্রয়ার থেকে উদ্ধার করা পরপুরুষের প্রেমলিপি গুচ্ছের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি, বিস্মিত হতবাক্‌ পরিণত বয়স্ক চার্লস স্কুলে প্রথম দিনের তার পাঁচমেশাল টুপির সাঙ্কেতিক আশঙ্কার মর্মান্তিক পরিণাম।

* * * * *

আর এম্‌মা যেন অবোধ রোমান্টিকতার প্রতীক সুকোমল মূর্তি বাস্তবের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ও দাহগ্রস্ত। সে নির্বোধ, সাধারণজ্ঞান বর্জিত, কর্মকুশলতায় দুর্বল, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে অক্ষম। বিপদসঙ্কুল পিচ্ছল বাস্তবের

বিরুদ্ধ অরণ্যে সে স্বপ্নাবিষ্ট উদাসী পথিক—অতর্কিত ভয়ে সতর্কহীন বঞ্চনার ছলনায় অসন্দিহান, লুব্ধ শিকারীর সহজ সন্ধান। জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপ তার মোহময় স্বপ্নাবেশে আচ্ছন্ন। অধঃপতনের চরম সীমায় পঙ্কিল কর্দমে কলঙ্কিতা সে যেন আকাশ-ভ্রষ্টা স্বপ্নতারকা; ভ্রষ্টতায় স্বপ্নগৌরবে সমুজ্জ্বল। হেনরি জেমস্ বলেছেন, "………she remains absorbed in romantic intention and vision while fairly rolling in the dust."[১১]

বাল্য ও কৈশোরে লব্ধ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে স্থায়ী ও সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। কন্‌ভেন্ট স্কুলের হোষ্টেলে থাকা-কালে সহপাঠিনীদের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে সস্তা রম্য গল্প ও উপন্যাস পাঠের ফলে লুব্ধ মন যে রোমান্টিক ভাবরসে সিঞ্চিত হয়েছিল জলপোতের দিকনির্ণয় যন্ত্রের মত তা নিয়ত তার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। কামনা বাসনার যে রোমাঞ্চকর জীবনতৃষ্ণা রম্য উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে তার রক্তে সঞ্চারিত হয়েছিল, বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্যায়েই সেই তৃষ্ণায় তৃপ্তির অভাব সে লক্ষ্য করল, "And Emma wondered exactly what was meant in life by the words 'bliss', 'passion', 'ecstasy', which had looked so beautiful in books."[১২]

কল্পনার এই রম্যজীবনের বৃথা অন্বেষণ এম্‌মার জীবনের tragedy. তার কোমল বিস্ফারিত চক্ষু তার শুষ্ক জীবনের মধ্যে এই অধরা জীবনের ক্ষীণতম ইঙ্গিতকে বুভুক্ষু লোভীর মত অনুসরণ করেছে। বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাঙ্গন দেখা দিল; অবশ্য চার্লসের তরফ থেকে নয়, স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা ও আকর্ষণ বরাবর অম্লান ছিল এবং এমন সুন্দরী, চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতে পারদর্শিনী স্ত্রীলাভে তার জীবন ছিল শ্রীমণ্ডিত। কিন্তু এম্‌মার জীবনে ঘনিয়ে আসছিল নৈরাশ্যের ছায়া। ঠিক এমন সময়ে এল অ্যাদের্ভিলিএর মার্কুয়িসের লা ভোবিএস্লার প্রাসাদে নাচগানের পার্টিতে বোভারী দম্পতির নিমন্ত্রণ। সেই পার্টির নাচগানের উদ্দাম আনন্দে ও সেই প্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্যে এম্‌মা অনুভব করল তার কল্পলোকের অনুকূল পরিবেশ যা তার রম্যজীবনের ক্ষুধাকে আরও বাড়িয়ে দিল এবং "……had made a gap in her life like those great chasms

that a mountain storm will sometimes scoop out in a single night.[১৩]

এম্মার পরকীয়া প্রেমের প্রথম পর্যায়ের যে চিত্র ফ্লবেয়ার দিয়েছেন তাতে অনুভূতির তীব্রতা ও সম্পর্কের গভীরতার অভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয় এবং এই চিত্রের পাণ্ডুরতা যে শিল্পীর ইচ্ছাকৃত তাও সহজেই ধরা পড়ে। লিওঁ ও এম্মার প্রথম পর্য্যায়ের প্রণয়সম্পর্ক flirtation-র মাত্রা ছাড়িয়ে উন্নীত হতে পারে নি। উত্তেজনাহীন, শুষ্ক, বিরল জীবনের যে একঘেয়েমি এম্মার জীবনকে অবসাদক্লিষ্ট ও মুক্তিপিপাসু করে তুলেছিল, ইঅঁভিলের বৈচিত্র্যহীন, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পরিসরে লিওঁরও সেই একই রকম অবস্থা হয়েছিল। তাই প্রথম সাক্ষাতেই তাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ প্রেমের বলিষ্ঠ প্রেরণার ফল নয়, স্থিতিশীল অস্তিত্বে একটা উত্তেজক মাদক পদার্থের অনুপ্রবেশ মাত্র।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, কল্পনাশ্রিত, স্বপ্নাচারী অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমরা এম্মাকে দেখতে পাই অমৃত সন্ধানে বিষপাত্রে চুমুক দিতে এবং বহু নারী-সম্ভোগে শাণিত-কাম, অভিজ্ঞ নারীশিকারী, চৌত্রিশ বছর বয়স্ক ধনী অবিবাহিত যুবক রদলফের কৃত্রিম প্রেমের শিকার রূপে। লিওঁর পরিণতি সাপেক্ষ নবোদ্গত রোমান্টিক প্রেমানুভূতির তুলনায় রদল্‌ফের প্রেম স্থূল, অমার্জ্জিত, নিঃসঙ্কোচ। রদল্‌ফের নারীদেহ লোলুপ চক্রান্তজালে জড়িত এম্মার স্খলন ও নিগ্রহের কাহিনী সাধারণ মানুষের প্রেমজীবনের অপার স্থূলতার উপর ফ্লবেয়ারের নিষ্করুণ ভাষ্য। এই ভাষ্য চরম প্রকাশ লাভ করেছে রদল্‌ফ ও এম্মার দুজনে একসঙ্গে কৃষিমেলা দর্শন দৃশ্যটিতে। শিল্প নৈপুণ্যের দিক্ থেকে এ দৃশ্যটি শুধু একটি অনবদ্য সৃষ্টিই নয়, পরবর্তী সাহিত্য-সৃষ্টিতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ন্যায়তঃ এই দৃশ্যটির জন্যে ফ্লবেয়ার নিজেও বিশেষ গর্ব অনুভব করতেন; বলতেন এটি অনেকগুলি সুর-সমন্বয়ে যেন একটি ঐক্যতান। বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক তিবো সত্যই বলেছেন যে এই দৃশ্যটিতে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—পশু ও চাষীরা এর নিম্নস্তর, বেদীতে উপবিষ্ট সম্মানিত সরকারী অফিসার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দ্বিতীয় স্তর, আর তৃতীয় স্তর উপরে দোতালায় জানালার ধারে আসীন প্রেমিকযুগল। নীচে পশু গোষ্ঠীর কলরব; প্ল্যাটফর্ম থেকে বক্তৃতা ও উপরে প্রেমিকযুগলের কথোপকথন একই la bétise (stupidity) র ঐক্যতানবদ্ধ প্রকাশ। এই

ঐক্যতানে চেয়ারম্যানের বক্তৃতা আর প্রেমিকদের কথা একটার পশ্চাতে আর একটা শোনা যাচ্ছে—বক্তাদের ধর্ম, কর্তব্য, প্রগতি, দেশপ্রেম সম্বন্ধে মরচে-ধরা বুলি আর প্রেমিকযুগলের কামনা-বাসনার চিরন্তনতার ও নব্য নীতিবোধের তেমনি অসার উক্তি "......answer one another mockingly, cancel one another out, leaving the reader with the impreisson that love and duty are mere shams, that nothing has value."[১৪] দৃশ্যের আবেদন চরমে পৌঁছেছে পুরস্কার বিতরণের সময় :

He took her hand and she did not withdraw it.

'General Prize ;' cried the Chairman.

'Just now, for instance, when I came to call on you......"

'Monsieur Bizet of Quincampoix'

'......how could I know that I shall escort you here ?'

'Seventy francs'

'And I have stayed with you, because I couldn't tear myself away, though I have tried a hundred times'.

'Manure'

'And so I'd stay to night and to-morrow and every day for all the rest of my life'.

'To Monsieur Caron of Argueil, a Gold Medal.'

'For I have never been so utterly charmed with anyone before.'

'......To Monsieur Bain of Givry Saint-Martin...

'And so I shall cherish the memory of you.'

'......For a merino ram......'

'But you'll forget me. I shall have passed like a shadow.'

'......To Monsieur Belot of Notre-Dame......'

'No, say I shall n't ! Tell me, I shall count for something in your thoughts, in your life ?'

'Pigs : Prize divided......sixty francs each.'[১৫]

রদ্‌লফ যখন বলল আমি কি জানতাম তোমাকে সঙ্গে করে আমি এখানে নিয়ে আসব ?' চেয়ারম্যানের স্বরে বিদ্রুপের সঙ্গে ধ্বনিত হল "সত্তর ফ্রাঙ্ক" —যেন বারাঙ্গনার ও তার গ্রাহকের দর কষাকষির কথা। রদল্‌ফ্‌ যখন বলল আমি শত চেষ্টা করেও তোমাকে ছেড়ে যেতে পারছি না, চেয়ারম্যানের কর্কশ কণ্ঠ যেন ধিক্কার দিয়ে উঠল "manures," সারাজীবনের প্রতিটি দিন এম্‌মার সঙ্গী হয়ে থাকতে রদ্‌লফ্‌ ইচ্ছা প্রকাশ করলে নীচের কর্কশ স্বর যেন ব্যঙ্গ করে বলে উঠল "একটা সোনার মেডেল'। শেষে রদল্‌ফ যখন বললে "বল, তোমার জীবনে, তোমার চিন্তায় আমার একটু স্থান হবে ?" নীচ থেকে কঠোর ব্যঙ্গ ধ্বনিত হল "শূয়োর···তোমরা দুজনেই।" মার্টিন টার্নেল বলেছেন, "I think it will be agreed that the scene is......an ironical commentary not merely on Emma's assumed modesty and Rodolphe's vows of eternal fidelity, but on the whole basis of love. It ends by transferring the pair into a couple of pigs rolling over each other on the dung heap. For the words which gives it its particular tone are fumiers (manures) and race porcine."[১৬]

রদল্‌ফের কামলোলুপতা এতই নগ্ন যে, "He could not see why she should make a fuss about anything so simple as love." ফলে "refusing to be inconvenienced by a sense of shame, he treated her as he pleased and turned her into something pliant and corrupt."[১৭] অবশেষে যখ: তার প্রবঞ্চনা সত্যিই ধরা পড়ল তখন এম্‌মা এই নৈরাশ্যের আঘাত সহ্য করতে পারে নি এবং কঠিন রোগে তার জীবনাশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

এম্‌মার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়—প্রথম প্রেমিক লিওঁর সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত প্রণয়সম্পর্ক—আরও অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। রদল্‌ফের প্রবঞ্চনা থেকে কিছুমাত্র শিক্ষা সে লাভ করে নি; যে শিক্ষা সে পেয়েছিল তা ভ্রষ্টতার কুটিল আচরণে পারদর্শিতা। তিন বছর বয়োবৃদ্ধি ও প্যারী জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক

লিওঁর সাহসী ব্যগ্র বাহুবন্ধনে মৃদুবায়ু সঞ্চালনে স্খলিত পক্ক ফলের মত তার আত্মসমর্পণ রদল্‌ফের প্রবঞ্চনায় বাধাপ্রাপ্ত রম্যজীবনের ব্যাকুলতর অনুসরণ। পর্দাঢাকা ঘোড়ার গাড়ীতে অর্দ্ধদিনব্যাপী রুআঁর রাস্তায় রাস্তায় যুগলে পরিভ্রমণ, চন্দ্রালোকে নদীতে নৈশবিহার, সঙ্গীত শিক্ষার ছলে রুআঁর হোটেলে সপ্তাহে দীর্ঘদিনব্যাপী মিলন—রম্যজীবনের এবম্প্রকার চরিতার্থতার বিরাম ছিল না তাদের জীবনে। এই মিলনের প্রতি মুহূর্ত ছিল প্রেমের পরস্পর নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রতিশ্রুতিতে মুখর।

কিন্তু এই সম্পর্কের অসারতা এম্‌মার কাছে ধরা পড়তে বেশী দেরী হয় নি। "She would look forward to a profound happiness at next meeting, then have to admit that she felt nothing remarkable."[১৮] লিওঁর দিক থেকে "......there was something extreme, mysterious, mournful which seemed to Leon to come subltly stealing between them, to set them apart."[১৮] "......What had charmed him once, now frightened him a little."[১৯] লিওঁর জন্য আকাঙ্ক্ষায় এম্‌মার যেমন এসেছিল অবসাদ, এম্‌মার প্রতি আকর্ষণে—তেমনি লিওঁর এসেছিল ক্লান্তি। "Emma had rediscovered in adultery all the banality of marriage."[২০]

এম্‌মার পক্ষে লিওঁর সঙ্গে তার প্রণয় সম্পর্ক হয়েছিল বাস্তবের আঘাত, রদ্‌লফের সম্পর্কের চেয়ে কঠোরতর। রদল্‌ফের ক্ষেত্রে সে আঘাত এসেছিল বাইরে থেকে, রদল্‌ফের দিক থেকে। কিন্তু লিওঁর ক্ষেত্রে সে আঘাত এসেছিল নিজের অন্তর্নিহিত অতৃপ্তি থেকে। লিওঁর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কের শিখর মুহূর্তে······She saw another man, a phantom made of her most ardent memories, of the finest things she had read, of her most violent longings......", যাকে সে এত সত্য ব'লে অনুভব করত, যার সান্নিধ্য তার কাছে এত নিবিড় বোধ হত, যে বিস্ময়ে সে শিহরণমুখর হ'য়ে যেত, তার সেই প্রেমিকের ছবি তবু তার কাছে ঢাকা থাকত অস্পষ্টতায়, "for he receded like a God behind the abundance of his attributes" ;[২১] অপবিত্র প্রেমের গোপন শিখার দাহ যতই সে অনুভব করত,

ততই কামনায় কম্পমান হয়ে উঠত তার রুদ্ধশ্বাস বিবশ দেহ। শেষ রাত্রে হিমেল হাওয়ায় উড়ন্ত এলোচুলে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের তারার দিকে স্থিরনেত্রে চেয়ে তার কৈশোরস্বপ্নের প্রেমিক যুবরাজের জন্য সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত সতৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষায়। গর্হিত প্রেমের কর্দমাক্ত জল দীপ্যমান হয়ে উঠত সেই রাজপুত্রের মাথার মণির প্রতিফলনে। আমরা দেখতে পাই ফ্লবেয়ারের বাস্তবতা-বুকে জড়িয়ে আছে রোমান্টিকতার কোমলকুসুম।

এম্‌মার অকাল ও অস্বাভাবিক পরিণতি তার পরকীয়া প্রণয়লীলার উদ্দামতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ততটা নয়, যতটা তার পরিণাম বিবেচনাহীন আপাতমধুর বিলাসসামগ্রীর প্রতি অসংযত লুব্ধতা। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে তার এই বেপরোয়া বিলাসলুব্ধতা রোমান্টিক ভাববিলাস সঞ্জাত ও তার উপলব্ধি প্রয়াসে প্রণয়ের ব্যভিচারের সঙ্গে সমতালে অনুসৃত।

*　　*　　*　　*

ম্যাদাম বোভারী কাহিনীতে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও ফ্লবেয়ার যে তার নায়িকাকে নাটকীয় মহত্ত্ব দান করেন নি—এটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। পার্সি লুব্বক বলেছেন যে ম্যাদাম বোভারীতে "...the two chief players are a woman on one side and her whole environment on the other—that is Madame Bovary. There is a conflict, a trial of strength and a doubtful issue.......a pair of wills that collide, an action that pulls in different directions."[২২] এই উপাদানকে জীবননাট্যের একটা মহান আলেখ্য রূপে তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন, সে ক্ষমতা ফ্লবেয়ারের ছিল, শুধু তাই নয়, অসামান্যরূপেই ছিল। তার প্রমাণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি বাক্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু ফ্লবেয়ার তা করেন নি, তার উদ্দেশ্যও তা ছিল না। এম্‌মার জীবন-সংঘর্ষের বিয়োগান্ত পরিণতিকে তিনি মহান্ নাটকীয় উপসংহারে উন্নীত করার উপযুক্ত উপাদান তার চরিত্রে দেন নি। ইচ্ছাশক্তিতে দুর্বল, অতি সাধারণ প্রলোভনের সহজ শিকার, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে heroic সংগ্রামে সে অক্ষম; "......there was not the stuff in Emma, more especially, that could make her the main figure of a drama, she is small and

futile.......”[২৩] হেন্‌রী জেম্‌স বলেছেন, “Our complaint is that Emma Bovary, in spite of the nature of her consciousness and in spite of her reflecting so much that of her creator, is really too small an affair.”[২৪]

৪

ফ্লবেয়ারের বিখ্যাত দ্বিতীয় উপন্যাস ‘দি সেন্টিমেণ্টাল এডুকেশন’-এর পটভূমিকা ম্যাদাম বোভারীর চেয়ে অনেক বেশী বিস্তীর্ণ। ফরাসী সমালোচকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ম্যাদাম বোভারীর আঞ্চলিক ক্ষুদ্র সহরের সীমিত পরিসরের পরিবর্তে, ‘দি সেন্টিমেণ্টাল এডুকেশন’ ধনী বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি এক যুবকের যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত কাহিনীর মাধ্যমে প্যারীর উচ্চশ্রেণীর অভিজাত বুর্জোয়া সমাজের চিত্র। কাহিনীর পটভূমিকা, সমাজের স্তর, পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য ও ঘটনার জটিলতায় যথেষ্ট পার্থক্য সত্বেও এই দু'টি বইয়ের মধ্যে অসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্য অধিকতর প্রকট। এই সাদৃশ্য উভয় উপন্যাসের সামগ্রিক আবেদনের মধ্যে নিহিত। আঞ্চলিক ক্ষুদ্র শহর ইওঁভিলে মানবজীবনের অতিসাধারণত্বের —ক্ষুদ্রতার, সঙ্কীর্ণতার, প্রেমলিপ্সার নগ্নতার ও ব্যর্থতার—যে চিত্র দেখি, প্যারী নগরীর বিদগ্ধ অভিজাত উচ্চশ্রেণী-সমাজের চিত্র তারই সমগোত্র।

দ্বিতীয় উপন্যাসের নায়ক ফেদেরিক মরো লেখকের আপন সত্বার প্রতিনিধি; ম্যাদাম আর্নু'র প্রতি ফেদেরিকের প্রেমানুগত্য শিল্পীর এলিজা স্লেসিঞ্জারের প্রতি প্রেমানুভূতির প্রতিলিপি। জীবনের পঞ্চদশ বর্ষ থেকে এলিজার প্রতি প্রেম, অধরা ও করায়ত্ব না থেকেও সুদূর ধ্রুবতারার মত যেমন ফ্লবেয়ারের পরবর্তী সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে রেখেছিল, তেমনি ফেদেরিকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ঘটনাতাড়িত জীবনে মাধ্যাকর্ষণ বিন্দুর মত ছিল ম্যাদাম আর্নু'র প্রতি তার একাগ্র প্রেম। ‘দি সেন্টিমেণ্টাল এডুকেশন’ উপন্যাসের বাস্তব-কঠোর বিস্তীর্ণ প্রস্তরভিত্তির উপর এই প্রেম যেন একটি পেলব, মনোরম, রক্তিম পুষ্প। কঠোর অনুসন্ধিৎসার যে শাণিত ছুরিকা ফ্লবেয়ার তাঁর সৃষ্ট সকল চরিত্রের নির্দয় মর্মব্যবচ্ছেদে প্রয়োগ করেছেন, তাদের মধ্যে একমাত্র ম্যাদাম আর্নু'র ক্ষেত্রে তা সংহরণ করে রেখেছিলেন;—ফলে ম্যারিয়ে আর্নু'র চরিত্র

অস্পষ্ট, ছায়াময়। লেখক যেন তার আকৈশোর সযত্নপালিত এই প্রেমমূর্ত্তিকে অপবিত্র করার ভয়ে বাস্তবের ব্যবচ্ছেদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। এইখানে 'ম্যাদাম বো ভারী'র সঙ্গে 'দি সেন্টিমেণ্টাল্ এডুকেশনের' বিশিষ্ট পার্থক্য। ম্যাদাম বো ভারীতে এম্মার যে শৈশবলব্ধ রম্যকল্পজীবন বাস্তবের নির্মম ভারে ছিন্ন, বিকৃত, পরাভূত, দি সেন্টিমেণ্টাল্ এডুকেশনে কৈশোরের সেই রোমান্টিক প্রেমের প্রতীক, সতত প্রীতি ও মমতায় স্মৃতি-বেদীতে অধিষ্ঠিতা। শিল্পসৌষ্ঠবের দিক থেকে বাস্তবতার পুঞ্জীভূত ভারে অবনমিত, নীরস, নির্দয়, প্রাণহীন বলে অভিযুক্ত এই উপন্যাসে, ম্যারিয়ে আর্নু'র উপকথা চতুর্দিকের বাস্তবের রূঢ়তাকে একটি কবিত্বময় স্নিগ্ধ আবেশে আবৃত করে গ্রন্থকেন্দ্রের ভারসাম্য রক্ষায় প্রভূত সাহায্য করেছে।

'দি সেন্টিমেন্টেল্ এডুকেশন' মানব জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী। এই কাহিনীর চরিত্রগুলির সকলের জীবনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত। ফ্রেদেরিক তার জীবনাদর্শ-লাভ থেকে বঞ্চিত, আর্নু অর্থস্বাচ্ছন্দ্য অর্জনে বিফল, এমন কি পার্থিব প্রতিষ্ঠার চরম সাফল্যও এই ব্যর্থতার ব্যতিক্রম নয়; তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোটিপতি মঁসিয়ে দাঁ ব্রোজের অসার্থক ধনী জীবন। তাদের প্রত্যেকের জীবনের শেষ সীমান্ত কোন মহত্ত্বে উজ্জ্বল নয়, শেষ অধ্যায়ে তাদের নিষ্ক্রমণ অতর্কিত, tradgedy-র গৌরবে মহান নয়। তাদের ব্যর্থতা সমসাময়িক যুগ-নিয়তির বিধান রূপে বা নিজস্ব দুর্ব্বলতার প্রতিফল রূপে ফ্লবেয়ার চিত্রিত করেন নি, করেছেন মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার আঙ্গিকরূপে। তাঁর মতে "………human hopes end not so much in a sudden disillusionment as in gradual disintegration."[২৫]

আলফ্রেড কোলিং এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে লিখেছেন, "This imperishable book is the book of failure par excellence. Flaubert…… turned the radiance of a talent which had reached its highest peak of perfection to the task of recording the bankruptcy of a man and of a generation. A disconcerting prodigy !"[২৬] তাঁর অসমাপ্ত শেষ গ্রন্থ 'বুভার এ পেক্যুশে' মানবজাতির বিফলতার উপর চরম ধিক্কার। এই গ্রন্থে নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণীর নির্বুদ্ধিতা (Le be´tise)-র উপর তাঁর

ব্যঙ্গ এত কঠোর, কর্কশ ও করুণাহীন যে হেনরী জেমসের ভাষায় বইটি "dry as sand and heavy as lead." আলফ্রেড্ কোলিং মনে করেন এই বইয়ের দু'টি প্রধান চরিত্র ফ্লবেয়ারকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে "he was invaded by their bétise which infected and killed him." মার্টিন টার্নেল এর কথায়, 'ম্যাদাম বোভারী' থেকে 'দি সেন্টিমেন্টেল এডুকেশন্' এবং 'দি সেন্টিমেন্টেল এডুকেশন' থেকে 'বুভার এ পেকুাশে' তে ফ্লবেয়ারের ধ্বংশমূলক প্রবৃত্তি ক্রমশঃ সার্বভৌম নাস্তিকতার পর্বে অগ্রসর হচ্ছিল। "Inflamed against myself, I uproot man with two hands, two hands filled with strength and pride, : Out of this tree with its verdant foliage, I wanted to construct a naked column in order to place on the very top of it, as though on an alter, I know not what celestial flame."[২৬] ফ্লবেয়ারের নিজের মুখের এই উক্তি তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির উপর এক গভীর অর্থবহ ভাষ্য।

পূর্বসূরিদের প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে সাধারণ মানুষের জীবন, তার জীবনাদর্শের পাণ্ডুরতা, ইচ্ছাশক্তির শিথিলতা, অনুভূতির তরলতা, তার অমহান পরিসমাপ্তি এহেন অকিঞ্চিৎকর বিষয় স্বাগত করে সাহিত্যে তিনি যে আধুনিকতা ও বাস্তববাদের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই সাহিত্যিক বিপ্লবের জনক হিসাবে তাঁর কীর্তি মহীয়ান ; কিন্তু তাঁর চেয়েও তাঁর মহীয়ান কীর্তি এই সাধারণের চিত্র -কল্পে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের উদ্ভাবন ও প্রয়োগ এবং এই অবদানের জন্য তিনি 'the greatest stylist of the century' ব'লে স্বীকৃত। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অনেক ত্রুটির উল্লেখ অনেকে করেছেন ; প্রোস্ত (Proust) উল্লেখ করেছেন তাঁর কল্পনায় দৈন্যের, রভিয়ের (Reviere) তাঁর মনস্তত্ত্বের অগভীরতার, হেনরী জেম্‌স্ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের অনুভূতির তারল্যের, মার্টিন টার্নেল্ তাঁর শিল্পমানসের অপরিপক্কতার, সাত্রে তার গণবিপ্লব-বিমুখিতার এবং আরও অনেকে অনেক রকম ত্রুটির, কিন্তু তার শিল্পনৈপুণ্যের সাফল্য সম্পর্কে সকলেই

একমত। বাল্জাক ও স্তেধাঁল সম্বন্ধে বলা হয়, "They became writers because they had lived ; they did not live in order to become writers ; and they were untouched by the *mystique* of the Artist which became fashionable with Baudelaire and Flaubert."[২৭] এই *Mystique* of the Artist র গুণেই তিনি the most literary of the Artists.

প্রতিভা তার সৃষ্টির রন্ধনশালায় সংগৃহীত উপকরণকে মশলার কোন্ গোপন সংমিশ্রণের গুণে সার্থক আর্টে রূপান্তর দান ক'রে রসিকসমাজের চিত্ত হরণ করতে সক্ষম হন, তা এই দৃশ্যমান অসীম বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে প্রকৃতির কারখানার মতই অজ্ঞাত ও রহস্যময়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিল্পীর মনে বিষয়বস্তু প্রণোদিত প্রেরণা যত গভীর হবে, তত বেশী প্রখর হবে তার প্রকাশের ক্ষমতা। শিল্পীর হাতে তার উপকরণ যে বিন্যাস ও অবয়ব (arrangement and form) গ্রহণ করে সেই বিন্যাস ও অবয়বের শিল্পগুণের উপর ও তার 'finish'-র উপর সৃষ্টির সার্থকতা নির্ভরশীল। এই 'finish' শিল্পীর নিজস্ব অবদান, একান্ত তার নিজের দায়িত্ব, এটিই তার সৃষ্টি-কর্ম। শিল্পীর কারখানা-ঘরে এটি হল 'crucible of inspiration.' কিন্তু এই প্রেরণার অতিরিক্ত আরেকটি technique-র উপর ফ্লবেয়ার নির্ভর করতেন আরও বেশী, সেটি হল শিল্পীর প্রকাশ ক্ষমতা। তিনি বিশ্বাস করতেন "that beauty comes with expression, that expression is creation, that it makes reality......"[২৮] তাঁর মতে প্রকাশ যত সুষমা-মণ্ডিত ও দীপ্তিমান হবে, ততই তীক্ষ্ণ ও গভীর হবে অনুভূতি এবং সৃষ্টি করবে নব নব প্রেরণা। 'Fertilisation of subject by form,' 'penetration of sense by expression'—এই ছিল তার মূল শিল্পরীতি। তাই ষ্টাইল তাঁর কাছে শিল্প-সৃষ্টির অনন্য সোপান। Speech acts as the enlarger of sentiments."[২৯] শিল্পসৃষ্টি আর্ট হয়ে উঠে কেবলমাত্র সার্থক প্রকাশভঙ্গিমা অর্থাৎ ষ্টাইলের মাধ্যমেই 'as a letter committed to the post office is dependent (for its emergence) on an addressed envelope."[৩০] তাই, তাঁর কঠোরতম সমালোচকরাও বলেন, "We cannot escape the conclusion

that he marks the point at which the focus shifts from the artist's experience to his method."[৩১]

অধিকাংশের মতে ষ্টাইল প্রতিভার মত একটা স্বয়ংসিদ্ধ সহজাত অভিব্যক্তি, যা চেষ্টা করে অর্জন করতে হয় না, আপনিই এসে ধরা দেয়। ফ্লবেয়ার কিন্তু তা মনে করতেন না। তার মতে, ষ্টাইল আপনা-আপনি ধরা যেমন দেয়, তার চেয়ে দ্রুতবেগে আবার আপনা-আপনি অন্তর্ধানও হয়ে যায়। অন্ততঃ ফ্লবেয়ারের কাছে ষ্টাইল আপনি এসে ধরা দেয় নি; তাঁর বেলায় ষ্টাইলের "......arrival was determined only by fasting and prayer or by patience of pursuit, the arts of the chase, long waits and watches......"[৩২]। তাই ষ্টাইলকে আয়ত্ব করতে অক্লান্ত তাঁর সাধনা, আত্মবিলোপকারী অনুশীলন, ঐকান্তিক নিষ্ঠা—হিমালয়ের নির্জন গিরিগুহায় পারলৌকিক সাধনায় সমাহিত যোগীর মত : "Let the phrase, the form that the whole is at the given moment is staked on, be beautiful and related, and the rest will take care of itself."[৩৩]

তাই, প্রতিটি শব্দচয়নে, প্রতিটি বাক্যরচনায় অক্লান্ত তার ধৈর্য ও প্রচেষ্টা ; ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও ছন্দ যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাবের পূর্ণতম প্রকাশের বাহন না হ'ত, পরস্পর ঐক্যতানবদ্ধ হয়ে সাবলীল স্ফুরণ লাভ না করত, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন একটি বিশেষ ভাবের যথাযথ পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ; একটি অনন্য শব্দ-বিন্যাস ও বাক্যরচনার মাধ্যমেই তা সম্ভব, যার আর দ্বিতীয় কোন বিকল্পরূপ হতে পারে না, ঠিক যেমন 'the glove fits the hand.'

সারাদিন যত্ন সহকারে যা লিখতেন দিনের শেষে সে-ন্ নদীতীরের নির্জন অট্টালিকার উন্মুক্ত ছাদে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে তা পাঠ করে নিজের কানে শুনতেন ; ভাব, ধ্বনি, ছন্দ ও স্বরের পরস্পর সমন্বয়ের বিন্দুমাত্র ত্রুটি কানে বাজলেই, কিংবা ভাব প্রকাশের কিছুমাত্র অসম্পূর্ণতা সূচিত হলেই আবার তা সংশোধনের জন্যে ব'সে যেতেন। এমনি করে দিনের পর দিন পরম ধৈর্যের সঙ্গে রচনার স্ব-নিয়ন্ত্রিত কঠোর মানদণ্ডগুলি একটার পর একটা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছেন, ততক্ষণ চলত তাঁর অনুশীলন,

পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এমনও দেখা গেছে পুরো দু'দিন ঐকান্তিক শ্রমস্বীকার করেও মনোমত দু'টি লাইনের বেশী রচনা করতে পারেন নি; আবার রচনাকে অন্তিমরূপ দেবার সময় দেখা গেল ঐ দুটি লাইনই সন্তোষজনক হয় নি ব'লে শেষকালে বাদ পড়ে গেছে। কোন পরিবেশের বর্ণনা করবার আগে তিনি যতদূর সম্ভব সেই স্থানগুলিকে স্বচক্ষে দেখে আসতেন। একবার তাঁর কোন বইয়ের একটা দৃশ্যের পটভূমিকা ছিল চন্দ্রালোকে বাঁধাকফির বাগান। চন্দ্রালোকে বাঁধাকফির বাগান বাস্তবে দেখতে কেমন সেটা স্বচক্ষে না দেখে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাক্ষ্য ছাড়া কি করে লেখেন তিনি? দীর্ঘদিন অপেক্ষা ক'রে ক'রে ঠিক যেমনটি চান সেই রকম চাঁদের আলো ও পরিবেশের সুযোগ এলে, নোট বই হাতে দৃশ্যটির বিস্তৃত বর্ণনা লিখে নিতে বাঁধাকফির বাগানে চলে গেলেন। এই রকম কঠিন ছিল তার শিল্পানুগত্য। এই আনুগত্য তাঁর মতে শিল্পীর পক্ষে শুধু প্রয়োজন নয়, অলজ্ঘ্যনীয় বিধি।

আরেক দিনের ঘটনা। পরিণত বয়সে বছরে একবার করে প্যারী যেতেন এবং একটা ভাড়াবাসায় অন্ততঃ মাসখানেক থাকতেন। সেখানে তাঁর বাসায় সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক আসতেন এবং সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা গল্প ইত্যাদি হত। একদিন এক মনোরম মধ্য-অপরাহ্নে তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁর বাসায় উপস্থিত হলেন, কিন্তু বন্ধুবরের দেখা নেই। খুঁজে পেতেও তাঁর কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে আবিষ্কার করা গেল যে তিনি সেই অসময়ে জামাকাপড় ছেড়ে শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন। রচনার কোন একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান-সন্ধানে গভীর চিন্তামগ্ন!

তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়ে অতীতের আলেখ্য রোমান্টিক কল্পনামুখর হয়েও, অসংহত কল্পনার নরম খাদে মিশ্রিত ভাববিলাসের স্বেচ্ছাচিত্র হয় নি; অতীত সেখানে বাস্তবনিষ্ঠ সত্যরূপ নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ফ্লবেয়ারের রচনার যে গুণকে লিটন ষ্ট্রেচে বলেছেন 'solidity' তা তার অতীত সম্পর্কে অক্লান্ত অনুসন্ধান ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-সংগ্রহ প্রচেষ্টার ফল। 'সাল্যাঁবো' লিখতে একটা গোটা লাইব্রেরী অধ্যয়ন করে ফেলেছিল। 'বুভার এ পেক্যুশে' লেখার প্রস্তুতি-কল্পে অধ্যয়ন করেছিলেন প্রায় দেড়হাজার বই। এমনি অতি-মানবীয় ছিল ক্রোয়াসেসের সন্ন্যাসীর শিল্পনিষ্ঠা। স্বভাবতই তাঁর রচনার গতি ছিল মন্থর,

সময়ের দিকে কোন খেয়াল ছিল না তার; লেখনীদ্বারা জীবিকা অর্জনের দায় থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি। সাহিত্য-সৃষ্টিকে যাঁরা অর্থোপার্জনের উপায় বলে গ্রহণ করতেন তাঁরা ছিল তার অবজ্ঞার পাত্র। একত্রিশ বছর বয়সে 'ম্যাদাম বোভারী' লিখতে শুরু করেন, শেষ করতে লেগেছিল প্রায় পাঁচ বছর। 'টেম্পটেশন অফ্ সেণ্ট এনথনি' লিখেছেন তিনবার। সুদীর্ঘ তের বছর ধরে রচনা করে চলেছিলেন 'বুভার এ পেক্যুশে', দুই খণ্ডে সমাপ্ত করবার পরিকল্পনা নিয়ে। তবু প্রথম খণ্ডই সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি মৃত্যুর আগে। লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতেন খুব কম; লেখায় বিঘ্ন ঘটলে রেগে যেতেন ভীষণ। নির্দিষ্ট সময়ে আমন্ত্রিত সাহিত্যানুরাগী গুটিকয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্বল্পস্থায়ী পদসঞ্চার ছাড়া সে-ন্ তীরের তাঁর সাহিত্য-সাধনাগৃহের শান্তি ও নীরবতা ভঙ্গ হ'ত না। শিল্প-সাধনায় এই অনন্য নিষ্ঠা, একান্ত আত্মবিলোপ, উন্মুখ অনুশীলন তাঁর পরবর্তী সাহিত্যসেবীদের, বিশেষ ক'রে ঔপন্যাসিকদের পক্ষে, এক অপূর্ব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৬

স্বয়ং-স্বীকৃত কঠোর মানদণ্ড ছাড়া এই কঠিন সাহিত্য সেবাব্রতে তাঁর আরও বাধা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সংরক্ষিত তাঁর পত্রাবলী থেকে তাঁর শিল্পজীবন সম্পর্কে অনেক কথাই আমরা জানতে পারি। আমরা জানতে পারি যে তাঁর বাস্তববাদী উপন্যাসত্রয়ে যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি লেখনী ধারণ করেন, তার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ঘৃণা। শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা আনন্দের অমৃতলোক থেকে আসে নি; সাহিত্যসৃষ্টির বলিষ্ঠতম প্রেরণা তাঁর আসত ঘৃণা থেকে। পত্রাবলীর অংশ বিশেষ আমরা তাকে দেখতে পাই প্রায়শঃই তাঁর নির্বাচিত বিষয় ও সৃষ্ট চরিত্রগুলির উদ্দেশ্যে অভিশাপ বর্ষণ করতে, কেন যে তিনি তাদের নির্বাচন করলেন তার জন্য অনুতাপ করতে, এমন মূর্খতার জন্য নিজেকেই বিদ্রূপ করতে, এবং জেমসের ভাষায় "hating them in the very act of sitting down to them"; তাদের নিয়ে লিখতে বসে' তিনি যেন এক কঠোর দণ্ডাদেশ পালন করতেন।

সাধারণের বাস্তব আলেখ্য-চিত্রণে তাঁর আশৈশব সহজাত রোমান্টিক কল্পনা—

বৃত্ত অনুক্ষণ বিদ্রোহ করত এবং এই বিদ্রোহকে দমন করে রাখতে তাঁকে লেখনীর উপর সর্বদা-সজাগ দৃষ্টি রাখতে হত। নিরঙ্কুশ বাস্তবানুগত্য ও গগন-মুখী রম্যকল্পনা এই দুইয়ের সংগ্রামে সর্বদা তাকে সন্ধি স্থাপন করে চলতে হ'ত—যেন পক্ষবিস্তার-নিষিদ্ধ আকাশচারী বিহঙ্গের ধরণীতলে মন্থর পদযাত্রা। 'দি টেম্পটেশন্ অফ্ সেণ্ট এনথনি' ও 'সালাঁবো'র অতীত কাহিনী রচনায় এ সন্ধি-স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না—ধূলিধূসরিত বাস্তবের ঊর্ধ্বে প্রখর কল্পনায় রঙিন যে সুদূরের সঙ্গে তাঁর অন্তরের নিবিড় যোগ ছিল সেই সুদূর অতীতের রোমান্টিক বর্ণনার মুক্তাঙ্গনে তার কল্পনা বিহঙ্গের বাধাহীন পক্ষবিস্তার ও স্বচ্ছন্দ বিহারে কোন অন্তরায় ছিল না। কিন্তু সেই রোমান্টিক ভাবকল্পনা বাস্তবানুগ উপন্যাস-গুলির বাস্তবের দৃঢ় প্রাচীরে বন্দী এবং এই বন্দীদশা থেকে সর্বদা মুক্তিসন্ধানী। তার নিদর্শন এই উপন্যাসগুলিতে অনেক আছে।

যেমন বিবাহের অব্যবহিত পরেই বাস্তবের রূঢ় পরিবেশে এম্মার প্রাক্-বিবাহের রোমান্টিক স্বপ্নজড়িত জীবনাকাঙ্ক্ষা যখন প্রথম আঘাত পেল তখনকার তাঁর দিবাস্বপ্ন :

"......In a postchaise, behind blue silk blinds, you climb at footpace up precipitous roads, listening to the postillion's song echoing across the mountains, amid the tinkling of goat-bells and the muffled noise of waterfalls. At sunset you breathe the scent of lemon trees on the shore of a bay. At night together on the terrace of your villa, with fingers intertwined, gaze at the stars and make plans for the future. It seemed to her that certain parts of the world must produce happiness, as they produce peculiar plants which will flourish nowhere else. Why could she not now be leaning on the balcony of a Swiss Chalet or immuring her sadness in a Scotch Cottage, with a husband in a black velvet coat with long flaps, and soft boots, and peaked hat and ruffles !"[৩৪]

নিরঙ্কুশ বাস্তববাদী লেখকের হাত থেকে রোমান্টিক দিবাস্বপ্নের এটি একটি

অনবদ্য বর্ণনা। তা ছাড়া এই উদ্ধৃতি ফ্লবেয়ারের শিল্পরীতির কয়েকটি উজ্জ্বল পরিচিতি বহন করে। প্রথমতঃ, অন্তরের নিবিড় গোপন অনুভূতির চাক্ষুষ দৃশ্যমান কায়ায় রূপায়ন। এম্মার অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষাগুলি একটার পর একটা বাহ্যিক প্রত্যক্ষরূপ নিয়ে প্রতিভাত। দ্বিতীয়তঃ, অনুভূতির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্বচ্ছন্দ উত্তরণ। অশ্বশকটের মন্থরগতিজনক স্বপ্নাবেশে কাতরতা নীল পর্দার অন্তরালজনিত রঙীন জীবন দৃষ্টিতে মিলিত। তৃতীয়তঃ, ছাগযূথের ঘণ্টার টুংটাং শব্দ, পতনশীল বারিধারার অস্ফুট কলধ্বনি, পর্বতশৈলে অশ্বচালকের গানের প্রতিধ্বনি, এদের মিলিত সঙ্গীতে ও সমুদ্রতটে লেবুগাছের সুগন্ধে ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটির পর একটি সোপান আশ্রয় করে চেতনায় মোহাচ্ছন্নতার সামগ্রিক সম্প্রসারণ। অন্তিম স্তরে, সমস্ত কিছু নৈশ অন্ধকার আবরণে নির্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মোহাচ্ছন্ন চেতনার ভাববিলাসে আত্মনিমজ্জন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে এম্মার অনুভূতির রূপায়নে এই নাটকীয়তার প্রক্ষেপ পরবর্তী কালের উপন্যাস সাহিত্যে বহুপ্রচলিত স্বাগত ভাষণ পদ্ধতির ও symbolist-দের সার্থক সাঙ্কেতিক রীতির পথিকৃৎ পূর্বাভাষ।

তেমনি 'দি সেন্টিমেন্টাল এডুকেশন' উপন্যাসের নায়ক ফেদেরিক মরো ম্যাদাম আর্নুর প্রতি তার প্রেমের প্রথম পর্যায়ে প্রায়শইঃ তাকে ঘিরে রম্যকল্পনার এমন দিবাস্বপ্ন দেখত। তার একটি নমুনা :

"......Paris depended on her person ; and the great city, with all its voices, resounded like a vast orchestra about her."

বাগানে দেখা তালগাছ তার কল্পনাকে দূর, সুদূর দেশে নিয়ে গেল। কল্পনায় সে দেখল তারা যুগলে ভ্রমণরত, উটের পিঠে, হাওদায়, নীল দ্বীপপুঞ্জে ভাসমান বজরার নিভৃত কক্ষে, অসমতল সবুজ আস্তরণ-ঢাকা মাঠে উজ্জ্বল সজ্জায় সজ্জিত দু'টি খচ্চরের পীঠে। লুভর মিউজিয়ামের চিত্র দেখে তার প্রেম বিজড়িত হল অতীতের সঙ্গে; চিত্রিত মূর্তিগুলির জায়গায় সে কল্পনা করল মেরিয়ে আর্নুকে; কল্পনানেত্রে দেখল তাকে সূক্ষ্ম-শিল্পকার্যে অলঙ্কৃত কাঁচের অন্তরালে জানু পেতে প্রার্থনা করতে; ক্যাসল বা ফ্ল্যাণ্ডার্সের ডিউক পত্নী-রূপে, রানী বেশে সুসজ্জিতা সিংহাসনে আসীনা; কখনও বা উটপাখীর পালকের চাঁদোয়ার নীচে ব্রকেটের গাউন পরিহিতা, সভাসদপরিবেষ্টিতা, মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত

সিড়িতে অবতরণশীলা ; আবার কখনও বা হলদে রেশমী বস্ত্রে অন্দর মহলে ডিভানে উপবিষ্টা ; and anything beautiful—the glittering of the stars, certain melodies, the turn of a phrase, a curve, brought her suddenly, involuntarily, into his mind."[৩৫]

রোমান্টিক ভাবকল্পনা-ঐশ্বর্যের এটি এক চরম নিদর্শন। ফ্রেদেরিকের অনুভূতি কল্পনার পক্ষ অবলম্বন করে, অতীত, বর্তমান্ ভবিষ্যতের সীমানা ছাড়িয়ে, দৃশ্যমান অসংখ্য প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে জলে-স্থলে আকাশে। চেতনার এই 'visual image', মানসিক প্রক্রিয়ার নাটকীয় রূপ ফ্লবেয়ারের শিল্পরীতির এক অসামান্য বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই নভোবিহারী ভাবকল্পনাকে কঠিন বাস্তবের পীড়নে ব্যর্থতার পরিণতি দিতে ফ্লবেয়ারের কঠোর লেখনী সমভাবে তৎপর। উপরে উদ্ধৃত রোমান্টিক কল্পনাবিহারের পরমুহূর্তেই ফ্রেদেরিক এই ভাববিলাসের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন। "As for trying to make her his mistress, he was certain that any attempt would be vain." কাহিনীর প্রারম্ভে ফ্রেদেরিকের বয়স আঠার, শেষে পয়তাল্লিশ। এই শেষ পর্যায়ে তার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরাভূত, কামনাবাসনা স্তিমিত, অনুভূতি পাণ্ডুর। "......the violence of desire the flower of sensation itself withered. His intellectual ambitions had also dwindled. Years passed ; and he endured the idleness of his mind and the stagnation of his heart."[৩৬] প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় শেষ সাক্ষাতের সময় "......Once more he was siezed with a stronger desire than ever—a frantic ravening lust. Yet he also felt something he could not express—a repugnance, a sense of horror, as of an act of incest."[৩৭] ভস্মে পরিণত হওয়ার পুর্বমুহূর্তে এ যেন অন্তিম দীপ্তি। আরও একটা ভয় তার চিত্তকে অধিকার করেছিল,—"......the fear of disgust that might follow."

তেমনি, এম্‌মা ও লিওঁর প্রণয়জীবনের শিখর মুহূর্তে, "They began to

talk more of things indifferent to their love.......she would look forward to a profound happiness at next meeting, then have to admit that she felt nothing remarkable. Disappointment was quickly overlaid by fresh hope and Emma returned to him still more ardent and more avid." মানসিক প্রক্রিয়াকে নাটকীয়ত্ব দান, অনুভূতির দৃশ্যমান প্রতিফলন, যা ফ্লবেয়ারের শিল্পবৈশিষ্ট্য, পরবর্তী বর্ণনায় তা প্রকট। "She snatched off her dress and tore at the laces of her corsets, which whistled down her hips like a slithering adder. She tiptoed to the door on bare feet to make quite sure it was locked ; then made a single movement and all her clothes fell to the floor. Pale, silent, serious, she sank into his arms with a long shudder." [৩৮]

লিওঁর অনুভূতিও তেমনি রাহুগ্রস্ত। এম্‌মার ঘর্মবিন্দুসিক্ত ভ্রুযুগলে, অস্থির চক্ষুতারকায়, তার দৃঢ় বাহুবন্ধনে "...there was something extreme, mysterious, mournful, which seemed to Leon to come subtly between them, to set them apart. ......What had charmed him once, now frightened him a little. Moreover, he resented her progressive absorption of his personality. He could not forgive Emma that continual conquest.[৩৯] সর্বগ্রাসী প্রেমে লিওঁকে আত্মসাৎ করেও এম্‌মা ভাবছে "Vain dream ! There was nothing that was worth going far to get ; all was lies"[৪০] এম্‌মাকে সম্পূর্ণ পেয়েও লিওঁ ভাবছে, "Every run-of-the-mill seducer has dreamed of Eastern queens. Not a lawyer but carries within the debries of a poet."[৪১] মানবচিত্তে রম্যকল্পনার স্থান চিরন্তন, বাস্তবের আঘাতে তার অবরোহণ স্বাভাবিক পরিণতি। আমাদের সকলের অন্তরেই অল্পবিস্তর একটি এম্‌মার বাস আছে, আছে তার পরাভবের ইতিহাস। বাস্তবজীবনে এম্‌মার চরিত্র কার প্রতিলিপি একথা জিজ্ঞাসা করলে ফ্লবেয়ার বলেছিলেন, "It is me."

এই ব্যর্থতা ফ্লবেয়ারের বাস্তবানুগ উপন্যাসের কেন্দ্রীভূত মূল-অনুভূতি।

মানবজীবনের ব্যর্থতা অতি সাধারণ পরিণতি, কিন্তু ফ্লবেয়ারের হাতে এই সাধারণ পরিণতি এক অসামান্য তাৎপর্য্যে মণ্ডিত। "There is no crash, no disaster—if this that makes it so horrifying—life simply comes to an end. When you look into it, you find that there is nothing there".[৪২] মানবজীবনের tragedy তার প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার জন্য মহীয়সী সংগ্রামের বিয়োগান্ত পরিণতি নয়, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্বেল তরঙ্গের ক্রমশঃ স্তিমিত গতিবেগের সৈকতবালুতটে নীরব নির্ব্বাণ। জীবন যখন পূর্ণতার পরমমুহূর্ত্তে, অনুভূতি যখন তীব্রতার শিখরশীর্ষে, তখন তার পাদদেশ থেকে উত্থিত এক অসার শীতলতা ধীর অগ্রগতিতে আচ্ছন্ন করে অনুভূতির উত্তাপকে, অবসন্ন করে সমগ্র চেতনা।

এই প্রকার অনুভূতির দ্বৈত ধারা প্রবাহের যুগপৎ সহাবস্থান বা এক স্তরের উপর অন্য স্তরের আরোপ এবং তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা-পদ্ধতি উপন্যাস সাহিত্যে ফ্লবেয়ারের নূতন ও প্রধান অবদান। এই পদ্ধতির চরম নিদর্শন 'দি সেণ্টমেণ্টেল্ এডুকেশন' উপন্যাসে ফেদেরিকের প্রেমজীবনে চারটি নারীর প্রভাব। তার মানসিক দর্পণে চারজন নারীর চারটি প্রতিবিম্ব একেবারে স্বতন্ত্র না হয়ে একে অপরের দীপ্তিকে কখনও উজ্জ্বল কখনও ম্লান, কখনও অনুপূরক, কখনও প্রতিপূরক। ফেদেরিকের মানসপ্রাঙ্গণে তাদের একের আসা-যাওয়ার পথের বাতাস অপরের দেহসৌরভ-মিশ্রিত। এই চারজন নারী যেন ফেদেরিকের চেতনার চার প্রধান বৃত্তির মানসপ্রতিমা ; লুইসে পবিত্রতার, ম্যাদাম আর্নু রোমান্টিক প্রেমের, রজানেৎ প্রকৃতির, আর ম্যাদাম দাঁব্রোজ সভ্য ও মার্জ্জিত জীবনের।

ফেদেরিকের জীবনে রজানেৎ ও ম্যাদাম আর্নুর প্রভাবের পারস্পরিক বর্ণনায় লেখক লিখেছেন : এই দুইটি নারীর সঙ্গ যেন তার জীবনে দু'টি সঙ্গীতের সুর,—একটি প্রফুল্ল, বেপরোয়া, কৌতুকপ্রদ, আরেকটি গম্ভীর প্রায় ধর্মভাবাশ্রিত ; এবং এই দু'টি সুর পাশাপাশি ধ্বনিত হয়ে, প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ধীরে ধীরে ঐক্যতানে মিলিত হয়ে যায়, "......for, if

Madame Arnoux merely brushed him with her fingure, his desire at once evoked the image of the other woman, since, in her case, his hopes were less remote; and if in Rosanette s company his heart should fiill with tenderness, he would immediately remember his great love."[৪৩]

অথবা, ম্যাদাম দাঁব্রোজের বেলায় তার মানসিক অবস্থা। সমগ্র সত্ত্বা আচ্ছন্ন করে যে মহান্ উল্লাস ম্যাদাম আর্নুর প্রতি তাকে প্রণোদিত করত বা প্রথম পর্যায়ে যে উৎফুল্ল অনুভূতির উদ্বেলতার মধ্যে রজানেৎ তাকে নিক্ষেপ করত, ম্যাদাম দাঁব্রোজের কাছে তা সে পেত না। তবুও সে তাকে কামনা করত, "......as a singular, unattainable object, because she was noble, because she was rich, because, she was devout,......he felt she would wear holy medals next her skin and turn modest suddenly in the midst of debauchery".[৪৪] শেষের দিকে ম্যাদাম দাঁব্রোজের উদ্দেশ্যে তার ইন্দ্রিয়গুলি তেমন সজাগ সাড়া দিত না, সে নিজেও একথা স্বীকার করত, কিন্তু তবু তার প্রতি তার কামনার আবেগবোধ নিরস্ত হত না "......but in order to feel it, he had to call up the image of Rosanette or Madame Arnoux".[৪৫]

এই প্রকার অনুভূতির বিভিন্ন স্তরের বিরোধ, সমন্বয়, সহাবস্থান রূপায়নে ফ্লবেয়ার যে বিশিষ্ট প্রকাশ-পদ্ধতির উদ্‌ভাবন ও প্রয়োগ করেছেন পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের—বিশেষ করে জেমস্ ও কনরাডের,—উপর তার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মানব-সম্পর্কের সমস্যার চিত্রণে তাদের প্রয়াস মার্টিন টার্নেলের ভাষায়......"was essentially the one practised by Flaubert and it is inconceivable that they could have produced the masterpieces they did without his example'.[৪৬]

"The artist should so arrange matters that posterity will believe that he has never lived."[৪৭] এই ছিল শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্ক

সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিকতার উপাসক ফ্লবেয়ারের অভিমত। তিনি নিজে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর রচনায় অনুসরণ করেছেন এই নৈর্ব্যক্তিকতার এবং তাঁর বাস্তবভিত্তিক কাহিনীকে লেখকের কণ্ঠস্বরে বিঘ্নিত না করে এবং নিজেকে যথাসম্ভব অন্তরালে রেখে পাঠকের মনে প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই প্রচেষ্টায় তাকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে তার সমাধানকল্পে তিনি যে রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা উপন্যাস-সাহিত্যে একটা অনুকরণীয় model-র মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

'ম্যাদাম বোভারী' ও 'দি সেন্টিমেণ্টাল এডুকেশন' এই উভয় উপন্যাসে যে জগৎ বর্ণিত দেখতে পাই, লেখক তাকে প্রধানতঃ এম্মা ও ফেদেরিকের চেতনার প্রতিবিম্ব রূপে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু এম্মা ও ফেদেরিকের চেতনার আলেখ্য এই দুই উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হলেও তাদের সীমিত দৃষ্টি ও অনুভূতির মাধ্যম এই রূপায়নের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কেননা, প্রথমতঃ লেখক এই গুরুদায়িত্বের সমকক্ষ করে তাদের সৃষ্টি করেন নি, তার উদ্দেশ্যও তা ছিল না। এম্মাকে তিনি নির্বোধ দুর্ব্বলচিত্ত, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বলে চিত্রিত করেছেন; ফেদেরিকেরও চেতনা সাধারণের ঊর্দ্ধে বলে চিত্রিত হয় নি। তাছাড়া, তারা স্বয়ং যে পারিপার্শ্বিকের প্রতিভূ ও ফলস্বরূপ তার সামগ্রিক স্বরূপ বিকাশে তারা স্বভাবতঃই প্রথম। হেনরী জেমসের ভাষায় "He wished in each case to make a picture of experience—middling experience, it is true—and of the world close to him; but if he imagined nothing better for this purpose than such a heroine, both such limited reflectors and registers, we are forced to believe it to have been by a defect of his mind",[৪৮] ফ্লবেয়ারের নিজের মানসিক দৈন্যের জন্যই হোক বা না হোক, একথা সত্য যে এম্মা ও ফেদেরিক উভয়ের চেতনা 'limited reflectors and registers.'

এই ত্রুটি সম্বন্ধে ফ্লবেয়ার নিজে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং ছিলেন বলেই তিনি প্রয়োজন বোধে নৈর্ব্যক্তিকতার আড়াল থেকে সামনে এসে কাহিনীর সূত্র নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন; কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এবং নিতান্ত প্রয়োজনের মাত্রা কোনমতেই অতিক্রম না করে। এরূপ প্রয়োজন ছিল এম্মার পরিবেশ

ইঅভিল্ সহর ও সেখানকার বাসিন্দা—এম্মার প্রতিবেশীদের যথার্থ স্বরূপ চিত্রণে। পার্সি লুব্বকের কথায় "Her pair of eyes is not enough ; the picture beheld through them is a poor thing in itself, for she can see no more than her mind can grasp; and it does her no justice either, since she herself is so largely the creation of her surroundings".[৪৯] 'সেন্টিমেণ্টাল এডুকেশন'-এ প্যারীর বুর্জোয়া সমাজ ও তার পরিবেশ রচনার ব্যাপারে ফেদেরিকের চেতনা সম্বন্ধেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। পাঠকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সৃষ্টির সহায়ক কল্পে বা ফেদেরিক ও এম্মার চেতনায় তাকে সক্রিয় অংশীদার করে তোলার উদ্দেশ্যে লেখক নিপুণহস্তে 'scenic' পদ্ধতির—কখনও কখনও যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করেছেনও, যেমন বলনাচ, পশুমেলা, থিয়েটারে সন্ধ্যা, রুআঁর গির্জায় লিওঁ ও এম্মার সাক্ষাৎ (ম্যাদাম বোভারী), মুখোশ নাচ, আর্নু-গৃহের আসবাবপত্রের নীলামবিক্রয়, ফেদেরিক ও ম্যাদাম আর্নুর শেষ সাক্ষাৎ (দি সেন্টিমেণ্টাল্ এডুকেশন্)। যখন এম্মা বা ফেদেরিকের চেতনার উর্দ্ধে "more enlightened, more commanding height" থেকে ঘটনাপ্রবাহের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেছেন তখন লেখক panoramic (series of continnous picture-making) পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, যেমন ওমে, বিনে, লোরো বা মঁসিয়ে আর্নু, মঁসিয়ে দাঁব্রোজ প্রভৃতির জগত-চিত্রণে। কিন্তু সমস্যা এই যে, "When one has lived *into* the experience of somebody in the story and received the full sense of it", তার থেকে সহসা বিচ্ছিন্ন হলে এই অভিজ্ঞতার গাঢ়তার চ্যুতি ঘটে এবং ফলে, কাহিনী অবাস্তব বলে মনে হয়।

নায়ক-নায়িকার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তরণের বাঁধাকে যতদূর সম্ভব সহজ করার উদ্দেশ্যে ফ্লবেয়ার তাঁর নায়ক-নায়িকাকে পাঠকের কাছ থেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছেন সর্বদা, যাতে পাঠক নায়ক-নায়িকার চেতনায় নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে না ফেলে। তাই, যখন লেখক এমন কি নায়ক নায়িকার চিত্তে প্রবেশ করে থেকেছেন, তখনও তিনি তাদের থেকে এমন একটা দূরত্ব, একটা অনাসক্তির ভাব বজায় রেখেছেন যা পাঠককে নায়ক-

নায়িকার চেতনায় সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ থেকে রক্ষা করেছে। এই দূরত্ব সাধন সম্ভব হয়েছে লেখকের বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার দ্বারা। 'ম্যাদাম বোভারী' ও 'দি সেন্টিমেণ্টাল্ এডুকেশন' এই দুটি গ্রন্থ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টির সূক্ষ্ম প্রলেপলিপ্ত। পার্সি লুব্বক বলেছেন, "His irony gives him perfect freedom to supersede Emma's limited vision, whenever he pleases, to abandon her manner of looking at the world, and to pass immediately to his own more enlightened, more commanding height......Yet there is no dislocation here, no awkward substitution of one set of values for another ; very discreetly the same standard has reigned throughout".[৫০] এই শিল্পসম্মত পদ্ধতির দক্ষ প্রয়োগ দ্বারা ফ্লবেয়ার তাঁর বহু আলোচিত নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষায় সক্ষম হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের যে অপূর্ব দৃঢ় গঠন-সৌষ্ঠব তাঁর পরবর্তী যুগের সকল উপন্যাস-রচনায় আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত, তা scenie, dramatic এবং panoramic এই তিন শিল্পরীতির সুনিয়ন্ত্রিত সামঞ্জস্য প্রয়োগের ফল।

১০

ফ্লবেয়ারের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা তার উত্তরসূরিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তা তাঁর ব্যঞ্জনাত্মক সঙ্কেতের ব্যবহার। 'দি সেন্টিমেণ্টাল্ এডুকেশন' উপন্যাসে ম্যাদাম দাঁব্রোজ্‌কে একটা পার্টিতে নিরীক্ষণ কালে ফ্রেদেরিকের ভাববর্ণনায় লেখক লিখেছেন, "Frederic watched her. Her lustreless skin seemed to be stretched over her face ; it had freshness but no bloom, like a preserved fruit".[৫১] এ শুধু ম্যাদাম দাঁব্রোজেরই বর্ণনা নয়, তিনি যে সমাজের অধিবাসী সঙ্কেতের মাধ্যমে তারও বর্ণনা। 'streched' কথাটি সেই সমাজ জীবনের বেদনাদায়ক চাপের ইঙ্গিত, 'lustreles' এবং 'no bloom' সেই জীবনের পাণ্ডুরতা ও কৃত্রিমতার প্রতীক, "preserved fruit"-এ স্বাভাবিক সজীবতার অভাব এবং তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করার প্রয়াস সূচিত।

ফ্রেদেরিকের কাছে ম্যাদাম্ দাঁত্রোজের প্রসাধন কক্ষ মনে হল, "as quiet as tomb, and warm as alcove".[৫২] সমাধির সঙ্গে প্রসাধনকক্ষের তুলনা প্রেমের অসার্থকতার সূচনা এবং 'alcove' উত্তপ্ত, অস্বস্তিকর, বায়ুহীন জীবনের দ্যোতক।

ইঅঁভিল্ ত্যাগ করার আগে লিওঁ শেষবারের মত এম্মার বাড়ীর জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল ; তার মনে হল, "......he saw a shadow at her bed room window ; but just at that moment the curtain must somehow have escaped from its holder, for it slowly stirred and all at once shook out its longstanding folds, then fell into its place as straight and still as a plaster wall. Leon set off at a run".[৫৩] জানালার পর্দার এই সহসা স্খলন ও লিওঁর দৌড়ে চলে-যাওয়া তার প্রেমের অচরিতার্থ পরিণতির সঙ্কেত।

'ম্যাদাম বোভারী' ও 'দি সেন্টিমেণ্টাল্ এডুকেশন'-এ এই প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব প্রতিবিম্বে (image) অনুভূতির রূপান্তর-করণের দৃষ্টান্ত অসংখ্য। এই পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরালে লেখকের আত্মগোপনের একটা পথ। অনুভূতিকে সোজাসুজি বর্ণনা না করে এমন একটা প্রতিবিম্ব উপস্থিত করা হয় যেক্ষেত্রে "there is a complete indentity between image and feeling" যেমন উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে সুস্পষ্ট।

* * *

ফ্লবেয়ারের আর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্‌ভাবন অনুভূতির এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতান্ত্রিক প্রতিবিম্বের পুনরাবর্তন, মার্টিন টার্নেল যাকে বলেছেন "recurring image." এম্মার honeymoon এর দিবাস্বপ্নে গ্রন্থের প্রথম দিকে নীল রেশমী পর্দায় ঢাকা অশ্বশকটের উল্লেখ আছে ; আবার শেষের দিকে লিওঁর সাথে তার পর্দা-ঢাকা শকট বিহারের উল্লেখ রয়েছে ; অশ্বশকটের এই দুবার উল্লেখের পৃথক আবেদনে এম্মার প্রণয়-জীবনের প্রচণ্ড পরিবর্তন সূচিত। দ্বিতীয় শকট-বিহার এম্মার প্রথম honeymoon দিবাস্বপ্নের শকটবিহারের উপর নির্মম শাণিত বিদ্রূপ।

তস্ত্ থেকে ইঅঁভিল্ আসবার কালে গোছ-গাছ করার সময় বিয়েতে উপহার

পাওয়া একটি ফুলের তোড়ার তারে লেগে এম্মার হাত কেটে গেল। এই আঘাত তাকে তার বিবাহ জীবনের বিফলতাকে স্মরণ করিয়ে দিল; বিরক্ত হয়ে সে সেই ফুলের তোড়াটাকে আগুনে নিক্ষেপ করল, দাউ দাউ করে খড়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি সেটা জ্বলে উঠল ও ধীরে ধীরে সমস্তটা পুড়ে ছাই হতে লাগল; এম্মা তার দিকে চেয়ে থাকল, "......and the shrivelled paper petals hovered like black butterflies at the back of the fireplace and finally vanished up the chimney".[৫৪] শেষের দিকে লিওঁর সঙ্গে পর্দা-ঢাকা অশ্বশকটে প্রমোদবিহারে একবার যখন শহরের বাইরে গ্রামের মধ্যে দিয়ে গাড়ী যাচ্ছিল তখন "......an ungloved hand stole out beneath the little yellow canvas blinds and tossed away some scraps of paper, which were carried off on the wind and landed like white butterflies in a field of red clover in full bloom".[৫৫] আগুনে দগ্ধ ফুলের তোড়ার ভস্মের পরিণতি এম্মার বিবাহ জীবন ও গৃহজীবনের ব্যর্থতার প্রতীক; দ্বিতীয় দৃশ্যের সাদা প্রজাপতি প্রথম দৃশ্যের কালো প্রজাপতির প্রতিধ্বনি। পূর্ণ প্রস্ফুটিত রক্তিম লবঙ্গফুল প্রেমজীবনের এবং সাদা প্রজাপতি সেই জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের সঙ্কেত। একথা সত্য যে লিওঁর সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ থেকে তার সর্বনাশের সূত্রপাত।

কৃষি-প্রদর্শনীর ছয় সপ্তাহ পরে এম্মাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ব করার পরিকল্পনা অনুযায়ী রদলফ এক সন্ধ্যায় বোভারী-গৃহে উপস্থিত হল। সায়াহ্নের ম্লান আলোকে এম্মা একা। জানালার ছোট মসলিন পর্দাগুলির আড়ালে সান্ধ্য-প্রদোষ ঘনীভূত, অন্তিম সূর্য্যরশ্মির স্পর্শে "......the gilt on the barometer, touched by a last ray of sunshine, threw a blaze of fire on to the looking glass, between the indentations of the coral".[৫৬] ত্রিশ পৃষ্ঠা পরে আমরা এই ব্যারোমিটারকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখতে পাই। ইপোলিতের অঙ্গচ্ছেদের পর অপমানে ব্যর্থতায় কাতর চার্লস্ স্ত্রীর কাছে সান্ত্বনা-প্রার্থী হয়ে বলল,

"Kiss me, my dear"!

"Let me alone!" she flung out crimson with rage.

"Why? why?" he stammered in astonishment.

"Come, You are not yourself! You know I love you! come to me".

"Stop!" she cried in a terrible voice. And bursting from the room, Emma slammed the door behind her so hard that the barometer crashed to the floor.[৫৭]

প্রথম দৃশ্যে ব্যারোমিটারে সূর্য্যরশ্মির দীপ্তিশীল প্রতিফলন এম্মার চিত্তে রদলফের আবির্ভাবে কামনাদীপ্ত, উজ্জ্বল অনাগত প্রণয়জীবনের প্রতীক; দ্বিতীয় দৃশ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ বোরোমিটার অনাগত বিপদের সঙ্কেত। 'Recurring Image'এর এই রকম অনেক দৃষ্টান্তে ফ্লবেয়ারের সমগ্র রচনা সমৃদ্ধ। সঙ্গীতের স্থায়ী লয়ের মত উপন্যাসের অন্তর্নিহিত আবেদনের রেশকে জাগ্রত রাখা এই সাঙ্কেতিকতার আর একটি মহৎ গুণ।

পরবর্তী কালে symbolist দের রচনায় সঙ্কেতের সার্থক ব্যবহার ফ্লবেয়ার-সাঙ্কেতিকতার কাছে ঋণী; আর তার recurring image এর ব্যবহার শুধু ভবিষ্যৎ উপন্যাসে নয়, এমন কি পদ্যের উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং মার্টিন টার্নেলের মতে "......it points the way to the themes of Proust and Joyce".[৫৮]

১১

মূলতঃ রোমান্টিক হলেও ফ্লবেয়ারের রোমান্টিকতা প্রকৃতির বহিরাঙ্গনের বর্ণাঢ্যতায় ততটা মুগ্ধ ছিল না, যতটা ছিল এই বহির্জগতের প্রেরণা-প্রসূত অন্তর্জীবনের ভাবসমৃদ্ধিতে। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন "I have almost a voluptuous sensation simply from seeing things, so long as I see them well".[৫৯] তাই ফ্লবেয়ারের রোমান্টিকতা অন্তর্মুখী না করে করেছিল প্রেরণার উৎস-সন্ধানে বহির্মুখী। জর্জ পোলে সত্যই বলেছেন "The starting point with Flaubert is thus not Flaubert himself; it is the rapport between the perceiving self and the object perceived." ফ্লবেয়ার তাঁর একটি পত্রে লিখেছেন "Sometimes by dint of gazing at

a pebble, an animal, a picture, I felt myself enter into them. Communications between human beings are not more intense".[৬০]

ফ্লবেয়ারের রচনায় এই যে অনুভূতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে রূপায়ন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর অনুভূতিরূপে প্রকাশন, যা তাঁর ষ্টাইলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তার মূলে আছে মানবের মন ও বস্তুজগৎ এই দুইয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক অন্তর্গূঢ় সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার দৃঢ় প্রত্যয়। প্রেরণার স্পর্শে এই সম্পর্ক যখন সক্রিয় হয় তখন অনুভবশীল মানস ও অনুভূত বস্তু যেন দুইটি বিচ্ছিন্ন পর্বতপার্শ্বের মত ক্রমশ পরস্পরের নিকটবর্তী হতে থাকে, তাদের ব্যবধান ক্রমশ সংকীর্ণতর হতে থাকে এবং অবশেষে এই ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যায়, "......one degree more, and you become nature or nature becomes you".[৬১] এই চরম মুহূর্ত যখন আসে তখন "the self is identified with the universe and has for a moment the experience of the eternity".[৬২] এই চরম মুহূর্ত ফ্লবেয়ারের কাছে সাধারণতঃ ধরা দিয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই পথ ধরে।

এম্মার জীবনে এমন একটি মুহূর্তের পরিচয় আমরা পাই অরণ্য-বিহারে তার প্রথমবার রদলফের কাছে আত্মসমর্পণের সময়।

> "The evening shadows were falling. The sun, low on the skyline, shone through the branches dazzling her. Here and there around her the leaves and the earth were dappled with a flickering brightness, as though humming birds had shed their wings in flight. Silence was everywhere. Sweetness seemed to breathe from the trees. She felt her heart beginning to beat again, and the blood flowing inside her like a river of milk. Then, far away beyond the forest, on the other side of the valley, she heard a strange, longdrawn cry that hung on the air, and she listened to it in silence as it mingled like music with the last vibrations of her jangled nerves".[৬৩]

এই উদ্ধৃতিতে লেখক ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে এমন এক দিগন্তব্যাপী প্রসারতায় বিস্তার করেছেন যে এই মুহূর্তটি জীবনের অন্যান্য সাধারণ মুহূর্ত থেকে ঘনত্বে ও স্থায়ীত্বে একেবারে ভিন্ন। এই মুহূর্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও অনুভবশীল মনকে এক নিরঙ্কুশ একত্ববোধ দ্বারা একত্র প্রথিত করে, মন, দেহ, প্রকৃতি এবং জীবন সকলকে যেন সঙ্গীতের বিভিন্ন যন্ত্রের মত এক ব্যাপক ঐক্যতানে বিশ্বতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহাবস্থানে উন্নীত করেছে।

* * * *

ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে মানস-চেতনার এই বিস্তার অতীত স্মৃতির মন্থন থেকেও জন্মলাভ করতে পারে ; এবং সেক্ষেত্রে অন্তরে সঞ্চিত অতীত অভিজ্ঞতা কোন একটা অনুরূপ সাহচর্যে সঞ্জীবিত হয়ে, পূর্বের চেয়ে তীব্রতর ও ঘনতর আবেদন নিয়ে চেতনায় পূর্ণজন্ম লাভ করতে পারে। সমসাময়িক স্পর্শচেতনা নিরপেক্ষ এবং অন্তরের নিভৃত কক্ষ থেকে সঞ্জাত হয় বলে অনুভূতির এই পুনঃ উপলব্ধি হয় গভীরতর ও নিবিড়তর। ফ্লবেয়ারের ক্ষেত্রে চেতনার এই বিস্তার বর্তমান ইন্দ্রিয়ানুভূতির চেয়ে অতীত অভিজ্ঞতার উপর অধিক নির্ভরশীল ছিল। তাই, তাঁর উপন্যাসে স্মৃতিচারণার পরিসর প্রশস্ত। বর্তমানের কোন ব্যঞ্জনা বা সাহচর্যে উদ্দীপ্ত হয়ে এই স্মৃতি অতীত জীবনের কোন সুদূর শৃঙ্গে সহসা উপনীত হয়ে ধীরে ধীরে বর্তমানের দিকে অবরোহণ করতে থাকে—এই অবরোহণের পথে স্মৃতির পর স্মৃতি, যেন হাত ধরাধরি করে একটি মানসপটে উদয় হতে থাকে। "......the most striking characteristic indeed of the phenomena of the memory in Flaubert is seriality" বলেছেন জর্জ পোলে, "One memory calls up another, then still another ; and so on ; and each rises into view under the form of an image, which is covered and replaced by the following slide, as in the projection of a magic lantern".[৬৪]

যেমন, বাবার চিঠি হাতে নিয়ে এম্‌মার স্মৃতিচারণা :

"........she could almost see her father bending down over the hearth to pick up the tongs. How long it was since she had sat at his side, on the settee by the fire, holding a stick

in the great bracking furge flames. she remembered a summer evening filled with sunshine : foals that whinnied as you passed and went galloping galloping away and sometimes the bees circling in the sunlight would bounce against the panes like golden balls. Happy days, days full of hope and freedom days rich in illusion !"

স্মৃতির পর স্মৃতি যেন একটার কাঁধে হাত দিয়ে আরেকটা, সময়ের ব্যবধান অবলুপ্ত করে তার অতীতকে মূর্ত করে তুলল ; ঠিক তার পরেই স্মৃতির অবরোহণ সুরু :

"She had no illusions now. She had laid them out in all the varied ventures of her soul, the successive phases of maidenhood marriage and love strewing them along her path like a traveller who leaves behind a portion of his gold at every wayside inn."[৬৫]

কৌমার্য্য বিবাহ, প্রেম……সমস্ত পরিক্রমা করতে করতে স্মৃতি নেমে দাঁড়াল বর্তমানের কঠোর বাস্তবে……এখন আর তার কোন মোহ নেই… ।

আবার, বিনের কাছে অর্থ ধার না পেয়ে তার মেয়ের নার্স ম্যাদাম কোলের বাড়ীতে চিন্তাশক্তি-রহিত মানসিক বিবশ অবস্থায় :

"At last she collected her thoughts. She rememberd one day with Leon (how long ago !)……the river glittering in the sun …… the scent of the clematis……swept down the seething torrent of her memories, she soon returned to the recollection of the previous day."[৬৬]

অতীতের এক শীর্ষবিন্দু থেকে যাত্রা সুরু করে পরবর্তী সমস্ত জীবন পরিক্রমা করে ধীরে ধীরে অবতরণ করে নেমে এল স্মৃতি বর্তমান মুহূর্তের দ্বারে। একদিন সে ও লিওঁ সকাল সকাল পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলে ফিরবার পথে তার কৈশোরের শিক্ষাবাস কন্‌ভেণ্টের দেওয়াল চোখে পড়ল, গাছের নীচে একটা বেঞ্চিতে বসে সে তার অতীত স্মৃতিতে ডুবে গেল :

"The first months of her marriage, her rides to the forest, the viscount waltzing, Lagardy, singing evrything passed before her eyes once more ; and Leon seemed suddenly as remote as the rest." ৬৭

গভীর চিন্তামগ্ন যখন সে, তখন একটা কাংশ ঝন্ ঝন্ শব্দে বাতাস বিদীর্ণ হল এবং কন্‌ভেন্টের ঘণ্টায় ঠং ঠং করে চারটে বাজল।

"Four o' clock. She felt she had been there an eternity. An infinitude of passion can be got into a minute like a crowd in a small space."৬৮

অনুভূতির এই চরম মুহূর্ত চেতনা প্রবাহের একটি সীমান্ত বিন্দু, সেখানে কালের সীমারেখা অবলুপ্ত, যেখানে অতীত বর্তমান একই চৈতন্যপ্রবাহের অঙ্গীভূতরূপের পরস্পর সম্মিলিত যে মুহূর্তে"......The self is identified with the Universe and has for a moment the experience of eternity." প্রুস্ত সত্যই বলেছেন "I confess that I am astounded to find a man being treated as having little gifts of writing who ....has renewed our vision of things almost as much as Kant with his categories, his theories of knowledge and the Reality of the external world" ৬৯

১২

তাঁর সৃষ্ট প্রায় সবগুলি প্রধান চরিত্রের সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন, নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে জীবনকে পূর্ণগঠনের প্রয়াস ব্যর্থ, একের পর এক নবলব্ধ সম্পর্ক ভগ্ন। সামাজিক গোষ্ঠী-চেতনা থেকে বিচ্যুত, নিঃসঙ্গ, ছিন্নমূল তারা অবাঞ্ছিত জীবনের ভারে দলিত, ক্লিষ্ট। এই অন্তর্শক্তিহীন, সাধারণ, ক্ষুদ্র মানুষগুলির ব্যক্তিজীবনের হতাশার মধ্যে, তাদের অচরিতার্থ প্রেম-জীবনের মধ্যে, অনুভূতির পাণ্ডুরতার মধ্যে এবং অন্তিম শূন্যতা ও রিক্ততার মধ্যে আধুনিক পাঠক তার অনির্দিষ্ট সংসার যাত্রার ক্লান্তি ও অবসাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়, পায় সান্নিধ্য পেলব ভাবালুতামুক্ত অনিবার্য কঠিন দৃঢ় বাস্তবের; এবং পায় বলেই এখনও

আধুনিক মানসের উপর ফ্লবেয়ারের রচনার প্রভাব ও আকর্ষণ এত বিস্তৃত ও গভীর।

* * * * *

কোন কোন সমালোচক তাঁর রচনায় দেখতে পেয়েছেন "Contrast between maturity of expression and immaturity af feelings expressed."[১৩] সুদক্ষ পরিপক্ব প্রকাশক্ষমতা কেবলমাত্র অপরিপক্ব অনুভূতির প্রকাশে নিয়োজিত হয়েছে বলে তারা খেদ প্রকাশ করেছেন। হেন্‌রী জেমস দেখেছেন তাঁর রচনায় কৃশ মানবচেতনা ও বলিষ্ঠ শিল্পচেতনার সংঘর্ষ। তিনি মনে করেন, যে অতুলনীয় বলিষ্ঠ শিল্পনৈপুণ্যের গুণে তিনি হয়েছিলেন একজন সার্থক লেখক, মানবজীবনের, বিশেষ করে ফ্রান্সের তদানীন্তন জীবনের এমন অনেক দিক ছিল যার উপর তিনি তার এই শক্তি প্রয়োগ করেন নি, বা যা তাঁর কাছে ধরা পড়ে নি। এম্‌মা ও ফেদেরিককে মানবজীবনের সাধারণ প্রতীক করে সৃষ্টি করেছিলেন বলে ইচ্ছা করেই তাদের চেতনাকে গভীর ও জটিল করা সঙ্গত মনে করেন নি মেনে নিলেও, যে সব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—বোভারীরা, ফেদেরিকরা, বুভাররা, পেক্যুশেরা—তারা তার ব্যক্তি-মানসের যে প্রসারতার ইঙ্গিত বহন করে তা খুব গভীর ও সুদূরদর্শী বলে মনে হয় না। তিনি যে এদের চেয়ে জটিল ও গভীর চরিত্র সৃষ্টিতে হাত দেন নি, সে কি তিনি পারতেন না বলে, প্রশ্ন তুলেছেন হেন্‌রী জেম্‌স।

পারুন বা না পারুন সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে, একথা জেমস্‌ এবং অন্য সকলেই স্বীকার করেছেন যে যেটুকুতে ফ্লবেয়ার হাত দিয়েছেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে, অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে সেটুকু চরম সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছেন। যেখানে শিল্পীর স্রষ্টারূপে মাহাত্ম্য সে মহিমা তিনি অর্জন করেছেন। হেনরী জেমস্‌ বলেছেন, "Where else shall we find in anything proportionately so small such an air of dignity of size? Flaubert made things big—it was his way, his ambition, his necessity......"

শিল্পসৃষ্টিতে এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, কঠোর অনুশীলন, নির্মম শিল্পানুগত্য উপন্যাস রচনার উজ্জ্বল অনুকরণীয় আদর্শ। তার মতে ম্যাদাম বোভারী অনেক ত্রুটি

সত্বেও সাহিত্যে আর্টের চরম উৎকর্ষের এমন এক সুনিশ্চিত নিদর্শন যে উপন্যাসরচয়িতাদের গায়ে এটি যেন এক মন্ত্রশক্তি পূত গাত্রাবাস যাকে তারা 'flag of the guild' বলে গর্বের সঙ্গে ধারণ করতে পারে। পরবর্তী উপন্যাসরচয়িতাদের উপর ফ্লবেয়ারের গভীর প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর এমন কি একজন কঠোর সমালোচক লিখেছেন, without him they might not have written at all and if they had, their works would have been much less impressive than they are.[৭২]

পাদটীকা

১. House of Fiction : Esseys on Novel by Henry James ed. by Leon Edel, পৃ ১১৮, ২. Percy Lubbock : The Craft of Fiction পৃ ৯২, ৩. Martin Turnell : The Novel in France পৃ ২৫৬, ৪. ঐ ২৫৩, ৫. Henry James : House of Fiction ২০৯-১০, ৬. Martin Turnell. The Novel in France ২৪৯, ৭. Lytton Strachey Landmarks in French Literature ২০৩, ৮. ঐ ২০৭, ৯. Henry James : House of Fiction ১৯৪, ১০. Martin Turnell : The Novel in France ২৬৫, ১১. Henry James : House of Fiction ১১৯, ১২. Flaubert : Madam Bovary (Panguin Classics) ৪৭, ১৩. ঐ ৬৯, ১৪. Martin Turnell ; The Novel in France ২৭০, ১৫. Flaubert : Madame Bovary ১৬১-৬২, ১৬. Martin Turnell : The Novel in France ২৭২, ১৭. Flaubert : Madame Bovary (Penguin) ২০৩, ১৮. ঐ ১৯৩, ১৯. ঐ ২৯৪, ২০. ঐ ৩০১, ২১. ঐ ৩০২, ২২. Percy Lubbock : The Craft of Fiction ৮০, ২৩. ঐ ৮৩, ২৪. Henry James : House of Fiction ৩১১, ২৫. Geoffrey Bereton : A Short History of French Literature ২২২, ২৬. Martin Turnell : The Novel in France ৩১৪, ২৭. ঐ ৩১৫, ২৮. Henry James House of Fiction ২১৩, ২৯. Flaubert : Madame Bovary ২৪৬, ৩০. Henry James : House of Fiction ২০৯, ৩১. Martin Turnell : The Novel in France ৩১৫, ৩২. Henry James : House of Fiction ২০৮, ৩৩. ঐ ২১৬, ৩৪. Flaubert : Madame Bovary ৫৩, ৩৫. Flaubert The Sentimental Education (Everyman's Lib.) ৬৫, ৩৬. ঐ ৩৮৯,

৩৭. ঐ ৩১২, ৩৮. Flaubert : Madame Bovary ২৯৩, ৩৯. ঐ ২৯৩-৪, ৪০. ঐ ২৯৫, ৪১. ঐ ৩০১, ৪২. Martin Turnell : The Novel in France ২৬২, ৪৩. Flaubert : The Sentimental Education ১৬৩, ৪৪. ঐ ৩৩৯, ৪৫. ঐ ৩৪৮, ৪৬. Martin Turnell : The Novel in France ৩০৯, ৪৭. Geoffrey Bereton : A Short His. of French Literature ২২৩, ৪৮. Henry James : House of Fiction ২০০, ৪৯. Lubbock : Tha Craft of Fiction ৮৬, ঐ ৫০. ঐ ৯০, ৫১. Flaubert The Sentimental Education ১২৩, ৫২. ঐ ৩৩৯, ৫৩. Flaubert Madame Bovary ১৩৩, ৫৪. ঐ ৮১, ৫৫. ঐ ২৫৬, ৫৬. ঐ ১৬৭, ৫৭. ঐ ১৯৮, ৫৮. Martin Turnell : The Novel of France ৩০০, ৫৯. Georges Poulet : Studies in Human Time ২৪৮, ৬০. Quoted from Flaubert : Corréspondence ২১০, ৬১. Georges Poulet : Studies in Human Time, quoted from The Temptation of St. Anthory পৃ ৪১৭, ৬২. ঐ ২৫২, ৬৩. Flaubert : Madame Bovary ১৭৩, ৬৪. Georges Poulet : Studies in Human Time ২৫৩, ৬৫. Flaubert : Madame Bovary ১৮৪, ৬৬. ঐ ৩২৮, ৬৭. ঐ ২৯৪, ৬৮. ঐ ২৯৫, ৬৯. Martin Turnell : The Novel in France ২৯৯ (quoted), ৭০. ঐ ৩০৬, ৭১. Henry James : House of Fiction ২০৯, ৭২. Martin Turnell : The Novel in France ২৯৯.

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তাদের কথা

যে গেল

৯-৪৫ সকাল বেলা
চাকার আওয়াজে পথ অন্ধ
এখানে যে সে আলোয় একা ॥

পাতা

পাতা পাতা পাতা
একটু বাতাস
আলো ছায়া ॥

দ্রষ্টা

ওরই দেহে কোথাও
আলো, কোথাও ছায়া
তার চা হনিতে ঘুম ॥

গ্রহণ

ফিকে চাঁদের আলোয়
তারা চেয়েছিল
একটি গাছের নিচে ছায়া গাঢ় ॥

ad hoc

না বাড়ি না হোটেল তারা
একটি খালি কুপে
২-৩০ কাটোয়া লোকাল্ ॥

da capo

অমন ভোরে লিলিপুলের ধারে
বিদায় নিতে এসে
তারা আবার হারাল ॥

স্বপ্ন

দুটি স্তন-চূড়া
মাঝে ঘুম
বাতাসের গায় মেঘ ॥

মিথুন

এপারে অন্ধ গলি দিশাহারা
উপরে ক্ষীণ চাঁদের সাঁকো
তারা পার হতে গিয়ে কেঁপেছিল ॥

alba

তারা বেঞ্চিতে, পিছনে পূব,
সে যদিবা খোঁপা সামলায়
ছায়া পড়ে ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

ওরা

পুরস্কার ভিক্ষে করছে দু'তিনটে বুড়ো শালিকের
প্রাণ-মন-আত্মা-যাই বলো,
দালাল অনেকে।
হয়তো চড়ুই কিংবা কাক।
ঈশ্বর বলেন—আহা থাক্ বেঁচে থাক্।

ষত্বণত্ব মাত্রাবোধ খুইয়ে সব
তাদের উদ্ভব।

এদিকে ভাঙছে নদী এক কূল, গড়ছে অন্যদিকে;
জীবন কখনো মেঘ্লা, কখনো-বা উজ্জ্বল রোদ্দুর
বাজার বিশেষ চড়া, পকেট ব্রহ্মার মতো ফাঁকা।
একালে কঠিন বেঁচে থাকা।

সময়ে জোয়ার আসবে, যথাকালে হিরণ্যকশিপু
সিংহের নখরে-দন্তে শেষ হবে—সেই পৌরাণিক
প্রসঙ্গটা জপ করে এ-মুহূর্তে অনেকে অনেকে—
সত্য-শিব-সুন্দরের ছেঁদোবুলি বাড়ায় উদ্বেগ।

একটি নিমগাছে ফুল। কয়েকটি মাস্তান আবীরে
সর্বাঙ্গ করেছে লাল, 'সিটি' দিচ্ছে তিনটি মেয়েকে।
'হরে-কৃষ্ণ' 'হরে-কৃষ্ণ' চ্যাঁচাচ্ছেই বেসুরো গায়ক,
ধেই-ধেই কীর্তনীয়া আত্মারামে বিভোর নায়ক।

বয়সে জর্জর বেঁটে নুয়ে-পড়া ঐতিহ্য, তবুও
পুষ্পিত টগরকুঞ্জে ফুল তোলে, হাসেন ঠাকুর

মানস রায়চৌধুরী

পুরোন রাজবাড়ী

সন্ধ্যা হয় নি তবু গায়ে লাগে সন্ধ্যার বাতাস
ঝাড় লণ্ঠনের কাঁচে তুলতে থাকে শিখাও রিন্‌রিন্
শব্দ বেশ মাদকতা ঢেলে দেয় শীতার্ত শিরায়
কালো মর্‌চে ঝরে গিয়ে খুলেছে মূর্তির চেনা মুখ
চাঁদের আলোয় সেই মুখটিকে মনে হবে ক্ষমাপ্রার্থী যেন
কার কাছে ক্ষমা ? এই সহজ কথটি বুঝতে বুক ভেঙে যায়
পুরোন রাজবাড়ী আর খিলানে অনেক শব্দ আছে
কিন্তু সহসাই বুঝি নির্জনতা, ভাগ্যাহত আমাকে এখানে
চূর্ণবালি পতঙ্গের সহযাত্রী করে রেখে যায়।

এই শহর

কলকাতা রেখেছে ধরে তার কোলাহল
হুগ্‌লীতে দয়াময় ফাবাক্কার জল
তোমার ঠোঁটেও আছে শুকনো রং গাঢ়
শুকোতে শুকোতে গেল তিরিশ বছর, নীল পাড়
জ্যোৎস্নায় লৌকিক ছাঁদে পরিচিত হবে।
এখন ডিলাক্সে বসে জীবনের ভ্রান্তি দেখি, তবে
কোনও একদিন স্বপ্নে দিনরাত একাকার হয়ে
সমুদ্রের নুন করবে গ্রাস।
বেছে নিই আঙটির পাথরগুলি, তোমাকেও বাছি
ভন্‌ভন্ শব্দ করে মাথার ভিতরে ওড়ে মাছি।
"আগামী বসন্তে এসো" এই নিমন্ত্রণ
কার কানে পৌচেছিল, কি ভাবে কখন
কে আসে রাখতে কথা, শুধু কোলাহল
হুগলীর ঘোলা জলে কেয়ার শরীর পায় কাদার অতল।

শান্তিকুমার ঘোষ

চন্দ্রমল্লিকা

চন্দ্রমল্লিকা, যখন নিদ্রায় বিকল অর্ধেক পৃথিবী
ঘুম কেড়ে নিল কে তোমার চোখ থেকে।
এ চাঁদিনী রাতে কারা ফেরে নিশি-ডাকে
মরণ-ঘূর্ণিতে···
হীরার খনির খোঁজে যাত্রা করে অভিশপ্ত ক্ষণে :
জ্যোৎস্নায় সিংহের ছায়া—খনির প্রহরী।

চন্দ্রমল্লি, তন্দ্রাহারা মেয়ে
আধো রাতে প্রবীন গাছের তলে চাঁদের আলোয়
নতজানু করো কার কুশল প্রার্থনা।
অশিব আত্মারা আর করবে না ভর
তোমার উপর।

চন্দ্রমল্লি, জর্জর জীবনে আজ তোমকেই চাই
স্বপ্নের আধার ॥

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কোন্ রাস্তায়

কোন্ রাস্তায় গেলে পুরনো বাড়িগুলিকে দেখা যাবে
কোন্ রাস্তায় গেলে পুরনো প্রেমিক জীবন চোখে পড়বে
নিজেকে না মিশিয়ে দেখলে কবিতা হয় না
সব শিল্পে নিজের নিভৃত ছায়াপাত
একদিন সমস্ত সোনালী ফিরে আসবে বলে মনে করে লোক
মাঝে মাঝে আন্দোলন হয়
অকাতরে বুকের রক্তও মিশে যায় পথের ধুলোয়
কিছুই ফেরে না…
হাজার বছর ধরেও মানুষেরা মানুষ হয় না
আর এক মুখ সামনে থাকলেও
আর এক মুখ পিছনের দিকে বহুদূর দেখে
কারণ সেদিকটাকে বুকের ভেতর থেকে দেখা যায়।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

আপাতত একটি আশ্রয়

পাহাড় ঘিরে আলো, মেঘ—নদীর ঢেউ হঠাৎ
যদি স্তব্ধ হয়! মন,
কেমন করে বাঁচো! হৃদয় ঘিরে কেউ
যদি না আসে ফিরিয়ে দিতে হারানো সেই ক্ষণ।

এখানে শীত জমাট বাঁধা, অন্ধকারের মেলা
গুহাবাসে হৃদয় খোঁজে নদীর কাছে কাছে,

অঞ্জলিতে ভরে-আনা কয়েক ফোঁটা জলে
তৃষ্ণা বাড়ে। তৃষ্ণাটুকুই আছে।

যেও না তবু বাইরে, ওই আলোয়-ঘেরা পথে
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ছায়া—কঠিন কালো মৃত
ঝাউয়ের শিহর অপসৃত, শিশির শিহরণ
নেই, পালিয়ে এসো ঘরে। এখন আপাতত।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ভয়

কেমন থমথমে মুখ ক'রে সে
নিজেকে আড়াল করে রাখে;

সখী, তাকে বলো কালো জাম আকাশ দেখলে
আমার বড়ো ভয়
মনে পড়ে যায় কালবৈশাখীতে
ধলেশ্বরীর উথাল পাতাল;
মাঝির দু' ঠোঁটের মন্ত্রোচ্চারণ : বদর্ বদর্

কেমন থমথমে মুখ করে
সে নিজেকে আড়াল করে রাখে;

তাকে ছুঁতে গেলে না জানি
বিদ্যুৎ কী বজ্র হয়ে ওঠে,
না কি, দু' অঙ্গুলের স্পর্শে
শ্রাবণধারা নেমে আসবে?

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আড়াল

তিন বাঁকে আল বেঁধে তিন ভাগ করে নিয়েছি
অনেকটা টেরাবেকা হয়েছে বটে—
হাত বাড়ালে যেমন দেখি তোমার হাতটা
সরে গিয়েছে সমান্তরালে
তবু যোগ আছে ত্রিকোণে ত্রিভুজে।
বস্তুত মনের যোগটাই আসল ভেবে নিয়ে
তিন তারের বেড়া দিয়ে নিয়েছি
দাগ কেটে ঘরের চৌহদ্দি মেপেছি।
ফলত যে যার ঘর বুঝি নিয়ে
নিরিবিলি থাকলে পরেই নিরাবিল স্থিতি।
উঁকি মেরে ধুতির কসি বাঁধা দেখবে না।
বুকের কুটুস বোতাম থাকবে আড়ালে।
কেননা যখন তুমি আমার সঙ্গে থাকো
আমার মধ্যে থাকো না—
তোমার মধ্যেও না, কোন আবাসে
মন যেন ঘুরে বেড়ায়, দ্বিধায়
বটের পাতার মতো আন্দোলিত
বাতাসে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই বাতাসটাকে
তিন তরঙ্গে চালিয়ে ঘর বেঁধে নিয়েছি।
দরজায় পর্দা দিলে আর
আহ্বানে কোনো দ্বিমত থাকে না।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

মৃত্যু-সংক্রান্ত

ক. 'ঐ যে পাখিটা দেখছ, ও ভাবছে আবার জন্ম হবে।
হবে না নিশ্চিত জানি'—
বোঝাচ্ছেন দার্শনিক শোপেনহাওয়ার,
'জেনো ওর মৃত্যু হবে ভয়ঙ্কর ফুলের সৌরভে।
সাক্ষী থাকবে, তুমি নও, ঐসব নির্মম পাহাড়।'

খ. জানি না বলেই আজও এত অন্ধকার
মৃত্যুকে এখনো করি ভয়।
সে যদি সুন্দর হত দেবতারা সকলেই মরে যেত কবে
সুন্দরের অবহেলা হত না নিশ্চয়।

গ. কী যে সুখের মোহে সে আমাকে সারারাত সঙ্গ দিয়ে যায়,
ভালোবেসে দেয় না আলোক,
শীতের ভোরের মতো প্রতিদিন সূর্য ওঠে ঘন কুয়াশায়,
বুকের ভেতরে শুধু জেগে থাকে দীর্ঘ মহাশোক।

প্রদীপ মুন্সী

নিজেকে দেখি নি কোনদিন

সমস্ত সময় দু-চোখে ঘুম লেগে থাকে
চারদিকে দেখি
কোথায় কার কাছে বাকী আছে ঋণ
তোমরা এক সাথে বাস করো
রক্তের চোরকাঁটা তবু কেন পোড়ায়
তবে কি আমার নিজেরই কাছে
জমা আছে সব ঋণ
বুকের ভিতরে কোনদিন নিজেকে তো দেখি নি এমন

দেবপ্রসাদ ঘোষ

মরালিকা

অনেক তো হলো পরিক্রমা পরিশ্রম পথশ্রম ঢের
অরণ্য পর্বত নদী [illegible] এদের ওদের
ঘুরে ঘুরে দেখা হলো কথোপকথন
বহুক্ষণ।
আজ তবে কোন্ চন্দ্রাতপ চাও ?
কোন্ মরালিকা
তোমার আগুন শীতে হতে চায় অগ্নিবীন-শিখা
ডানার আভঙ্গে তুলে ঢেউ-কন্যাকুমারিকা অমন উধাও

কোন্ স্বাদু জল নেবে কোন্ সে প্রপাত
গলে গলে হাজার তারার রাত
নাব্য হবে।

দেখতে পাও না মরালিকা, সময়ের হাড়
হাড়ে হাড়ে বাজায় খঞ্জনী
কোথায় সে চন্দ্রাতপ ? ঢাকবে আতপ
এখানে তো অন্ধরাত সব স্বাদু স্বাদ অন্ধ গন্ধকের ক্ষার

শম্ভু রক্ষিত

লোকশ্রুতি

আমাদের বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নে অনূদিত হয়
প্রাগৈতিহাসিক মৃত্তিকার ত্যাগের মধ্যে আমাদের সমস্ত স্বর
শিল্পে নানান ক্ষুধা, মানুষের সমক্ষে অন্বেষণের আলো মাত্র নেই
পাখিদের ব্যাহৃতি ও প্রশ্ন নিয়ে ঔদার্য বিস্তৃতি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে
একথা এতদিন পরে আঁধারেরা বলাবলি করে যায়—বিচরণ করে না,
অনেক প্রহর নিরীক্ষণ শব্দ ব্যর্থ বা কুৎসিৎ তারাদের কল্পনা করে, আঁকড়ে ধরে
হৃদয়ের গৃহ ; আগুনের ব্যক্তীকৃত স্বর তাদের এসে দেখে যায়
সম্ভবত সার্থক বিশ্লেষণ চালিয়ে শিকারীরা ব্যবহার করে বিক্ষত অক্ষম যুবকদের
এ যাদের শুধু পলায়নপর ব্রত, সম্ভাবনা, দীর্ঘ হাহাকার
যেন দেখে তারা, পরিশ্রান্ত পাথরের বিচরণরত ত্যাগের গুঁয়া
মানুষেরা নিবাত আত্মত্যাগের কংকাল অরণিরা ওড়ায় না
ভিম্বাণুরা বোধ করে না বিক্ষত প্রহরীদের

তাদের সমহৃদয়ে পৃথিবীর কোন দেশের কোন পরিভাষা নেই
রহস্যাবৃত রাত্রি—উপবাস করা মেঘ—রাজপথের নীচে বিরহ—
অবহেলিত গাছপালা,
নদীর নকল অনুলোপন—মানুষেরা চিন্তা করে
প্রবীণেরা অনেকেই আজ ভট্টারকদের বিবর্তনের ব্যজনে পিপীলিকার কঙ্কাল
যারা দেখে না এই তন্ময় আকাশ
যাদের ধারণাও নেই ; সমগ্র যন্ত্রণা, নিরহ ব্যস্ততা—বাতাসের মাথায় ভাসে
মানুষের পরিকল্পনায় চিন্তার শ্রম ধরে, বিভীষিকা দেখে অনেক হৃদয়ের বোধি
জানে সভ্য প্রহরীদের মুখে আত্মনাশের যান্ত্রিক বার্তা
মানুষের পরিকল্পনায় চিন্তার শ্রম ধরে, বিভীষিকা দেখে অনেক হৃদয়ের বোধি
তারা নিগ্রহের দিকে চেয়ে গুনগুন করে প্রহেলিকার মতন
সকল নিবৃত্ত বিবরণ মুক্ত করে দিয়েছে ব্যগ্র মানুষের ধর্মে
জমাট-বাঁধা বিভ্রম নিয়ে 'জগতের পঞ্চভূত' কিরণ খুঁজে বের করে না তাই
এ বস্তুকণার কথা নয়—বায়ুমণ্ডলের পথ—যে পথে সবাই আশ্চর্য স্থির
এবং তাই অনাকাঙ্ক্ষিত উৎসে নিয়োজকের অনুমান, ছবি, রূপালী দুঃখ,
পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে মাছেদের অবসন্ন ভ্রূণ
যেন সব
আমিও কি এমন সব সম্মিলিত জগতে নিয়ন্ত্রিত হব—মজ্জমান ফেনা
ভঙ্গিল প্রবাহে যেমন তৃপ্ত হয়ে আলো পায় ?

পরেশ মণ্ডল

পূর্ণচ্ছেদ

এখনো কি ভালো লাগে নিজের মুখোশ দেখে নিজে নিজে হাসা
তামাসারও পূর্ণচ্ছেদ চাই
শৈশবের পাঁক ঘেঁটে
শহীদ হবার কোনো ইচ্ছে নেই
তবু মনে পড়ে
সেই জ্যোৎস্নার ছায়া কেটে বাদুড়ের ডানার বাতাস
নিয়ে আসে সন্ধ্যার অবুঝ
শঙ্খধ্বনি—তার শেষ টিপ

এ জীবন রহস্যময়
—ইলেকট্রিক বাল্ব—
ফিউজড্ হলেই তার
তরঙ্গের রোমাঞ্চের শেষ
ঝুলে থাকে
শূন্য শূন্যতায়

এই কথা মনে থাকে বলে
তাড়াতাড়ি সেরে নিই নাটকের শেষ রিহার্সাল
এই কথা মনে থাকে বলে
নিজের বিকৃত মূর্তি পাথরে খোদাই করে
উঁচুতে বসাই
কেননা বুঝেছি
তামাসারও পূর্ণচ্ছেদ চাই।

বিমান ভট্টাচার্য

বাঘিনী

রাত্রে হঠাৎ খোলশ পাল্টে
বাঘের পোষাক পরে
শরীর খোঁজে, তপ্ত শরীর
সেই বাঘিনী হঠাৎ খোঁজে
গায়ের গন্ধ, মানুষ কোথায় আশে পাশে
দিনের বেলায় অপার ক্ষমায় যে চোখ দোলে
রাত্রে সে চোখ বাঘের চোখের মত
শরীর খোঁজে, তপ্ত শরীর।

উদয় অস্তের ব্যবধানে পতিব্রতা
নেশায় মাতাল রাত্রে হঠাৎ
খোলস পাল্টে বাঘিনী যায়
কোন শিকারে ?

মুরারিশঙ্কর ভট্টাচার্য

দুটি কবিতা

দেখতে গেলেই দেখা
নদীর জলে প্রতিবিম্ব
চাঁদের ছবি একা।

নদী তোমার তুমুল স্রোতে
ভাসিয়ে দিলুম
আমার যত ফুল
জানি না তা পাবে কিনা খুঁজে রত্নাকর।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

চন্দন গাছের গন্ধে

চন্দন গাছের গন্ধে যেও না বাগানে, ওইখানে মানুষের দুঃখেরা জড়ো হয়ে থাকে
বছরের শেষে কেউ বসে পড়ে, অগণন প্লেন উড়ে যায় এ আকাশ থেকে অন্য
কোন আকাশ।
যেন কত কালে ফেরা হয় না কো আমাদের, মাঠে ময়দানে বেলা কাটে
বেলা কাটে শ্যামবাজার বালীগঞ্জ একটি নিশ্বাসে।
চন্দন গাছের বনে ঝড় উঠেছিল কাল, এ রকম পূর্ণিমা কতকাল পরে যেন
খাল পাড় থেকে উঠে আসে

আমরা কি কোনদিন ভালবেসে ভুল করি নাই, আমরা কি দ্বিধাহীন
কপর্দক শূন্য হাতে
ফেরিওলাদের সাথে একাকার হয়ে যেতে পারি?
এইখানে বছরের শেষতম প্রান্তে এসে ভেবে নেওয়া যায় আমাদের
প্রথম ও অন্তিম ভাবণ, কালরাতে অনিমেষ তাকিয়ে ছিলাম কতদূর?

•

কলকাতা থেকে আজো প্রেমিক প্রেমিকা হাঁটে, ভিখারী ও জুয়ারীর সাথে—
অগণন প্লেন উড়ে যায়,
লা-প্লাজা কি জিব্রাল্টার কি রকম ঝড় ওঠে সেখানে আকাশে?
কাল রাতে, চন্দন বনের গন্ধে খোকা ও খুকুরা লুকোচুরি খেলেছিল নিরাশ্রয়
উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়, কালরাতে
অদ্ভুত বেতারে কার কণ্ঠ ত্রিভুবন জয় করবে বলেছিল
'আমরা কি ভাল আছি খুকুমনি, আমরা গভীরতর সুখের কল্যাণে
অবিরল হেঁটে যাব অদ্ভুত বিশ্বাসে?
কালরাতে প্রজননশীল এই পৃথিবীর মাঠে, কলকাতা প্লেন হয়ে উড়ে যায়
ভূমধ্য সাগরে॥

বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়

ফেটে যায় বেহায়া শিমুল

গুমোট স্বপ্নের মধ্যে ফেটে যায় বেহায়া শিমূল,
আমাটে ঘুমের গির্জে, আঁচড়ে ছ্যায় জ্যোৎস্নার শর্করা,
তুলে ওড়ে লজ্জাহীন, আঁশভর্তি সংক্রামক বীজ
ছড়ায় বুকের মাঠে ; আগাছা ও কাঁটাঝোঁপ ভেঙে
শুঁড়িপথে দৌড়ে যায় চতুর শেয়াল, কোনাকুনি ;
টান দিলে ছেঁড়ে সুতো, মাঞ্জা ও লাটাই-ধরা হাত
আফশোষে কপাল ঠোকে ট্যাবা চোখে ভোকাটা ঘুড়ির
ল্যাজের সৌখিন নাচ দাড়ি নাড়ে বেআক্কেলে বুড়ো
মেঘের ফোকর থেকে, টেপা চোপে অশ্লীল কৌতুক।

ততক্ষণে ফুঁসে ওঠে ছুমন্তর হাওয়া, পর্দাদের
ডানা ছিঁড়ে ঝ্যাঁতাফেঁতি, বেসামাল ঘাঘ্‌রা ও চাপকান,
তেতো পুঁথি রা কাড়ে না ; কই হে, কোথায় দীপ্ত মাছ,
ঘাই দিতে ভুলে গেছে ? ভাঙো না, চাঁদের হাসি, বাঁধ,
শিমূল ফাটার শব্দ ডুবে যাক, ঘুমে ডুবি আমি।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সারারাত

দাঁড়ের শব্দ শোনো,
না হলে
ঢেউয়ের শব্দ
উপকূল থেকে উপকূলে—

সারারাত আজ সারারাত
ছলাৎছল সারারাত—
হাতের বালার মত
সোনালী বৃত্ত জুড়ে
আগুনে উজ্জ্বল মুখে
শব্দ তোলো
শব্দ শোনো
দাঁড়ের ঢেউয়ের—
না হলে নিঃশ্বাসের
ছলাৎছল আজ সারারাত—

যতীন্দ্রনাথ পাল

এখনও রূপ-টান

এখন দিন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে, তবু ছাখো
আমার আর মাঠের টান ফুরোলো না
ফুরোলো না, মাঠের ভেতর টান্‌টান্‌
বৃক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে তার
ছায়ার ভেতর ভিজতে সাধ—
এখনও অফুরান :

দেখি সূর্য আর তারার চাকার পিঠে
রেলগাড়ীর কামরা থেকে—
দিন আর সন্ধ্যা আসে পাহাড়পুর ইষ্টিশানে, দিন আর সন্ধ্যা
বসে—প্রান্তরের ওপর ঝর্নার জলে পা—;
পা ডুবিয়ে আর জল পায়ে-পায়ে কাঁপিয়ে
দুলিয়ে কাচের মত ভেঙে ভেঙে
হি হি হাসে :
আর তাদের পায়ের রক্ত ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ে দিক্‌দিগন্ত পর্যন্ত ;
আমার ভারি ভাল লাগে—যখন—
রাতের পথে—তাদের কমনীয় গোড়ালির স্মৃতি
চোখের ভেতর নিয়ে—আর-একটি
কালো শাড়ির নিচে—দেখি একটি
ঝুলন্ত ভীষণ শাদা পা—বর্তুল গুল্‌ফ কোন্‌
শূন্য থেকে বুকের দিকে
নামছে।

মধুমাধবী ভট্টাচার্য

ঈশ্বরের কাছে

[কবি অমিয় চক্রবর্তী শ্রদ্ধাস্পদেষু]

এ বছরের শেষ চিঠি পেলাম।

আর দু'একটা দিনও
ধার করা যাবেনা
ঈশ্বরের কাছে।

অথচ, এবছরেই আমার
আরও দুটো দিন দরকার
না হলে এই মরশুমে
কত ফুল ফুটল গোনা যাবে না।

অথচ দিন দুটি পেলে
মরশুমী ফুলের রঙ চোখে
নিয়ে দেখে যেতাম ;
হাজার বছরের মরচে-ধরা পৃথিবীকে
ঈশ্বর তোমার কাছেও শেষ চিঠি আমার

মতি মুখোপাধ্যায়

ঘুলঘুলি

কারো কারো জানালা থাকে, জানালা
ছোট বড়,
আমার কাছে থাকার মধ্যে ভয়েই
জড়সড়
কয়েকটা ঘুলঘুলি,
যেখানে চোখ—
চোখের থেকে ঝুলি।

কারো কারো সূর্য থাকে, সূর্য
নানা মাপের,
আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখি বিশ্রী
কালো রাতের।
সূর্য থেকে আলো ঝরে,
জানালা পথে ঢুকছে ঘরে,
মধ্যরাতের ছিদ্রপথে
তাই কি ঘুলঘুলি ?

সাজিয়ে রাখি মাথার ভিতর
গ্যাঁগার মাথার খুলি।

অশোককুমার মহান্তী

দুটি কবিতা

১. তুমি শোনো বা না শোনো
সে তোমায় ডাকছে নিশিদিন।
সে তোমায় ডাকছে পথে-ঘাটে
সে তোমায় ডাকছে বুকের মাঠে
সে তোমার বুকেই সারাক্ষণ
গড়েছে নিধুবন।

যাচ্ছি রাজার দেশে

২. রাজা তুই বাজনা বাজা
যাচ্ছি আমি দেশে
রাজারে তুই বুক খুলে রাখ্
যাচ্ছি তোর দেশে।

বিজয় মাখাল

নিখুঁত ভালবাসা

তুমি ক্রমশঃ বেনোজলে আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে আসো—নিজেকে
মডেল ভেবে আটোসাটো পোষাকে রঙ চড়িয়ে নিজেকে অপরাধী ক'রে তোল
অবশ্য এমন মানসিকতা অনেকেরই থাকে, অনেকেরই দেহের মধ্যে
পাঁজরের খাঁজে খাঁজে জমে থাকে ঘৃণা, নির্ভাজ অহংকার—
তুমি সেই বিবল সারির অন্যতমা হয়েও হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে নাও তাস,
চতুর টেবিল থেকে নীচুতলার মেয়েলোকের মতো খেলে যাও
প্রেম প্রেম খেলা
অথচ হৃদয়ের মার্জিনে যে যুবককে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সারা সন্ধ্যে,
তুমি লক্ষ্য রেখো, সে হয়তো অরণ্যে হারিয়েছে পথ। অই
খেলুর টেবিল থেকে তুমি সময় করে একবার অন্তত ফেরাও চোখ,
তার দিকে বাড়িয়ে দাও হাত, তোমার সেই প্রত্যাশিত হাত
যে হাতে আঁকা আছে প্রেম প্রীতি ঘিরে নিখুঁত ভালবাসা।

শিখা সামন্ত

দ' থেকে

দ' থেকে ছড়িয়ে পড়ে দানের সামগ্রী
দেবতার আশীর্বাদের মত দয়া, দাক্ষিণ্য
প্রসারিত দক্ষিণে দীর্ঘায়ু
তবু, ছাখো দীনতা হাত পেতে অদূরে ব'সে।
বড়ই লোলুপ, চেটে খায় সুখ-কণা
লুব্ধ চোখে ছাখে মানুষের ভরন্ত শরীর
দ' থেকে দক্ষিণ-মশানে দণ্ডধারী ঘাতকের সারি—
মানবতা শেকল বন্দী হাঁটে

দ' অক্ষরে নানান দুঃখের ছবি
দাবার ঘুঁটির মতো মানুষের মন ওড়ে.
দলে দলে মুণ্ডহীন লোক সাম্রাজ্য ঘোষণা করে
দ্রাবিড় সভ্যতার কি পুনরভ্যুদয় !
দামী দামী আসবাবে সাজানো শো-কেশ
রাস্তার ছায়ায় ভেসে ওঠে, ডুবে যায়
দ' থেকেই ত্যাখো, দুঃখের সাড়ে-দশ হাত শরীর
গালে হাত দিয়ে, মৌনী
দাসখতে নীলাম হচ্ছে মানুষের ভেতর-বাড়ি
দমকল ছুটে যায় ঘণ্টা বাজিয়ে
দ' শব্দে জলের গভীর থেকে একটা দাগ গড়িয়ে গড়িয়ে স্থির
দ' থেকেই দিন দিন জীবনের দেনা বাড়ে, এবং
দানা বাঁধে মৃত্যুর রং বেদনার মতো লাল বেদনার ভাঁড়ে…

সুব্রত রায়

ইতুকে

অনেকদিন তোমার চিঠিপত্র আসছে না
অথচ তোমার শহরটা দেখতে পাচ্ছি
গাছপালায় ঢাকা পাহাড়
দূর দেশের বিদেশী হাওয়া আসছে
কাঠের গীর্জা থেকে সান্ধ্য ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে
আমার ঘুম আসছে, ঘুমাবো না,
নিদ্রা মানে পরাজয়
নীল টেবিল বাতির ম্লান আলোয়
আমার ছেলেটা ঘুমোয়।
জনকের বসন্ত-উদ্যানে
ওর প্রবেশ নিষেধ।

হিমাংশু শেখর বাগচী

প্রার্থনা

সদর বুকের খোলা বারান্দায়
এসে বসলেন সূর্যদেব
তাঁর সারা শরীর জুড়ে ক্ষতের চিহ্ন
যেন শুকিয়ে যাওয়া ধানের চারা, মরা কইমাছ

এ ভাবেই ক্রমাগত দিনরাত, রাতদিন
বদলে যায় রমণীর অভিসার,
সংসারে সময়ের পরিমিতি।
বারান্দার সারি সারি টবের সূর্যমুখী ফুল
নতজানু হয় সূর্যের স্তব বন্দনায় :
'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং

তুষারমৌলী চট্টোপাধ্যায়

যে আঁধার আলো করেছে সমুদ্রের জল
সে জল আমার হৃদয়ে কেনই বা বহে যেতে চায়
যে বাতাসে হাত নেড়ে ডাকি, কোথায়—কোথায় মৃগনাভি?
সে মৃগ অনেক দূরে অকস্মাৎ লুকোচুরি খেলে।

যে বনে মুগ্ধ হৃদয় বনচাঁপা ফুল ঘিরে একা একা খেলে
সে ফুল অতীত কেন জীবনের সব দুঃখ সুখে।

এ পৃথিবীতে ঘুম আসে, কখনো বা অনিদ্রার ঘুম।
বৈশাখের রোদে-জলা মিশর প্রান্তরে
সন্ধ্যা নামে, আকাশের নিমন্ত্রণ সেন

ভোরের মুহূর্ত এলে যে আলোয় সূর্যস্নান করি,
সে মুহূর্তে এ জীবন সূর্য হতে চায়।

সন্দীপ ভট্টাচার্য

একটি সততার মৃত্যু

আজ এই মুহ্যমান দুপুরে
বাবলার কাঁটায়
মৃত্যু হ'ছে সততার।
এই থিকথিকে অন্ধকারে
যে নিষ্পাপ চাউনিটা জ্বলছিল অক্লান্তে
অভাবী বাতাসে শিখাটি নিভে যেতে
সে-ও মিশে গেল ঘন অন্ধকারে।

সহজ বায়ুতে শ্বাস নিতে নিতে
হঠাৎ কার্বনের দুষিত ধোঁয়া
যেন মিশে গেল সর্বশরীরে।

আজ এই দুপুরে
সততার মৃত্যু হয়েছে।
শোকপালনের কেউ নেই কোথাও—
শুধু এক পতনের মৃদু অভিঘাতে
মনটা ওঠে কেঁপে
চূর্ণবিচূর্ণ হতে হতে ধূমের মতো
আকাশে উড়ে যায় সততার শ্রান্ত দেহ।
আজ এই নিথর দুপুরে
অভাবের চিন্তায়, শেষ সংবাদে প্রকাশ—
একটি সততার মৃত্যু হয়েছে॥

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

বিস্মরণের ধূসর দ্বীপে যে সব সাহিত্যিক নির্বাসিত, সেই সব ছিন্নমূল সাহিত্যিকদের পুনর্বাসনের চেষ্টা আমার কাছে একটা অসম্ভব কাজ বলেই মনে হয়। মানুষের সমাজে কার্যকারণের ফলে কিছু কিছু অমোঘ নিয়মের সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব থেকে বিযুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সাহিত্যিকরা এর ব্যতিক্রম হবেন এমন আশা যুক্তি-নির্ভর নয়। বর্তমানের উদ্ধত আলোর রূঢ়তায় যে লেখকের প্রতিবিম্বিত অবয়ব নিতান্তই একটি অস্পষ্ট দূরদর্শন মাত্র, বিস্মরণে নির্বাসিত সেই লেখকের ভাগ্য আমাদের দুঃখের কারণ হলেও কার্য-কারণের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করবো কিরূপে! আমি এখানে সেই লেখকের কথাই বলছি যাঁর সম্পর্কে একদা আমাদের আগ্রহ প্রত্যাশাকামী ছিল। যদিও আমাদের আগ্রহ এবং প্রত্যাশাকামিতার মূল্য এক্ষেত্রে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কাল-মানসে স্থায়ী আসনের দুর্লভ অধিকার অর্জন অন্য এক জিনিষ। অনেকে আসেন এবং চলে যান, আমরা ফিরেও তাকাই না। অনেকে আসেন, আমাদের চমকিত করেন, চলে যান, আমরা ভুলে যাই এবং কদাচিৎ স্মরণে এলে সচেতন লজ্জায় ঘোষণা করি, এঁরা কিন্তু এঁদের প্রাপ্য পান নি। কেউ কেউ দীপ্ত মহিমায় ভাস্বর হয়েই আসেন এবং আমাদের হৃদয়ে একটি স্থায়ী আসনের বন্দোবস্ত করে ফেলেন। এঁরা আমাদের হৃদয়কে আপ্লুত করেন, বুদ্ধিকে ঋদ্ধ করেন। সময় পরম্পরায় উত্তরসূরিগণ পূর্বসূরিদের কাছ থেকে এঁদের রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মানুষের চেতনার আকাশে স্থির নক্ষত্রের মত এঁরা চিরদিন দীপ্যমান থাকেন। এদের কথা স্বতন্ত্র। প্রথমোক্তদের নিয়েও আমরা মাথা ঘামাই নে। আমাদের ভাবনা মধ্যবর্তীদের নিয়ে। অর্থাৎ যাঁদের সম্পর্কে যথাযথ দায়িত্ব পালন করি নি এমন একটা বিমূঢ় অথচ অকপট ধারণা পোষণ করে আমরা পীড়িত হই।

আমার আলোচনার বিষয় এই চরিত্রেরই একজন প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায়-বিস্মৃত লেখক, যাঁর নাম তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়। আমি জানি, উত্তরসূরির অনেক পাঠকই স্মৃতির অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবেন তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অস্তিত্ব অন্বেষণে। হাল আমলের তরুণ সাহিত্য পাঠকদের কাছে তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় অপরিচিত নাম। তারাপদ বাবুর গল্পগুলির গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কোন সংকলন নেই, নেই কোন প্রকাশিত উপন্যাস। লেখক ও পাঠকের মধ্যে আগামীদিনের জন্য যে একটি যোগসূত্রের প্রয়োজন তা এই লেখকের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। গল্প ছাপা হয়েছে অনেক সাহিত্যপত্রে, উপন্যাস ছাপা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। দু একটি উপন্যাস তারাপদ বাবু লিখেছেন বলে আমি শুনেছি। সম্ভবত ওগুলি ধূসর পাণ্ডুলিপি হয়ে তোরঙ্গর কালাধারে সহৃদয় উত্তরপুরুষদের জন্য সংরক্ষিত হচ্ছে। এ থেকে একটি দুঃখজনক সত্য পরিস্ফুট যে তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প কোন প্রকাশকের কঠিন এবং হিসেবী হৃদয়কে দ্রব করতে পারে নি। এজন্য প্রকাশকদের একটুও দোষ দেওয়া যায় না, কেননা আলু-পটল ইত্যাদি ব্যবসার যে নীতি প্রায় সমস্ত সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও ঠিক সেই নীতিরই অনুসারী। পণ্যবাজারে পণ্যমূল্যের নিয়ামক নীতির কষ্টিপাথরেই ঘষে দেখা হয় কোন বিশেষ সাহিত্যিকের বাজারদর। এ পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ তাঁরাই প্রকাশকদের কাছে গ্রহণীয়, যাঁরা নন তাঁরা তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বর্জিত। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত শৌখীন নেশার প্রশ্রয় দেবেন কোন প্রকাশক সংস্থা এরকম আশা বাতুলতার নামান্তর। একটি সরল ব্যবসায়ী নীতির এক প্রান্তের দৃষ্টান্ত তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়। বিপরীত প্রান্তের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রকাশকের দৌলতে এবং সাহিত্য জগতের দু একটি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সাপ্তাহিক পত্রিকার অবিভাবকত্বে আখছাড় কত সাহিত্যিকই তো আজকাল অর্থে যশে পয়মন্ত!

বাংলা অভিধানে 'আত্মমর্যাদা' বলে একটি শব্দ আছে। 'Pragmatism' বলে আর একটি শব্দ আছে অভিধানে। বর্তমান সাহিত্য জগতে আপনার শুভাশুভ এবং ভবিষ্যৎ প্রায় অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল আপনি উপরের শব্দ দুটির কোনটি বেছে নেবেন তার উপরে। আমি অ-সাধরেণদের কথা বলছি না। তাদের পথ যত কণ্টকাকীর্ণই হোক না কেন সে পথে একদিন ফুল ফুটবেই, আলো জ্বলবেই। তাদের জীবনচর্যায় pragmatism অপ্রয়োজনীয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্ন অবান্তর। আত্মমর্যাদা তাঁদের ব্যক্তিত্বে একটি মৌল উপাদান এবং চরিত্রে স্বতস্ফূর্ত। এর জন্য তাঁদের আলাদাভাবে সচেতন থাকার কোন প্রয়োজনই

হয় না। যেহেতু আমার আলোচনা সাধারণ ও অ-সাধারণের মধ্যপথের অন্যতম একজন প্রতিনিধিস্থানীয় যোগ্য সাহিত্যিককে নিয়ে, আমি মনে করি সাহিত্য জগতের এই অবস্থানে স্থির অনেক সাহিত্যিককেই মানসিক দ্বন্দ্ব ও পীড়নের মধ্যে বেছে নিতে হয় একটি পথকে, হয় pragmatism, নয় আত্মমর্যাদা। Pragmatism-এর পথে যাঁরা গেছেন তাঁদের অনেকেই সাদা বাংলা কথায় বলা যায়, বেশ করে খাচ্ছেন। আর মুষ্টিমেয় যে দু একজন আত্মমর্যাদার নির্জনতাকে বেছে নিয়েছেন তাঁরা অনিবার্য বিস্মরণের ধূসরতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়কেও তাই তাঁর জীবনের বিষণ্ণ অপরাহ্নে আমাদের খুঁজে নিতে হচ্ছে স্মৃতির বিবর্ণতায়। আজকাল পণ্যবাজারে বিজ্ঞাপিত লেখক না হলে লেখকের খোদ অস্তিত্বই সংকটাপন্ন, লেখার গুণাগুণ বিচার দূরের কথা। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় বিজ্ঞাপিত লেখক ত ননই, বরং বলা চলে, বর্তমান সাহিত্য জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক একরকম বিচ্ছিন্নতার প্রান্তদেশে অতি ক্ষীণ একটি সূত্রে নিরালম্ব। এ কালের পাঠক তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত। লেখকের কোন গল্প-সংকলন প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁদের কাছে লেখকদের পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব নয়। অপরিচয়ের ব্যবধান হ্রাসের জন্য এমন কথাও বলা সম্ভব নয় যে আপনারা ফিরে যান চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে এবং তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়কে খুঁজে নিন বিভিন্ন সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার পাতায়। শুধু তারাপদ বাবু নন, উপেক্ষিত অনেক লেখক সম্পর্কেই বর্তমান আলোচনা প্রাসঙ্গিক এবং একটি সিদ্ধান্তের সংকেতবহ। বর্তমান সময় আন্দোলন ও সমষ্টির যুগ। পরিবর্তিত যুগের প্রেক্ষাপটে সমষ্টিহীন ব্যক্তির ছবি অত্যন্ত অস্পষ্ট। একথা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা একথাও ভাবতে পারেন যে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক (Pragmatism-পন্থী নয়) ও শিল্প সাহিত্য অনুরাগীদের যুক্ত সমন্বয়ে একটি সমবায় সংস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। এই সংস্থার কাজ হবে একটি মাসিক বা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে উপেক্ষিত যোগ্য লেখকদের নির্বাচিত পুরনো লেখা ছাপিয়ে হাল আমলের পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একই সাথে পরিবর্তিত সময়ের অভিঘাতে তাঁদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলিত চেতনাকেও সংস্থার কাগজে ধরে রাখা উচিত নতুন লেখার অবয়বে। সংস্থার কাগজে একালের যোগ্য লেখকদের

লেখাও স্থান পাবে। এতে একদিকে যেমন বিগত কালের উপেক্ষিত লেখকের পুনর্বাসনের সুযোগ হবে, অন্যদিকে আগামী দিনে নির্বাসিত একালের লেখকেরও স্বার্থ সংরক্ষণ হবে। সংস্থার আর্থিক পারঙ্গমতার সাবালকত্ব প্রাপ্তির লগ্নে দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে যোগ্য লেখকের গ্রন্থ প্রকাশনের। এ ব্যাপারে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন উপেক্ষিত প্রবীণ লেখক যোগ্যতার ক্রম বিচারে। এ ছাড়াও বিগত দিনের উপেক্ষিত লেখকদের একালের পাঠকের দরবারে আরও একটি উপায়ে হাজির করা সম্ভব। কলকাতায় আজকাল লিটল ম্যাগাজিনের অভাব নেই। এই সব কাগজে নবীনদের পাশাপাশি প্রবীনদের লেখাও (পুরনো ও নতুন) ছাপা হতে পারে।

চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে বেশ কিছু গল্প লিখে তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় সে কালের পাঠক সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সাহিত্যের ধারাবাহিকতার সন্ধিকালগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রতিটি কাল বিভাগে ঐ সময়ের কিছু সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই শক্তিমানদের আবির্ভাব হয়। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের অগ্রজ প্রতিভাবান বহু সাহিত্যিক নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'কল্লোল,' 'কালিকলম' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এই রীতিতেই ধারাবাহিকতার একটি ধাপে 'পূর্বাশা' সাহিত্যপত্র কয়েকজন সার্থক গল্প লেখককে পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত করেছিল। আমার ধারণা, 'পূর্বাশা'র প্রাঙ্গনেই তারাপদবাবুর গল্পগুলির প্রথম পুষ্পিত উন্মেষ। এই জন্যই তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়কে গল্প সাহিত্যের প্রবহমান ধারাবাহিকতায় 'পূর্বাশা'র সাথে চিহ্নিত করা যায়। এই সময়ে বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি উদীয়মান নক্ষত্রের আশ্চর্য দ্যুতি নিয়ে এসেছিল আর একজন কথাসাহিত্যিক, যার নাম অমিয়ভূষণ মজুমদার। সাহিত্য একজন সাহিত্যিকের স্বদেশ ভূমি। সাহিত্যের অস্থিমজ্জায় সাহিত্যিকের অস্তিত্ব প্রোথিত: সে স্থান থেকে একজন সাহিত্যিকের নির্বাসন সেই বিশেষ সাহিত্যিকের কোন দুর্বল রন্ধ্রপথেই সম্ভব। অমিয়ভূষণ প্রসঙ্গে একথা আমার বিশেষভাবে মনে হয়েছে। হাল্‌কা এবং স্থূল রস পিপাসুদের কাছে অবাঞ্ছিত হলেও প্রকৃত সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে অমিয়ভূষণ একদা যথেষ্ট সমাদৃত ছিলেন। আমার ধারণা, উত্তরণের একটি উচ্চ ধাপে পৌঁছে অমিয়ভূষণ নিজেকে সংকুচিত

বোধ করেছেন এবং গভীরতর কোন প্রত্যয়ের অভাবে এভারেস্ট বিজয়ী হতে পারলেন না। শুধুমাত্র অতীত গৌরবের ভারবাহী না হয়ে খাঁটি খেলোয়াড়ের মত গৌরবের শেষ দীপ্তি ম্লান হবার পূর্বেই অমিয়ভূষণ কথা-সাহিত্যের জগৎ থেকে একরকম অবসরই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। যে অর্থে তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় বিস্মৃত বা নির্বাসিত সে অর্থে অমিয়ভূষণ বিস্মৃত বা নির্বাসিত নন। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণের উল্লেখ এই কারণে যে সাহিত্য জগতে অমিয়ভূষণ তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমকালীন এবং ঐ কালের উদীয়মান কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতিবান লেখক। তারাপদ বাবু তাঁর সাহিত্যকৃতির শেষ ধাপে পৌছবার আগেই ছিন্নমূল এবং বিস্মৃত। স্বকালে যে স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য ছিল তা পূর্ণতা পায় নি। পরবর্তী কালে এই লেখক কেন বিস্মৃত হলেন তার ইঙ্গিত আমি দিয়েছি।

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলিকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বটি চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশক ব্যাপী। পঞ্চাশের শেষ থেকে দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভকাল। গত মহাযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, ৪৭-এর দেশ বিভাগ এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ এই যুগান্তকারী ঘটনাগুলির অন্তর্বর্তী কালে আমরা দেখেছি কি ভাবে পুরনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রাচীন দুর্গটি ধীরে ধীরে পরিত্যাক্ত একটি জীর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। একদা এই প্রাচীন দুর্গের অধিবাসী আমরা অনেকেই তিরিশ এবং ষাট দশকের ব্যস্ত কালে একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে দেখেছি এবং দুটি আলাদা পৃথিবীর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও রক্তাক্ত হয়েছি। আমাদের কথাসাহিত্যেও এই অসংহত ও অস্থির কালের অনিবার্য প্রভাবে পালাবদলের সূত্রপাত হয়েছিল। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতেও দুই পৃথিবীর দ্বৈত চেতনার প্রভাবের লক্ষণে অন্বিত, যদিও তীব্রতা ও আবেগে অনেক সংযত। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্র ও মেজাজে কখনও তীব্রতা, তির্যক ভংগি এবং আবেগবাহুল্য প্রশ্রয় পায় নি। বাহুল্য-বর্জিত সংযত চালেই তাঁর গল্প প্রার্থিত লক্ষ্যের গতিপথে নিয়ন্ত্রিত। সংযমী শব্দ-নির্বাচন এবং বাক্যবিন্যাসের রীতি এই লেখকের গল্পের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই গুণটির বিচারে তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমকক্ষ কথাসাহিত্যিক খুব বেশী নেই; লেখকের এই সময়ের

গল্পগুলির মধ্যে 'পণ্য', 'সময়' 'শিবনাথ ও অন্যান্য' 'যযাতির কান্না' 'শকুন', প্রভৃতি গল্প স্মরণযোগ্য। প্রথম গল্পটি 'ক্রান্তি' নামক সাহিত্যপত্র এবং বাকিগুলি 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত। বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যময় ও সমৃদ্ধশালী ছোট গল্পের শাখায় উপরের গল্পগুলি নিঃসন্দেহে স্থান লাভের যোগ্য। লেখকের দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলির সূচনাকাল পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে। ১৯৫৭ সালে 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত 'সাতটি মানুষ' এবং 'বীক্ষণ' তারাপদ বাবুর দ্বিতীয় পর্বের গল্পধারার উৎস বলে আমার মনে হয়েছে। এই পর্বে গল্পের আঙ্গিক ও রচনারীতিতে প্রথম পর্বের গল্পগুলির তুলনায় যথেষ্ট পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় পর্বে তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পবিন্যাস-রীতি সংলাপ-প্রধান। ঘটনার বর্ণনা, আত্মমুখী অভিক্ষেপ, দৃষ্টিভঙ্গীর তীক্ষ্ণ তির্যক প্রতিভাস তাঁর গল্পে অনুপস্থিত। গল্পের চরিত্রগুলির সংলাপের প্রতিক্রিয়াজনিত দ্বান্দ্বিক গতিপথেই গল্প তার অন্বিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করছে। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পবিন্যাসের এই রীতি কতটা সার্থক বা বৈচিত্র্যহীনতার জন্য ক্লান্তিকর তা অবশ্য বিশদ আলোচনায় বিতর্কের অবকাশ রাখে। যদিও 'সব ভাল যার শেষ ভাল' বলে একটা কথা আছে, সুতরাং অভীষ্ট উৎকর্ষে পৌঁছনো সম্ভব হলে পথের ক্লিন্নতা আমাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিপাতে সহনীয় হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলির সংলাপের রীতি এবং ভংগি অনেক ক্ষেত্রেই আমার কাছে অত্যন্ত জটিল ও কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে; যার ফলে, কিছু গল্প অস্বচ্ছতার জন্য লেখকের অন্বিষ্ট বোধে হয়ত পাঠককে সম্পৃক্ত করতে পারে নি। লেখকের এই ত্রুটি পরিহার্য ছিল বলেই আমার ধারণা। অধুনা-লুপ্ত 'পূর্বপত্র' সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত গল্প 'দৃশ্য, বয়স ও যুদ্ধ' আমার উপরোক্ত ধারণার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য।

মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালকে আমরা বিশেষভাবে ১৯৪২ ও ১৯৪৭-এর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সময়ফলকে বিদ্ধ ও চিহ্নিত করি। পঞ্চাশের দশক অবধি একটি দুর্নিবার কালস্রোত আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি জীবনকে নিদারুণভাবে বিদীর্ণ ও বিধ্বস্ত করেছে। অপ্রতিরোধ্য জটিল আবর্তে আমরা বিপর্যস্ত হয়েছি। মহাভারতের মত আর একটি মহাকাব্য রচনার উপাদান-সমৃদ্ধ এই কাল আমাদের কথাসাহিত্যিকদের কাছে একরকম অনাবৃতই রয়ে গেছে। বলিষ্ঠ সমাজ

চেতনার এবং বুদ্ধিদীপ্ত সহৃদয় মানবিক বোধের অভাবে খুব অল্পসংখ্যক কথা-সাহিত্যিকই এমন একটি যুগান্তকারী আশ্চর্য সময়কে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিভাসিত করতে পেরেছেন। দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলির জন্য তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়কেও আমি এই অভিযোগে অভিযুক্ত করব। প্রথম পর্বের গল্পগুলি পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে ষাট-সত্তরের দশকে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলি পরিণত অভিজ্ঞতার উজ্জ্বলতর স্বাক্ষর রাখবে। এই সময়ে সমাজচেতনার মূল ধারায় ব্যক্তি-চেতনার সাযুজ্যের অভাবে আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী, কবি ও সাহিত্যিক সাংঘাতিক বিচ্ছিন্নতা-বোধে আক্রান্ত হয়ে, হয় জীবনের চোরাবালিতে মুখ গুঁজে পড়েছিলেন অথবা অবক্ষয়ের ক্লেদাক্ত স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচ্ছিন্নতা অবক্ষয়ের পথে যায় নি, গিয়েছে কিছুটা কৃত্রিমতার পথে। কিন্তু এই পর্বেও সম্বিৎ লাভ করে লেখকের আত্মস্থ হবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ১৯৬২-তে প্রকাশিত 'আয়নার মালিক—দৃশ্য কাব্য' (মানস), ১৯৭১-এ 'জর্ডন' (বিচিত্রা) এবং 'একটি গোলাকার টেবিল' (সাহিত্যচিন্তা) প্রভৃতি গল্পে।

ইদানীং তারাপদ বাবু মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখছেন। প্রবন্ধ কেন, কেন গল্প নয়? প্রশ্নটি আমি তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রাখছি। একজন কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকের মানসিকতার আসমান জমিন ফারাক। এতৎ সত্ত্বেও একজন গল্পলেখক প্রবন্ধ লিখতে পারবেন না বা লিখবেন না ঠিক এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই যে একজন সক্ষম গল্পলেখক তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট ফসল ফলাবেন এটাই তো কাম্য। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছেও তাই আমাদের একই প্রত্যাশা। হাল আমলের ছোট গল্প আমাদের তৃপ্তির পূর্ণতায় নিয়ে যেতে তো পারছেই না, বরং বলা যায় পীড়নের পথেই আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একথা আমি বলছি না যে ভাল ছোট গল্প একেবারেই লেখা হচ্ছে না। হচ্ছে, কিন্তু খুব কম এবং কদাচিৎ। মাঝে মাঝে দু'একজন নবীন লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজনীতি ঘেঁষা সাহিত্যপত্রে কিছু লেখক সমাজবোধের গভীর প্রশ্নে আমাদের ভাবায়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত! এক নিঃশ্বাসে হাল আমলের ক'জন বা বিশেষ গল্প লেখকের নাম করা যায় যিনি আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করছেন। বাংলা

ছোট গল্পের বিগত কোন সময় সম্পর্কেই এরকম মন্তব্য করা সম্ভব নয়। রাজনীতিতে বাম হঠকারিতা বলে একটা কথা আছে। সদর্থে এই কথাটি বর্তমান জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা ছোট গল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। পঞ্চাশের দশকে বাংলা ছোট গল্পে যে ঋতুবদলের সূচনা হয়েছিল তার প্রধান হোতা ছিলেন বিমল কর। বহির্মুখী কাহিনী ও ঘটনার প্রভাব নয়, অন্তর্লোকের গহন রহস্যেই রূপ নেবে এ কালের ছোট গল্প এই ছিল বিমল কর প্রমুখদের দাবি। আলোচনায় সুবিধার্থে একে ঐতিহ্য বা প্রথা-বিরোধিতার পথ বলা যেতে পারে। অবশ্য এই ঐতিহ্য বা প্রথা-বিরোধিতার প্রাক্‌কালে লেখা অঙ্কুরলতা, পিঙ্গলার প্রেম, যযাতি, আত্মজা, মানবপুত্র প্রভৃতি আরও অনেক আশ্চর্য সুন্দর ছোট গল্পের জন্যই বাংলা সাহিত্যে বিমল করের গল্পে নতুন স্বাদ পাওয়া গেলেও তা স্বাদুতর কিনা সে বিচার ভাবীকালের জন্য রইল। প্রথা-বিরোধী রীতির উত্তরসাধকগণ পালাবদলের ক্রম-অগ্রসর পথে ছোট গল্পের পরিধিকে নির্দয় সঙ্কোচনে এখন একেবারে ব্যক্তি বিশেষের মানসিকতার আবহে সীমাবদ্ধ করেছেন। এক কথায় ছোট গল্প এখন একটি বিশেষ ব্যক্তির আত্মকথনের মাধ্যম। নির্বিশেষ মানুষী চেতনার রূপ সম্পর্কে এঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন এবং দায়দায়িত্বহীন। ফলে, বিচ্ছিন্নতাকামী ব্যক্তির অসংলগ্ন নিরালম্ব আত্মপ্রকাশে মানুষের সার্বিক চেতনার রূপ বর্তমান কালের ছোট গল্পে অনুপস্থিত। বলাই বাহুল্য যে নতুন রীতির হাল আমলের প্রবক্তাদের কথাই আমি এখানে বলছি। আমার তো মনে হয়, নতুন রীতির উদ্ভাবক স্বয়ং বিমল করও এঁদের কাছে এখন অপাংক্তেয়। কী বলবেন এঁরা এখন বিমল করকে? ছদ্মবেশী ঐতিহ্যবাদী, না আপোষপন্থী শোধনবাদী! লাসকাটা ঘরে ছোট গল্পের শব ব্যবচ্ছেদে যাঁরা মত্ত তাঁরা সেখানেই থাকুন। কিন্তু বাংলা ছোট গল্পকে একটা সুস্থির ধারায় নিয়ে আসার জন্য একটা উদ্যোগী সচেতনতার প্রয়োজন এখন আছে। এ বিষয়ে অগ্রজ কথাসাহিত্যিকদেরও একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সুস্থ জীবনাশ্রয়ী গল্প লিখেই তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছেও আমার এই দাবি।

সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

নতুন কবিতা

[বিগত এক বছরে বাংলা কবিতার জগতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'উত্তরসূরি' পত্রিকায় এই নতুন বিভাগের সংযোজন। সারা বাংলাদেশের তরুণ এই পত্রিকাটির দিকে চেয়ে থাকেন—অজস্র অসংখ্য চিঠি আসছে দপ্তরে, প্রবীন অমিয় চক্রবর্তী থেকে তরুণতম কবি এই বিভাগটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সম্পাদক : উত্তরসূরি]

সনৎ দে

রাত্রি—১১

তোমাকে ডাকবে না ওরা কোনোদিন রৌদ্রের প্রতিধ্বনির গভীরে
ভুলেও তোমার দিকে এগিয়ে দেবে না
অন্তহীন সিঁড়ি
তুমি যতই অভিমানে ভেঙ্গে পড় না কেন
পায়ের তলা থেকে সমুদ্র স'রে যাবে আরো দূরে

[আজকাল, নৈহাটী, ২৪ পরগণা, শরৎ ১৩৮৪।]

রাণা সেনগুপ্ত

মোতী ঝর্ণা—৭৬

আজ মধ্যরাত্রে
কয়েকটি উলঙ্গ যুবক উবু হয়ে ক্রমশঃই
মাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে ;
তারপর ধনুকের মত ঘাড় পেতে
প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে
ধর্ম ও অধর্ম বোধে ছুটে যায় দ্রুত।

[কস্তুরী, গ্রীণ পার্ক, ওল্ড ক্যালকাটা রোড তালপুকুর ২৪ পরগণা, নভেম্বর ১৯৭৭]

রথীন্দ্র সান্যাল

দ্বিধা

একহাত জড়িয়েছে দু' হাজার বয়সী বটগাছি মূল
প্রাচীন ব্রততী উদ্ভিদ, সম্ভ্রান্ত ঝুরিপ্রসার, নির্দিষ্ট ছায়াচত্বর
রথচক্র ধরেছি সেই হাতে
মুছেছে বিহ্বল আর্তনাদ
পার্শ্বসহচর ছিল উইঢিবি, কঙ্কাল বাসস্থান, নষ্ট চাঁদের মতন সরীসৃপ আচরণ
অন্তমন্ত্রে বাঁধা আছে ত্রিভুবনী প্লাবন, দুর্বাসার কমণ্ডলু

[নিবাদ, শরৎ ১৩৮৪, স্টেশন রোড, বহরমপুর]

সমরেশ দাসগুপ্ত

অঙ্গারভূমির একজন মাছির গল্প

১.

লোকটা কয়লা সম্পর্কে
থিসিস লিখছিল ;
বললাম, চোখ দুটো একটু
নীচের দিকে নাবান।
লোকটা বলল, এ্যঁা ?
বললাম, চশমার কাঁচ থেকে ধুলো ঝেড়ে নিন।
লোকটা বলল, আমি কিছুই দেখতে পাই না
চোখে আমার কয়লায় গুড়ো, ওটাও এক ধরনের experiment !
বলেই ভন্‌ভন্‌ ভন্‌ভন্‌ উড়তে থাকলো মানুষটা।

২.

লোকটা একা মধ্যদিনে
খাদে নাবছিল
বললাম, চোখ দুটো কোথায় রেখে এসেছেন ?
বলল, আমার থিসিসের খাতার ভেতর।
বললাম, সাবধানে নাবুন
ব্লাষ্টিং সুরু হয়ে গেছে।
হাসতে হাসতে লোকটা
'You should know
That I am a coal expert'
বলেই উড়তে থাকল মাছির মতন।

[বিদিশা, ১৯৭৭, ৮৮/ডি বরাকর রেল কলোনী, বরাকর, বর্দ্ধমান]

নয়নতারা দে

হাত বাড়ালেই ছেলেবেলা

হাত বাড়ালেই ছেলেবেলা, তোকে তো আর খুঁজেই পাই না
মুঠোর ভেতর বৃষ্টি রেখে চোখের ভেতর আয়না
আয়না আমার পদ্মদীঘির সাত সকালের জল
জলের উপর শালুক বৌএর ঘোমটাটি মখমল
শালুক বৌএর বড় সতীন পদ্ম হলো রাণী
দুঃখে আমার বুক ফেটেছে, করি নি কানাকানি
কতশত হাবিজাবি এমনি হাজার বায়না
হাত বাড়ালেই ছেলেবেলা, তোকে তো আর খুঁজেই পাই না।

[সোপান, কৃষ্ণগঞ্জ, বিষ্ণুপুর]

চারণকবি বৈদ্যনাথ

মথুর এবং

অন্ধকারে স্থিতি আছে শৈশবে কৈশোরে লুকোচুরি
কাঠপুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, আহা সেই বউ-বউ খেলা
মেলায় নাগরদোলা বন্‌বন্‌ পৃথিবী ভ্রমণ
এবং পাঁপড়-ভাজা, চুল-বাঁধার ফিতে ক্লিপ,
পরম আদরে কিনে-আনা
ইস্কুল-পালানো সেই আম-চুরি জাম-চুরি ইত্যাদি অনেক
অনু অনু ক্ষণগুলি আহা সেই স্মৃতিগুলি
অন্ধকারে খুঁজে মরে এ বয়সে সকলে হয়তো বা

হতাশা বিরহে ক্লিষ্ট মৈত্রদের ছোটবাবু
অন্ধকারে খুঁজে পেল কৈশোরের মুখ

দিনান্তের শেষ রশ্মি ডুবে গেলে সমুদ্রের বুকের ভিতর
মথুর প্রত্যহ সাজে অন্ধকারে পুতুলের বর

[দহন, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া ১৩৮৪]

রণজিৎ দত্ত

সুকান্তর জন্য

কবিতা লেখার আগে
হাতের মুঠোকে শক্ত করে নিতে হয়,
কবিতা লেখার পরে
হাতের মুঠোয় মিলিয়ে নিতে হয়
আঙুলের ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকছে কিনা

[মাটির ছোঁয়া, সূর্যনগর, আলিপুর দুয়ার কোর্ট, ১৯৭৭]

পল্লব মিত্র

আর্শিতে ঘাতকের মুখ

আসুন, আমার মুঠোতে রাখুন বাহারি গোলাপ
আপনাদের যা' যা' সুন্দর তা' দিয়ে আমাকে সাজান
আমার সন্তানের জন্য সময় রাখুন, একটুকরো জমি রাখুন
আমার এখন বাসভূমি নেই, পাপ নেই পুণ্যি নেই,
অভিমান নেই।
আমার কোন চিত্র নেই, আমি আর্শিতে ঘাতকের মুখ দেখি
কলঙ্ক কত শত হ'লে বুঝে নিতে পারি বেদনার যন্ত্রণা
আলতা পায়ের ছাপ, কবিতার সহবাস কি দুর্বিসহ।
আপনার যারা কাছের মানুষ কবিতাকে রক্তে ভাসান
তাঁরা, আমাকে একটা সৎ কবিতা লিখতে দিন
একটা সৎ কবিতার ঐশ্বর্যে একজন কবিকে দীর্ঘ করুন।

রবীন মণ্ডলের সাম্প্রতিক ছবি

'আমি রসের ব্যাপারী, চরস বেচি না'।

'Yes ! I am alone with the masses !' হয়তো, মাও ৎসে তুং এর অনবদ্য এই টুকরো লাইন প'ড়ে কেউ মিলিয়ে নিতে চাইবেন পাশাপাশি জীবনানন্দ-কে :

সকল লোকের মাঝে বসে আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা ?

রবীন মণ্ডলের ছবি এই একাকীত্বের অসহায়তা, স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসন, যে জীবন পোড়-খাওয়া, হতচকিত...... এই সবই, বিশিষ্ট ও জোরালো আঙ্গিকের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন; এও এক জীবন, যা মনস্ক-দর্শককে গভীর ভাবে ভাবিয়ে তোলে—। শিল্পী কয়েকটা রেখার আঁচড়ে যা ফুটিয়ে তোলেন, প্রথম দর্শনে মনে হতেও পারে সহজ স্বচ্ছন্দে, আমি তা পারি না, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কি শিল্পী কি কবি অবশ্য-ই আপনি গন্ধে মাতোয়ারা, তা সে ছবি-ই হোক বা কবিতা-ই হোক—একটা ইন্‌সপিরেসন, অ-কথিত ও গভীর বাঙ্ময় একটা ফোর্স বা তাগিদ শিল্পী বা কবি-কে দিয়ে 'ঐ বিশেষ-কাজ' টি করিয়ে নেয়। আবার এও ঠিক যে, ধ্যানের জগতের স্তরে স্তরে যে বিভিন্ন রঙের অলৌকিক-বিচ্ছুরন—যে লীলা, তিনি মুহূর্ত মাত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা দীর্ঘ সময় জুড়ে ছেয়েছিল তাঁর প্রাণমন ঐ সত্য ও সুন্দরে; এবং এক সময় তাঁর কাজ বাস্তবায়িত অর্থাৎ সুসম্পন্ন হওয়ার পর, তা কতো দূর 'উত্‌রেছে', দর্শক তাঁকে ছুঁতে পারছেন কি না—ঠিক এ-কারণে-ই, বোধ হয় ছবির প্রদর্শনী।

রবীন মণ্ডলের উদ্ভাসিত ছবি, আমায় বারবার কাছে টেনে আনে, সমীপবর্তী করে। রবীনের প্রতি, আমার একটা বিনীত জিজ্ঞাসা : 'মানুষ কি

এখন, সব-অর্থে-ই ব্যর্থ মানুষ? শিল্পী, কবি ও লেখকদের এ ব্যাপারে কী করণীয় এবং তাঁরা, তা কতো দূর—অন্তত এ ব্যাপারে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন?

বিদগ্ধ মানুষেরা অবশ্য-ই, অনেকে একমত হবেন যে শিল্পেরও রয়েছে নিজস্ব ক্ষুধা, যা একটু একটু করে ক্ষইয়ে ফ্যালে। রঙ্-ই, রবীনের কাছে, মনের গহন কোনের দূরবর্তী-বার্তা—রঙের এই জাদু তাঁর অভিজ্ঞতা ও বোধের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর। একটা কথা অবশ্য বলা প্রয়োজন, তাও ক্ষণিক-প্রাপ্তি, কারো কারো কাছে সব সময় কাম্য নাও হতে পারে॥

রবীন মণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়:

ক্যালকাটা পেণ্টার্সের ফাউণ্ডার-মেম্বার। একক প্রদর্শনী: আকাদমী অফ ফাইন আর্টস্ ১৯৬১। আর্টস্ এণ্ড প্রিণ্টস্ গ্যালারী কলকাতা '৬৪, '৬৭। আর্টিষ্ট্রী হাউস কলকাতা '৬৫। প্রিয়দর্শিনী '৬৬, কেমল্ড গ্যালারী কলকাতা '৭১ '৭৩। ত্রিবেণী গ্যালারী নিউ দিল্লী, গ্যালারী ক্যালচারাল সেণ্টার '৭৬। যৌথ প্রদর্শনী। আইফ্যাক্স্ গ্যালারী নিউ দিল্লী ডিসেম্বর '৬৪, জানুয়ারী ১৯৬৯। কলকাতা তথ্যকেন্দ্র '৬৯, '৭১। বিড়লা আকাদামী, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী (বম্বে) ললিত কলা আকাদামী, শ্রীধরণী গ্যালারী, ন্যাশনাল এগজিবিশন অফ আর্ট, অ্যাঁলিয়াস ফ্রাঁসে, ম্যাক্স মূলার ভবন প্রভৃতিতে রয়েছে রবীনের ছবি। ইউ এস এ, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ণ আর্ট, নিউ দিল্লী, মিনিষ্ট্রী অব ইনডাষ্ট্রিজ, মণিপুর ষ্টেট ললিতকলা আকাদামী ইম্ফল, গ্যালারী কেমল্ড, বম্বে প্রভৃতিতে ছবি রয়েছে রবীন মণ্ডলের॥

দেবী রায়

অমিয়নাথ সান্যালের চিঠি

[অরুণ ভট্টাচার্যকে লিখিত]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় কৃষ্ণনগর

১৭. ৬. ৫৩

সহৃদয় বন্ধুবরেষু

আপনার পত্রখানি আমাকে যথেষ্ট পুলকিত করেছে। ইতিপূর্বে অন্য অপরিচিত কয়েকজনেরও চিঠি পড়ে আর আপনার প্রাণ খোলা চিঠির মর্ম বুঝে দেখছি একই আমার লেখাটি স্থানে স্থানে হেঁয়ালির আকার ধারণ করেছে, কারণ নানাজনে রচনা পড়ে নানারকমের ভাব উদ্ধার করেছে। বই লেখা ত নয় যেন অপরিচিতকে বন্ধুদলভূক্ত করে নেওয়ার ছলনা-জাল, আপনি দেখছি নিকটেই এসে পড়েছেন। অতএব—আমার পরিচয়টা করিয়ে দেই। তাহলে আপনার ও আমার দুজনেরই সুবিধা হতে পারে।

আমার চরিত্রগত একটা দুর্বলতা লেখার মধ্যেও বিস্তৃত হয়েছে। আমি ধ্রুপদ খেয়াল টপ্‌পা ঠুমরি প্রভৃতি ব্যাপারগুলি চেখে দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যেখানে ধ্রুপদ শুনেছি সেখানে ধ্রুপদের গান শুনতে পাই নি। ধ্রুপদ শোনার মানে ধ্রুপদ বলে ছক্ শোনা। সেরকম খেয়াল প্রভৃতি অজস্র ছক্ শুনেছি। ঠিক যেমন লোকে মেলায়-সাজান দোকানের দাবী-দেনার প্রচারের সামনে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মালের চেয়ে দাবীটাই যেন দামী।

কিন্তু—ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতির গানও শুনেছি। ছক্ আর গানে পার্থক্য করেছি। ছক্ উগ্‌লে দেওয়া যায়; যে কোনও তালিমদার লোক সেটা করতে পারেন। কিন্তু গানটা গাইতে হয়, উগলে দেওয়া চলে না; গান গাইতে বসে উগলে দেওয়ার চেষ্টা করলে সেটা হয়ে পড়ে একটা ছক্ বা pattern। মৌজুদ্দিনের মুখে উগলে দেওয়া ধ্রুপদ আর বাংলা গানও শুনেছি। অকিঞ্চিৎকর বলেই আলোচনা করি নি।

অনেক দুঃখ সহ্য করেছি। যে বয়সে গান গাওয়া সম্ভব নয় সে বয়সের শিল্পী পেট বা যশ বা কথার খাতিরে ধ্রুপদ প্রভৃতি ছক্ উগলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন দেখে দুঃখ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে (১) C. S. P. C. A. বিভাগকে জানান দিলে মন্দ হয় না (২) মজলিসের তামাশাবাজ পয়সা উসুলকরনেয়ালাদের বলতে ইচ্ছা করছে "What is sport with you is death to us."

আমি গানই শুনেছি, শোনার যোগ্য মনে করেছি। গানের স্মৃতিটা আমার পক্ষে অত্যন্ত তীব্র। যেমন—ছেলেবেলায় গিরিবালা মাসিমার হাতে রাঁধা 'মোচার ঘণ্ট।' এত রাজভোগ খেয়েছি, অজস্র রকমের ঘণ্ট ও মোচার ঘণ্ট খেয়েছি তবুও গিরিবালা মাসিমার মোচার ঘণ্টটি জিবে লেগে রয়েছে। এটা একটা দুর্বলতা। অর্থাৎ আমার থেকে সবল লোকেরা কোনও শিল্পীর ২।১ খানি গান ভাল মনে করার পরে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মনে করে নিতে পারেন, তার মুখের সমস্ত ছকই গান, আর সমস্ত গানই ভাল। এ রকম সবলতা আমার নেই।

এত সত্ত্বেও, আমি মনে করি, আমি যে চেষ্টাকে ছক্ উগলে দেওয়া বুঝেছি তাকে অন্য কেউ যদি গান গাওয়া মনে করেন, তাহলে আমার কিছুমাত্র লেশমাত্রও আপত্তি নেই। কিন্তু—তিনি যদি আমাকে বোঝাতে আসেন যে তার শোনা জিনিষটাই হ'ল 'গান', তা হ'লে আমি তাঁকে নমস্কার করেই পলায়ন করেছি। রাণাঘাটের বাজে সরপুরিয়া খেয়ে কেউ যদি এসে আমাকে বলেন তিনি আসল সরপুরিয়া খেয়েছেন, তা হলে—তর্ক করা একেবারেই বৃথা। তিনি ঐ সরপুরিয়ার মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকুন; আপত্তি করি নে, কারণ, হাজার হ'ক শিল্পীকে patronise করাটা ত' হয়ে যাচ্ছে!

শিল্পীর তালিম, বা সেই ঘরানার তালিমের চশ্‌মা পরে আমি গান শুনি নি। গানের যেটা আস্বাদ, সেই আস্বাদের চশমা পরে গুণীর আন্তরিক সত্তার কিছু অংশকে প্রত্যক্ষ করে এতই চমৎকৃত হয়েছি যে কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় তাঁদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে বসেছি। তালিমের দৃষ্টিতে গান ধরা দেয় না; সে দৃষ্টিতে সব আড়ানাই আড়ানা, সব ধ্রুপদই ধ্রুপদ। ছক্ পরীক্ষা করতে হলে অবশ্যই তালিমের চশমাটি পরতে হবে,—কিন্তু গান শুনতে নয়। এটা আমার অভিজ্ঞতা মাত্র, মতভেদ থাকতে পারে। সাক্ষাৎ ঈশ্বর নিয়েই যখন মতভেদ

রয়েছে, হুইস্কি ব্রাণ্ডির যখন রুচিভেদ রয়েছে, একই মালের লেবেল্-ভেদে ভিন্ন মাল বলে বিকিয়ে যাচ্ছে, তখন, এ বিষয়ে মতভেদ না থাকাই ত আশ্চর্য। আজ এ থেকে বেশী পরিচয় চেষ্টা করলে আপনি হয় তো ভয় পাবেন, বা বিরক্ত হবেন। যেমন মাছ, তেমন অপরিচিত বন্ধুকেও খেলিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। আমি—

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল।

[স্বর্গত অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পড়ে' আমি সান্যাল মহাশয়কে একটা চিঠি দিই এই মর্মে যে ধ্রুপদ বা খ্যালের চেয়ে ঠুম্‌রীর প্রতি এবং ঠুম্‌রী গায়কদের প্রতি যেন তিনি একটু পক্ষপাতদুষ্ট; আমার কাছে তো ধ্রুপদের গাম্ভীর্য বা খ্যালের রোমান্টিক ভাবকল্পনা ঠুম্‌রীর চেয়ে হৃদয়কে বেশী আকর্ষণ করে। সেই চিঠির উত্তর দান প্রসঙ্গে উনি একটি অসাধারণ চিঠি লেখেন। সেই চিঠি পড়লেই রসিক শ্রোতা সুরসিক অথচ পণ্ডিত অমিয়নাথ সান্যালের সংগীত সম্পর্কে ধারণার পরিচয় পাবেন। এই প্রসঙ্গে জানাই 'স্মৃতির অতলে'র চাইতে সংগীত বিষয়ে আর কোন গ্রন্থ আমাকে বেশী কাছে টানে নি। প্রকৃত সংগীত কি তা আমি এই একটি মাত্র বই পড়েই জানতে পেরেছি বোধ হয়। অরুণ ভট্টাচার্য]

●

দীর্ঘ ২৪ বৎসরের পথ-পরিক্রমার শেষে উত্তরসূরি পত্রিকা ২৫ বৎসরে পদার্পণ করলো। সমস্ত লেখকবর্গ, পাঠককুল, বিজ্ঞাপনদাতা বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী, পত্রিকার বিক্রেতাগণ এবং সকল সুহৃদ আমাদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ গ্রহণ করুন। এঁদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই উত্তরসূরির মত একটি রুচিবান পত্রিকা নানা বিরুদ্ধ স্রোতধারাকে অবলীলায় কাটিয়ে এসেছে। নবীন লেখক এবং রুচিবান পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, তাঁরা পঁচিশ বর্ষে অন্তত একটি করে নতুন গ্রাহক করে দিন।

●

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিণ্টস্মিথ, ১১৬ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

UTTARSURI Vol. 25 No. I Rs. 2·00

Regd. with the
Registrar of Newspapers
R. N. 8571/57

অমিয় চক্রবর্তী-কে
নিবেদিত

উত্তরসূরি ২৫শ বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪/বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৫

অমিয় চক্রবর্তী প্রসঙ্গে তথ্যনিষ্ঠ স্মৃতিচিত্র। লিখেছেন অরুণ ভট্টাচার্য এবং [illegible] সেন। কবির একটি আশ্চর্য রচনা। এবং চিঠিপত্র। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তরুণতম কবিদের কবিতা। 'কবিতা কবিতা' অধ্যায়ে গ্রামগঞ্জের কবিদের সংকলিত নতুন কবিতা।
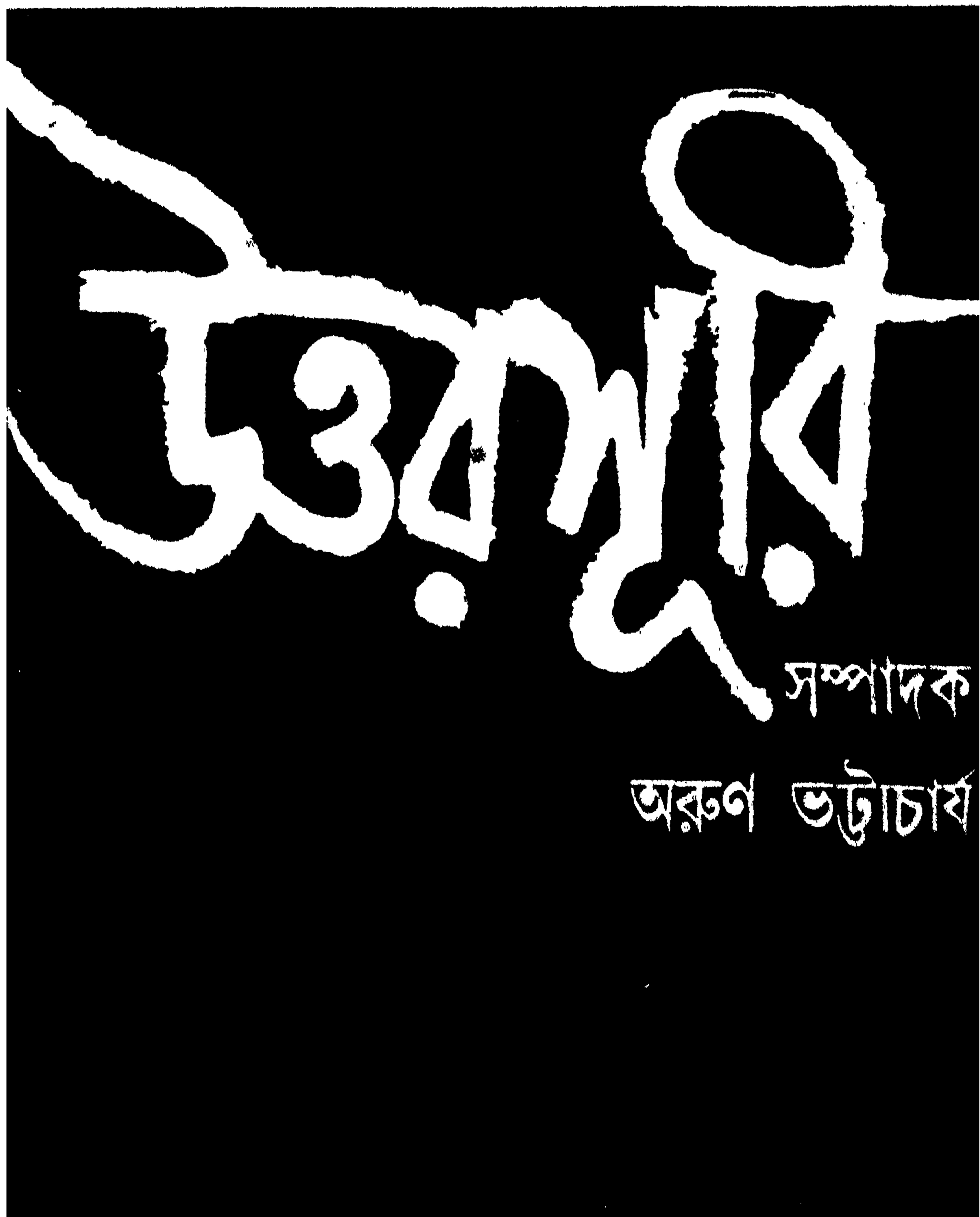
রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী

'বিশ্বভারতী'র সৌজন্যে

●

'... বেঁধেছি
আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে'

ডানলপ ইণ্ডিয়া
দেশের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে অষ্টপ্রহর ঠিক
সুরটি বাজিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।
পরিবহন, কৃষি, শিল্প,
প্রতিরক্ষা ও রপ্তানির ক্ষেত্রে
ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে
ডানলপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

DMC-80 BEN

দেশের কল্যাণে
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

উত্তরসূরি ২৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪

●

সৌজন্য স্বীকার : কবি শ্রীনরেশ গুহ এবং শ্রী সুধাংশু দে-র প্রতি

প্রচ্ছদ ● মলয়শংকর দাশগুপ্ত

●

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরি কার্যালয় : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০

'উত্তরসূরি' পত্রিকার আগামী সংখ্যা ২৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অর্থাৎ শততম সংখ্যা

●

প্রতিটি লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা-বন্ধু, কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীর নিয়ত প্রচেষ্টায় এই পত্রিকার শততম সংখ্যা প্রকাশিত হ'চ্ছে। বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, প্রবাসী, কবিতা, পূর্বাশা-র মতই কোন একদিন এর পুরনো সংখ্যার জন্ম গবেষকরা গ্রন্থাগারের প্রতিটি তাক খুঁজবেন।

●

কবিতা-আন্দোলনে অগ্রণী, স্বাধীন চিন্তার দোসর, সংগীত ও চারুশিল্পের সৃষ্টিধর্মিতায় বিশ্বাসী এই পত্রিকাকে রুচিবান বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন।

●

শততম সংখ্যার প্রাক্কালে বন্ধুদের কাছে সম্পাদকের আবেদন

কবিতার ভাবনা (৬) : অমিয় চক্রবর্তী, পশ্চিমী কবিতা, প্রতীকী অন্বেষণ ইত্যাদি

অরুণ ভট্টাচার্য

কিছুদিন পূর্বে লোকান্তরিত, সিম্বলিজম্ -এর অন্যতম প্রবক্তা এডমাণ্ড উইলসন মনে করতেন, প্রতীকী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কবিরা ফরাসী দেশীয়, ফরাসী দেশেই তাঁদের কাব্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে এবং ইংরেজ কবি কারো কারো কাছে তাঁরা ঋণী হলেও, তাঁদের মধ্যে এমন একধরণের নান্দনিক ধারণা গড়ে উঠেছিল যা ইংরেজ কবিদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বস্তুটিকে তিনি অবশ্য বেশীদূর টেনে নিয়ে যান নি। তবে যে সব ইংরেজ কবিদের, তাঁর প্রথম প্রবন্ধটিতে, তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্লেক অন্যতম। কিন্তু ব্লেক সম্পর্কে তিনি বিশেষ উৎসাহ শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি। উইলসন আরো মনে করতেন, রোমান্টিসিজ্‌মের মধ্যেই কোথাও বা প্রতীকীবাদের সূত্র রয়েছে। এড্‌গার অ্যালান পো'র বক্তব্য উদ্ধার করে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, প্রতীকীবাদ রোমান্টিক চেতনারই দ্বিতীয় উর্মিমালা, দ্বিতীয় প্লাবন। এবং এই আন্দোলন দুটি পরস্পর পরিপূরক।

ব্লেক-বিষয়ে তাঁর অনাগ্রহের মূলে প্রতীকীবাদ সম্পর্কে তাঁর এই পক্ষপাতদুষ্ট ধারণাই প্রথমত দায়ী বলে আমার মনে হয়েছে। রোমান্টিসিজ্‌ম্ ইংরেজ কবিদের কাছে ছিল একটি জীবন-দর্শন। সেই দর্শনের ভিত্তিতে তাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব কাব্যরীতি। অন্যপক্ষে, প্রতীকীবাদ মূলত একটি বিশেষ কাব্যরীতি, যে রীতির ভিত্তিতে পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে কবিদের বিশেষ বিশেষ মনোভঙ্গি। উইলসন সাহেব যদি এই দুটি কাব্যধারার মৌলিক পার্থক্যটুকুর গভীরে যেতেন তবে ব্লেক সম্পর্কে তাঁর অনাগ্রহ দূর হত। হয়ত বা তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থটির শুরুতেই তিনি ব্লেক বিষয়ে কিছু গুরুত্ব আরোপ করতেন।

এটা লক্ষণীয়, বাংলা এবং ইংরেজী এই দুই সাহিত্যের শুরু যে কবিতা দিয়ে, তাও প্রতীকীবাদের অস্পষ্ট উদাহরণ। চর্যাপদ -এর প্রায় সমস্ত ব্যাপারটিই প্রতীকাশ্রয়ী ; অন্যপক্ষে, অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতার বিষয়বস্তু প্রতীকী রীতিকেই আশ্রয় করে তার শরীর ধারণ করেছে, যদিও এই কাব্যকে অনেকেই রূপকাশ্রয়ী আখ্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

চর্যাগীতির বহু কবিতাতেই নদী, নৌকো ইত্যাদি রূপকগুলির ব্যবহার ক্রমশ প্রতীকে পর্যবসিত হয়েছে। 'শূন্য' শব্দটি (সুন্নু) বারবার নানা কবিতায় এসেছে। চর্যাপদের মধ্যে যে সন্ধ্যাভাষার জন্মলাভ হয়েছে তা নিশ্চয়ই রূপকাশ্রয়ী এবং এবং পরিশেষে, প্রতীকী দ্যোতনায় উদ্ভাসিত। 'বেওউলফ্' এর ড্রগন বা 'দি সিফেয়ারার' এর সমুদ্র নিছক প্রাচীন গাথাকাব্যের বর্ণনার জন্য কবি -কর্তৃক পরিকল্পিত হয় নি। এটা সত্য, উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে প্রতীক সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হয়েছে, কিন্তু চিরকালই কবিরা, সর্বদেশে, তাঁদের নিজ নিজ বোধকে সহজ সুন্দর করে অথবা গভীর কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি উপমা এবং রূপক। এবং উপমা ব্যবহার করেও যেখানে কবিরা তাঁদের পূর্ণ ধারণা প্রকাশ করতে সক্ষম হন নি, তখনই প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। সেকারণে, সর্বকালে প্রতীকী কবিরাই শ্রেষ্ঠ কবির আসন লাভ করেছেন। উপমা বা রূপক যেখানে কবিকে অংশত প্রকাশ করে, প্রতীক সেখানে কবির পূর্ণ ও সার্বিক প্রকাশের প্রতিরূপ।

প্রাক্‌-চৈতন্য, চৈতন্য এবং চৈতন্য -পরবর্তী বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব পদকর্তারা এক সর্বাত্মক প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং দীর্ঘ দীর্ঘকাল পরে বাংলা কবিতায় এলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁর মধ্যপর্বের কবিতাগুলিতে অসাধারণ প্রতীকী ঐশ্বর্যের চিহ্ন রেখে গেলেন। 'সোনার তরী' কবিতাটির প্রতীক নিয়ে বহু আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে, এ বিষয়ে নতুন করে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করে লাভ নেই ; কিন্তু একথা মেনে নিতেই হয়, অমন একটি কবিতা যে চিরকালের পাঠক দরবারে তার আসন করে নিয়েছে তা এই প্রতীক অন্বেষণের ফলস্বরূপ সার্থক সৃষ্টিতেই।

এমনি অসাধারণ এক বোধ এবং জগৎ-চেতনা নিয়ে জন্মেছিলেন উইলিয়ম

ব্লেক, যিনি জীবদ্দশায় বই -এর অঙ্গসজ্জা করি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ছত্রিশ বছর বাদে তাঁর জীবনী প্রকাশিত হল। জীবনীকার আলেক্জাণ্ডার গিলক্রাইস্ট অবশ্য বইটির প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নি। রসেটি ভ্রাতৃদ্বয় সে সময় ব্লেক সম্বন্ধে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখালেন। বস্তুত, বইটি রচনার শেষ পর্যায়ে রসেটিরা গিলক্রাইস্টকে বেশ সাহায্য করেছিলেন; তারও প্রায় পয়ষট্টি বৎসর পর সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ তাঁর কাব্যের মহত্ত্বকে স্বীকার করলেন এবং ব্যাখ্যা করে বললেন যে কবিতায় ব্লেক যে-প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন তা অতি সূক্ষ্ম এবং তার শৈলী এত চমকপ্রদ যে অন্য কোন কবির নাম পাশাপাশি মনে আসে না: His poetry deals in the subtlest kind of symbolism with a skill that cannot be matched.

উক্ত ইতিহাসকারগণ ব্লেকের 'প্রফেটিক বুক্স্' এ 'আনরুলি জিনিয়াস্' এর সন্ধান পেলেও তাঁর কবিতা যে 'পিওর ইনস্পিরেশন' দ্বারা পরিচালিত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই জীবনে যখন তিনি কোন পুরস্কার পান নি এবং মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত ছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে তিনি তাঁর কবিখ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছিলেন। সমকালীন সাহিত্য-সমালোচকদের বিচারে এবং প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকার কল্যাণে কত কবিরাই না তাদের ন্যায্য সম্মান থেকে জীবিতকালে বঞ্চিত হয়েছেন ভাবলে জীবনানন্দের সেই কবিতাটি মনে পড়ে যেখানে তথাকথিত সমালোচকদের উপলক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন, 'বরং নিজেই তুমি লেখ না'ক একটি কবিতা' !

রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-অন্বেষার বিষয় বাদ দিলে আর মনে পড়ে এলিয়টের সর্বাত্মক প্রতীক ব্যবহারের কথা। কিন্তু এলিয়টের রীতি ও ব্লেকের কাব্যরীতিতে প্রচুর পার্থক্য যে কোন পাঠকের কাছে ধরা পড়তে বাধ্য। এলিয়ট সামগ্রিক চেতনা থেকে বিচ্ছিন্নতায় পৌঁছেছেন। ব্লেক বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে সমগ্রে পৌঁছেছেন। এ প্রশ্নটি তুলে ধরবার কারণ ছিল। এলিয়টের কবিতাকে আমরা এখন গ্রেট পোয়েট্রি আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হই না। এলিয়ট নিজেও ব্লেকের কাব্যে সেই গ্রেটনেস-এর সন্ধান পেয়েছিলেন। একটি অসাধারণ আলোচনায় তিনি ব্লেকের জগৎ আমাদের কাছে এক নিমেষে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন:

If one follow Blake's mind through the several stages of his

poetic development, it is impossible to regard him as a naif, a wild man, a wild pet for the supercultivated. The strangeness is evaporated, the *peculiarity* is seen to be the peculiarity of all great poetry. Something which is found (not everywhere) in Homer and Aeschylus and Dante and Villon, and profound and concealed in the work of Shakespeare—and also in another form in Montaigne and Spinoza. It is merely a peculiar honesty, which in a world, too frightened to be honest, is peculiarly terrifying...Blake's poetry has the *unplesantness* of great poetry. (ইট্যালিকস্‌ লেখক-কৃত) এলিয়ট তাহলে ব্লেকের কবিতার মূলে একটি সততার কথা বলছেন—যে সততা অবশ্যই আমাদের কাছে 'ভয়ঙ্কর' মনে হবে। বিশেষ করে 'unpleasantness', বাংলায় আমার যা মনে হয়েছে 'অস্বস্তিকর' ; সত্যি ব্লেকের কবিতার জগতে প্রবেশ করতে গেলে সেই অসুচিন্তাই মনে আসে।

প্রতীক সম্বন্ধে এই সমস্ত কথাবার্তা ভাবতে ভাবতে বাঙালী কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটি মূল্যবান, অধুনা দুষ্প্রাপ্য, গ্রন্থের কয়েকটি পংক্তি মনে এলো। বইটি সযত্নে রাখা ছিল আমার আলমারিতে তিরিশ বছরেরও বেশী। কিন্তু মনে ছিল প্রায় প্রতিটি বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন তাঁর Modern Tendencies in English Literature নামক ছোট্ট অথচ উজ্জ্বল গ্রন্থে, কবিতার ধরণ যাই হোক না কেন, যে কোন 'ইজম্‌' দিয়েই তার বর্ণনা করা যাক, বড় কবিতা 'true poetic faith' ছাড়া সম্ভব নয়। এবং এই 'faith'কে পুরোপুরি এবং যথাযথ প্রকাশ করতে গেলে দুটি বিষয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রেরণার 'পর বিশ্বাস রেখে বসে থাকলেই হবে না, সুস্থির প্রকাশ করতে হবে তার 'faith'-কে, তার কলা-কৌশল বা কায়দা আয়ত্ত করতে হবে। অর্থাৎ 'প্রেরণা' নামক বস্তুকে তিনি বরবাদ করেন নি একেবারে, কবিকে একটু নড়েচড়ে বসতে বলেছেন। তাকে তৈরী হতে হবে সেই মহৎ কর্তব্যের জন্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'প্রেরণা' নামক বস্তুটিকে একেবারেই আমল দেন নি। কিন্তু সেটাও বোধহয় ঠিক নয়। তিনি যুক্তিগ্রাহ্যতা ও দার্শনিক চেতনা-সঞ্জাত বোধকে বেশী গুরুত্ব

দিয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের এমত মন্তব্য নিয়ে এক সময় তাঁর রাসেল স্ট্রীটের তিনতলার দক্ষিণের বারান্দায় তরুণ বয়সে আমি বহু তর্কাতর্কি করেছি। মনে আছে, সংশোধিত সংস্করণে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার একটি অসাধারণ পংক্তিকে 'edit' করেছিলেন। প্রথম সংস্করণে ছিল

ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী

তিনি নিজের কবিতা 'সংশোধন' করে করলেন

বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী

আমার আজো মনে আছে, তখন আমার বয়স কম, রক্ত গরম, মনে উত্তেজনা প্রবল। 'ভর' শব্দটির 'impact' অগ্রাহ্য করে উনি এমন একটা সাদামাঠা শব্দ বসালেন দেখে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলুন। বলেছিলুম, অমন কবিতাটিকে আপনি একেবারেই মাটি করেছেন—এতে আপনার কি লাভ জানি না, পাঠক সম্প্রদায়ের এ ক্ষতি পুরণ হবার নয়। তিনি স্বভাবসিদ্ধ নির্মল হাসি হাসলেন, এই প্রশান্তি আমি খুব বেশী দেখি নি, বললেন, ভেবে দেখলুম 'বাসা বাঁধা'র ব্যাপারটি অনেক 'logical', আমার বক্তব্যের সঙ্গে বেশী সুঠাম এবং সংগত। কেননা, প্রেম বিষয়টিকে আমি অমরাবতীতে পাকাকাকি বাঁধতে চেয়েছিলুম—'ভর করা' বললে এই 'স্থায়ী ভাব' সঞ্চারিত হয় না। আমি সেদিন কথাটি মেনে নিতে পারি নি। অনেকক্ষণ অবধি উত্তেজিতভাবে শব্দ, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি বিষয়ের অলৌকিকত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলুম, এবং উনিও বারবার 'logical' ব্যাপারটির ওপর জোর দিয়েছিলেন, চমৎকারভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে। আমি কিন্তু এখনো মনে করি না, ওঁর এজাতীয় পরিবর্তনে কবিতাটির উন্নতি হয়েছে। আমার ধারণা এখনো, কবিতাটির সর্বনাশ হয়েছে। কবিতাটির বক্তব্যের 'logic' রাখতে গিয়ে কবিতায় শব্দ-সাযুজ্যের যে ঘনিষ্ঠ ব্যঞ্জনা তা উনি নষ্ট করেছেন। এ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে-লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি (৮৪ সংখ্যক, চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড) স্মরণ করা যেতে পারে। কবিগুরু লিখেছেন, 'প্রধান কথাটা শব্দার্থের দ্বারাই ব্যক্ত হয় না, অনেকখানিই ভাষার ব্যঞ্জনায়। সেটা বাদ দিলে যে দীনতা ঘটে সেটা অপরিচ্ছন্ন।'

এখানেই প্রতীকের প্রশ্নটি এসে পড়ে। প্রতীকী কবিরা মোটেই 'logical' হাত চান নি প্রচলিত অর্থে; অবশ্যই স্মরণীয়, পশ্চিমী প্রতীকী কবিতার একজন

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বহু কবিতায়, পরবর্তীকালে, প্রতীকী দ্যোতনা এসেছে।

এবার ঘুরে আসি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য-ভাবনায়। এলিয়টের কবিতা প্রসঙ্গে, Enter Mr. Eliot নামক প্রবন্ধে, অমিয় চক্রবর্তী এডমাণ্ড উইলসনের বইটির কথাই তুলেছেন, Axel's Castle ; বলেছেন, 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কবিতার মধ্যে যদি বা পাওয়া যায় 'imagist mixtures' (এজরা পাউণ্ড সম্বন্ধে বলছেন, তাঁর 'ক্যাণ্টোজ্' হচ্ছে 'imagist association' -এর বিবর্তন) এলিয়টের নায়ক প্রুফ্রকের কল্পনায় 'সময়' বস্তুটি শুধুমাত্র 'eternal indecision' ; বক্তব্যটিকে আরো সুস্থির ভাবে দাঁড় করালে এমত বলা যায়, প্রুফ্রক হচ্ছে সময়-চেতনার প্রতীক—যে সময়-চেতনা আমাদের অনির্দেশ্যবাদের কাছাকাছি নিয়ে যায়। এই প্রবন্ধটি শুরু করেছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী অসাধারণ একটি মন্তব্য দিয়ে যা আমাকে যৌবনকালেও ভয়ানক নাড়া দিয়েছিল : The dreamland atmosphere of symbolist poetry had suddenly become heavy with shadows. It is, as if, the Lady of Shalott, forgetting her magic vow, had gone to the window and looked at life.. The mirror cracked and an unreal existence in the tower at Camelot was shattered into fragments, but *there was a beauty in the dying song of Symbolism* (ইটালিকস্ লেখক-কৃত); এই শেষ পংক্তিটি অসাধারণ। সুধীন্দ্রনাথের প্রতীকী ভাবনার সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর প্রতীকী ভাবনার পার্থক্য এখানেই। কোন্ কবির বক্তব্য সুস্থির চেতনার সঠিক মূল্যায়ন তা আমার মত বয়ঃকনিষ্ঠ কবির বিচার করা উচিত হবে না। কিন্তু আমার কাব্য-ভাবনার কাছাকাছি এসেছে এই শেষ পংক্তিটি, মনে হয় প্রতীকী কাব্য-ধারণার বিশ শতাব্দীর ঐতিহ্যকে অমিয় চক্রবর্তী বুঝেছেন, কবির দৃষ্টি দিয়েই। সুধীন্দ্রনাথে যেখানে অনবরত একটি 'logical' মনোভঙ্গি কাব্যবিশ্লেষণে সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করেছে, অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য-ধারণা সেখানে রহস্যঘন একটা সুদূর ব্যাপ্তির আলোকে চৈতন্যময়। ফলত, আমরা বহুদূর অবধি বিষয়টিকে নিয়ে ভাবতে পারি, এই সব কাব্য-ভাবনা নিয়ে মন যেন নাড়াচাড়া করে তৃপ্তি পায়।

বেশ কিছুদিন বাদে এবারে অমিয় চক্রবর্তী এসেছিলেন, শান্তিনিকেতনে,

পরিদর্শক অধ্যাপক হয়ে, ছিলেন ছ' মাস। এই সময়ে ওঁর কাছে বাংলাদেশের বহু প্রবীন কবি তরুণ কবি তরুণতম কবিরা গিয়েছেন, অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সব সমালোচকের সঙ্গ ওঁর দেখাশুনো হয়েছে, অজস্র কথাবার্তা বলেছেন, নানা সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছেন। অনেক তরুণ গবেষক পুরোপুরি তাঁদের খাতায় তাঁকে ধরে রেখেছেন। যখনই খবর পেয়েছি তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছি, বক্তৃতা তো নয়, যেন মুখোমুখি কথা বলছেন। এছাড়া আমার সুবিধে ছিল এই যে যখনই তিনি কাছাকাছি কোথাও বক্তৃতা দিতে যেতেন, আমায় চিঠি লিখে জানাতেন—অনুরোধ করতেন (আমার কাছে আদেশ অবশ্যই) সঙ্গে যেন থাকি। এখানে বলে রাখি, সাতাত্তর বছরেও মনের জোর অসাধারণ, যদি বা কখনো হাত ধরতে গেছি সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার বা নামবার সময়, স্পষ্ট কঠিন স্বরে বারণ করেছেন, বলেছেন একলা চলতে দাও, তোমরা তো আমার সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে না—জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত একলা চলার অভ্যাসটি যেন না হারাই। অপ্রস্তুত হয়ে হাত ছেড়ে দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে, মৃত্যুর কিছু পূর্বে উইলিয়াম ব্লেকের একটি চিঠির অংশ, জর্জ কাম্বারল্যাণ্ডকে লেখা, উদ্ধার করি যা এই বক্তব্যের পরিপূরক মনে হবে : I have been very near the Gates of Death & have returned very weak & an old Man feeble & tottering, but not in Spirit & life, not in The Real Man, The Imagination which Liveth for Ever. পাঠক লক্ষ্য করবেন কোথায় কোথায় স্পষ্ট ক্যাপিটাল অক্ষরগুলি রয়েছে। অমিয় চক্রবর্তী বহুবার, এবারের ভ্রমণ-পর্বে, যেন অবিকল এ কথাগুলিই বলেছেন—কী প্রাণশক্তি দেখলুম, কত স্মৃতি-ভারাক্রান্ত কথা বলেছেন—বিষ্ণু দে-র কথা, প্রেমেন দা-র কথা, নীহার বাবুর কথা, অন্নদাশংকরের কথা, অমলেন্দু বসুর কথা, অম্লান দত্তর কথা কতবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। অমলেন্দু বসু মহাশয়ের বুকে পেস্‌মেকার বসানোর বিষয়টি ওঁকে বেশ উদ্বিগ্ন করেছে মনে হল। উনি এ খোঁজ ঠিক রাখেন কোন্ কোন্ সাহিত্যিক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। আশ্চর্য! রবিশঙ্কর আসবার খবর তখনো গোপন, ঘটনাটি আমার কানে আসতেই জানালুম, রবিশঙ্করের বাজনা হবে, শুভলক্ষ্মীর আসবার খবরটিও শেষ অবধি অজানা ছিল, আমি জানতে পেরে তাও বললুম, এবং কী

উল্লাস! তরুণদের মত ছুটে চলে গেলেন দুদিনই, রবিশঙ্করের সেতার আর শুভলক্ষ্মীর গান শুনতে; শেষ দিন তো কলকাতা জলে থৈ থৈ, তারই মধ্যে। একি সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ কবি করছেন? না, সেই কবি যিনি মোটেই বৃদ্ধ নন, ব্লেকের মত, in Spirit & Life; যিনি মনে করেন The Real Man হচ্ছে 'Imagination which Liveth for Ever' -এর প্রতীক মাত্র।

এপ্রসঙ্গে একটি আবেগ আমার মাথা চাড়া দিচ্ছে, না বলে পারছি নে; যেহেতু এটি ব্যক্তিগত স্মৃতি-চারণ, পাঠক এই দুর্বলতা ক্ষমা করবেন। পঞ্চাশ অতিক্রম করেছি—স্বাভাবিক কারণেই পেছনের কথা সামনে চলে আসে। এই জীবনে কত অসংখ্য মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি নানা সূত্রে, তাঁদের অকৃপণ ভালোবাসা পেয়েছি। আলাউদ্দিন খাঁর মত ঋষিতুল্য সাধক (আমি তাঁকে সাধকই বলবো, শিল্পীর চেয়ে), তালতলায় ড. ভট্টাচার্যের বাড়ির তিনতলায় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কতদিন প্রণাম করে সামনে বসে অমৃতময় বাণী শুনেছি, অতুল গুপ্ত মহাশয়ের মত মহান ব্যক্তির পাশে বসে থেকে সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি-মাধুর্যের আলোচনা শুনেছি, অনুযোগ করেছেন, তোমরা কবিতা লেখো অথচ তরুণ কবিরা সংস্কৃত পড়ো না! সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের টোলে সারদাচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে যে কয়েকবছর সংস্কৃত শিখেছিলুম, সঙ্গে ছিল স্নেহভাজন অসীম ঘোষ, সেও তাঁরই উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে। যে-বুদ্ধদেব বসুর কবিতার আমি তীব্র সমালোচনা করেছি একদা, তিনিও স্নেহবশত দেখা হলেই জিজ্ঞেস করেছেন 'ভালো আছো তো। উত্তরস্মৃরি চালাচ্ছ তো', পূর্বাশা-সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উৎসাহ ব্যতিরেকে হয়ত কবিতা লেখাই বন্ধ হয়ে যেত। শিল্পী গোপাল ঘোষ আমার কাছে কতদিন এসে বসে থেকেছেন, একটার পর একটা সিগারেট, চা নয়ত কফি খেয়েছেন, ছবির বিষয়ে আমি প্রকৃতই নিরেট, তথাপি আমার সঙ্গে ছবি নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিঙ্করদার (রামকিঙ্কর বেজ) শান্তিনিকেতনের ছোট ঘরে হ্যারিকেনের নিবু-নিবু আলোয় তাঁরই ভাঙ্গা গলায় রবীন্দ্রসংগীত শোনা,—এমনি কতকত মানুষের স্মৃতি। ধ্রুপদীয়া অমর ভট্টাচার্য, টপ্পা-গায়ক কালীপদ পাঠক, কিছুদিন আমি শিখেছিলুম তাঁর কাছে, মৃত্যুর দুদিন আগে, আমিই সম্ভবত সেই শেষ ছাত্র যাকে চণ্ডীদাস মালের বালীর বাড়ীতে গান শিখিয়েছেন 'কে তোমারে শিখায়েছে এ প্রেম-ছলনা', সঙ্গীত-সাম্রাজ্ঞী কেশর

খাঙ্গ, কত স্নেহ এঁদের লাভ করেছি—সারা জীবনে যদি কিছু করে থাকি তাঁর প্রতিদান এভাবেই পেয়েছি ; এক সপ্তাহ না গেলে আমার গুরু আতা হুসেন খাঁ সাহেব লোক মারফৎ খবর নিয়েছেন, শৈলজাদার গানের ক্লাসে একদিন অনুপস্থিত থাকলেই মেয়েদের বলেছেন, আজ আর গান শেখাতে মন নেই, তোমাদের বাবা এরকম মাঝে মাঝে আসেন না কেন? এসব কথা ভাবলে চোখ দুটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। তারাপদ চক্রবর্তী, রবি শঙ্কর আমীর খাঁ গানের আসরে বসে আমার খোঁজ নিয়েছেন কাছাকাছি দেখতে না পেয়ে ; সুরে বুঁদ হয়ে থাকেন যে আলি আকবর তিনিও ধ্যানেশকে পাঠিয়েছেন আমার বাড়িতে, আমার বড় অসুখের সময়। বিন্দুমাত্র ব্লাড-প্রেসার বাড়লে নীহাররঞ্জন রায় এবং অমলেন্দু বসু চিঠি লিখে সাবধান থাকার দীর্ঘ নির্দেশ দিয়েছেন—এমনি অযাচিত স্নেহ সারা জীবন পেয়েছি, পেয়েছি অমিয় চক্রবর্তীর কাছেও। যাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি তর্ক করেছি, অমিয়নাথ সান্যাল, দিলীপ কুমার রায় তাঁদেরও অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মনের গ্লানি কেটে গিয়েছে বার বার। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের স্নেহ, রাজ্যেশ্বরের (মিত্র) ভালোবাসা আমার সঙ্গীত জীবন স্নেহসিক্ত করেছে। 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় আমার সঙ্গীত-সমালোচনা পড়ে পাহাড়ী দা (পাহাড়ী সান্যাল) আমাকে মজা করে 'notorious critic' বলে যাচ্ছেতাই বকেছেন আমি রাগ-রাগিণীর অত 'detailed' এবং 'technical' আলোচনা কেন করি এই অনুযোগ করে, অথচ কদিন বাদেই আমার বাড়িতে রাত্তির একটা অবধি আড্ডা দিয়ে গেছেন। মহাজাতি সদনে গান গাইতে বসে দেখি, সামনের সারিতে পাহাড়ীদা বসে আছেন ; পরে বলেছেন, It is for you that I crossed the Esplanade area towards the north', এ ভালোবাসার কোন বর্ণনা সম্ভব নয়। হাবুলদার (হিরণ সান্যাল) কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ এবং আমার কাঁধের ব্যাগে নানা জায়গায় 'কলিশন' হয়েছে, কলেজ স্ট্রীটে, চৌরঙ্গীর মোড়ে, এমন কি মৃত্যুর ক' দিন আগে গড়িয়ার বাজারের সামনে—এই সব অসংখ্য অনন্ত স্মৃতি অনন্ত কাল ধরে রাখতে ইচ্ছে যায়। ভাবি, খ্যাতি অর্জন না-করার দুঃখের বিকল্প হিসেবে শতগুণ আনন্দ পেয়েছি এই সব সংসর্গে। অমিয় চক্রবর্তীর সংসর্গ এঁদেরই মত অম্লান, জীবন্ত এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক। পাঠক, কিছু ক্লান্তিকর কথা

বললুম, লেখবার মুহূর্তে এসে গেলো। এ সময়ে সুধীন্দ্রনাথের 'logical mind' স্মরণে থাকলে এ জাতীয় পাগলামি করতুম না হয়ত।

১৩৮৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় উত্তরস্থরির সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তী প্রসঙ্গে কিছু কথা লিখেছিলাম—বিশেষত ক্ষোভের কথা বলেছি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন লেখক বা কবিকে যথোচিত সম্মান দানে বোধহয় কিছু কৃপণ। সে কথা আমার অসত্য প্রমাণিত হলো এবারই প্রথম, অমিয়বাবু যখন কলকাতা এলেন। কর্তৃপক্ষ, জানি না ঐ ক্ষোভ-প্রকাশের ফলেই কিনা, অমিয়বাবুকে প্রচণ্ডভাবে অভিনন্দনের ব্যবস্থা করলেন। হঠাৎ একদিন একটি ছোট্ট চিঠি পেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি লিখেছেন, অমিয়বাবুকে তাঁরা অভ্যর্থনা জানাবেন ইংরেজী বিভাগের তরফে। আমি গেলে ভবতোষবাবু বিশেষ খুশি হবেন। ভবতোষ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আমাকে স্মরণ করে তিনি আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসারই পরিচয় দিলেন। যথাসময়ে সেই পুরনো সেই ভাবগম্ভীর থমথমে দ্বারভাঙ্গা হলের মধ্যে উপস্থিত হলাম। সকাল এগারোটা। তিল-ধারণের স্থান ছিল না। অমিয়বাবু যে এত জনপ্রিয় তা আগে বুঝতে পারি নি। ভালো লাগলো, প্রবাসী কবিকে এই সম্মান দেখাবার জন্য। প্রথাসিদ্ধ অভিনন্দন ইত্যাদির পর অমিয় বাবু বলতে উঠলেন।

সেদিন ছিল ২৯শে জানুয়ারী, পুরো শীতকালের সকাল-গড়ানো প্রথম দুপুরের মিষ্টতা সর্বত্র ছড়িয়ে। বিষয় বেছে নিয়েছিলেন আধুনিক পশ্চিমী কবিতা, মূলত ইংল্যাণ্ডের এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের। খুব হাল আমলের কবিতার কথা কিছু বললেন না। ইয়েটস্, এলিয়ট বা রবার্ট ফ্রস্ট আর মাঝে মধ্যে এজ্রা পাউণ্ডের উল্লেখ, প্রসঙ্গত অন্যান্য কবিরা, এরই মধ্য দিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বললেন। একজন কবি শোনালেন ভিন্ দেশের কাব্যজগতের কথা। আধুনিক কবিতায়, বললেন অমিয় চক্রবর্তী, রোমান্টিক কবিদের 'আমিত্ব' বর্জন করা হ'ল। নির্বিশেষে চৈতন্যকে ধরবার ছোঁবার চেষ্টা করলেন কবিরা। তিনি বললেন, এটা অত্যন্ত সাহসের ব্যাপার। প্রসঙ্গ তুললেন সেই মহামতি শেকস্পীয়ারের, যিনি ঘটনাগুলির অসাধারণ নাটকীয়ত্বর মধ্যে থেকেও নিজে দূরে দাঁড়িয়ে অপার কৌতুকের সঙ্গে এই জীবনজগৎকে দেখতে পেরেছিলেন। গল্পের

বা কাহিনীর 'context' দেখেছেন 'objectively'; এই সঙ্গে বর্তমান জগতের দ্রুততা, এর চলমানতা, ভিক্টোরীয় যুগের থেকে পৃথক জীবনযাত্রার কথা পাশাপাশি ধরে বললেন, লণ্ডন শহরের যে ব্যস্ততা, গাড়ির হুইসল্, লাল ঝটিতি আলো, ট্রেণের বিদ্যুৎগতি, পৃথিবীর রঙ্ বদলানো, ক্ষণে ক্ষণে ঘটনার আকস্মিকতা এই সব আধুনিক কবির চোখে সময় সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা এনে দিল। এই ক্ষণমুহূর্ত থেকেই, বললেন তিনি, 'you have a whole eternity, the whole context' এবং ক্ষণ-বিচ্ছিন্ন সময়ের মধ্য থেকেই এই 'contextual time' এর বিভিন্ন উপাদানগুলি 'converge into a composition'. ডান বা হারবার্ট এর মত মেটাফিজিক্যালদের বা মিল্টনের কথা তুলে বললেন, 'their subjects demanded a reference'; মিল্টন সম্বন্ধে সত্য হলেও ডান বা হারবার্ট সম্বন্ধে এই উক্তি কি নিশ্চিত সত্য! যাই হোক।

এই সময়, বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের কবির দৃষ্টি কোন্‌দিকে! ধরা যাক্, একটি পথচারিণী তার কুকুর নিয়ে 'London fog' এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সে আমার দরজার কাছে পৌছোল। কিম্বা ধরা যাক্, একটা রঙিন উষ্ণ পোস্টার, থম্‌কে দাঁড়াতে হ'ল পথচারীর সঙ্গে কবিকেও। কবি এই সব তুচ্ছ ঘটনা থেকেও পেয়ে গেলেন কিছু চিরকালের সত্যবস্তুকে। সেকারণে, কবির কলমে ধরা পড়েছে 'a lovely mosaic out of a bridal dress' এবং অসম্ভব নয় কোন কবির পক্ষে আজকের দিনে, একটি দরজির দোকান নিয়ে কবিতা-লেখা। বিষয়-নিরপেক্ষতা মস্ত বড় জিনিষ—রবীন্দ্রনাথও একথা বুঝতেন, উর্বশী কবিতাতেও সেই 'objectivity' বর্তমান। উর্বশী এত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এত দূর-বিস্তৃত এর অভিধা যে সেই ধারা বজায় রেখে আর কেউ আবার লিখতে গেলে হবে নিছক 'parody'.

যুক্তরাষ্ট্রের একটি দীর্ঘ বাস-জার্ণির বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি, একটি বাসচালক নির্জন অসহায় পথচারিণীকে তুলে নিয়ে দূর গন্তব্যস্থানে তাকে পৌছে দিল—না দিলেও চলত—এই ঘটনাটির মহত্ত্ব উল্লেখ করে বললেন 'Every man is a character, you can raise him from dust if you have the imagination'. আধুনিক কবিতায় ছন্দ এবং মিল সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য করলেন, অবশ্যই তা' টুকরো টুকরো। বললেন, 'There is more power in

half rhyme' এমনকি 'non-rhyme'ও অনেক সময় 'systematic' rhyme' থেকে বেশী সংহত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিষয়টি অবশ্যই কবির ক্ষমতা ও ধারণার 'পর নির্ভর করে। রবার্ট ফ্রস্ট-এর কবিতায় চলে এলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। বললেন একজন আধুনিক কবি হচ্ছেন 'less an escapist', তাঁর কবিতায় নেই 'melodious অথবা decorative nonsense'; আমাদের কালে তার কোন প্রয়োজনও নেই। একটি বিবাহিত কাঠুরের কথা কবিতায় ধরা পড়ল, বড় গাছের গুঁড়ির ওপর বসে ছিল সেই কাঠুরে, হঠাৎ সে অনুভব করল এক ধরণের 'desolation', কোন কবি হয়ত এই 'desolation' থেকে এক ধরণের 'profound' অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। জাপানী 'হাইকু' কবিতাগুলির উল্লেখ করে বললেন, এই সব ছোট ছোট স্তবক 'does not take you (পাঠককে) anywhere', এ শুধু এক ধরণের 'remembrance'; এই প্রসঙ্গে মিল্টন সম্বন্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা করলেন, 'half of Paradise Lost is mere verbiage'; কবি অমিয় চক্রবর্তী কি মিল্টন বিষয়ে একটি বেশী রূঢ় হলেন না! ইয়েটস্ এর 'লেক আইল অব ইনিসফ্রি' সম্পর্কে ওঁর ভয়ানক দুর্বলতার কথা প্রকাশ পেল। ব্যস্ত শহরের মধ্যে একটি বাসের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে কবি কল্পনা করতে পারলেন 'I shall have some peace there'; রেস্তোরাঁয় বসে চা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হয়তো কবিতা আসতে পারে—সমস্ত ব্যাপারটাই কবির কাছে অ-নির্দ্ধারিত। রিল্‌কে, এলিয়ট প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন এঁদের কবি-ক্ষমতার কথা, 'power to evoke'—আর শেষে বললেন আবার সেই মহামতি শেকস্পীয়রেরই কথা—যাঁর সনেটে আমরা পাচ্ছি 'final hammer on the 14th line and the last word', তিনি জানতেন 'marble-cutting' এর কায়দা—এই কবি চিরকালের, যাঁর অধিগত ছিল কি করে 'craftsman's responsibilities, sheer sense of discipline' পালন করা যায়। আমরা বড় কবিতার ঘটনাবলীতে বড় কবিতার 'image' গুলিতে পাই 'not a confusion, but a convergence'. মোটামুটি এই ছিল কবি অমিয় চক্রবর্তীর মূল বক্তব্য, আমি যতটা বুঝেছি। উদ্ধৃতিগুলি সমস্তই ওঁরই বলা ইংরেজী, আমি সে সময়ই যথাযথ ধরে রেখেছিলাম—সেই নোট-খাতাটি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

আরো অনেক কথা হয়তো উদ্ধার করা যেত—লেখা যেত ওঁর বকলমে দীর্ঘ মূল্যবান প্রবন্ধ। কিন্তু একজন সৃষ্টিশীল লেখকের কাছে 'শব্দ' বিষয়টি সাংঘাতিক জরুরি। সেভাবে লেখা মানে সেই লেখককে ছোট করে আনা। আমি দু'-এক জায়গা থেকে অনুরুদ্ধ হয়েও সেজন্য লিখতে সম্মত হই নি। সেদিনই দ্বারভাঙ্গা হলে দুপুরবেলা বাংলা বিভাগ থেকে আয়োজিত সভায় আবার বক্তৃতা দিলেন। কবিতা সিংহ আমাকে বললেন, ওঁকে একটু রাজি করান আকাশ-বাণীতে কিছু বলবার জন্য। রাজি হবেন ভাবি নি—ক্লান্ত ছিলেন প্রায় চার ঘণ্টা সভা করে—কিন্তু রাজী হলেন। সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় রেডিওর রেকর্ডিং শেষ করে তাঁকে যখন 'রামকৃষ্ণ ইনস্টিট্যুট অব কালচার'-এ পৌছে দিলুম তখন মনে হল, তাঁর চেয়ে আমি বেশী ক্লান্ত। রেডিও কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল এমন একজন সম্মানী ব্যক্তিকে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌছে দেবার ব্যবস্থা কর, অথবা তাঁর বাসস্থানে গিয়ে রেকর্ড করে আনা।

এছাড়াও বন্ধুবর শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, আঞ্চলিক সাহিত্য অকাদেমীর সম্পাদক, অকাদেমীর তরফে কলকাতায় তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন, ডি. কে.-র স্মরণসভায় অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ এবং নৃপেন্দ্র সান্যাল তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, কবিতার একান্ত অনুরাগী শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি মেঘনাদবধ কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ করবার দুঃসাহস এবং সততা দেখাতে পারলেন, অমিয় চক্রবর্তীর ঘরোয়া আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, শ্যামলবাবু প্রকৃতপক্ষে কলকাতা শহরে কবির অভিভাবকের কাজ করেছেন এই কয়েক মাস।

এখানে বলে রাখি, এই কটি মাসে তাঁর জন্য ঘনঘনই শান্তিনিকেতন গিয়েছি, 'রাস্কা'য় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছি, আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু 'দুরন্ত দুপুর' -এর কবি নরেশ গুহ ছিলেন একবার, গান হয়েছে, গল্প আড্ডা, সাহিত্য, আন্তর্জাতিকতা, মানব-চৈতন্যের উন্মেষ, রবীন্দ্রনাথ গান্ধী, রবিশঙ্কর বা আলি আকবর ইত্যাদি কত বিষয়েই যে আলোচনা হয়েছে তার শেষ নেই। আবার একদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ থেকে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে শান্তিনিকেতন থেকে জানালেন বর্ধমান যেতে। ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. বড়ুয়া, শ্রীমতী লক্ষ্মী পরশুরাম

এবং আর সবাই কবিকে যথেষ্ট খাতির করলেন, সঙ্গে সঙ্গে থাকবার ফলে, আমার কপালেও বেশ আদর আপ্যায়ন জুটে গেল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে দেখতে ওঁর ভালোই লাগলো। ওখানকার বক্তৃতায় উনি বিষয়টিকে মোটেই 'অ্যাকাডেমিক' করেন নি। অনেকটা স্মৃতিচারণ গোছের, কবির কাছে যা প্রত্যাশা থাকে আমাদের। জানতুম যে বক্তৃতার পর সবাই কবিতা শুনতে চাইবেন। কেননা, বর্ধমান বা যে কোন মফঃস্বলের তরুণ ছেলেরা আধুনিক কবিতার বিষয়ে সাংঘাতিকভাবে আগ্রহী। কিছুদিন আগে আমিও বড়ুয়া সাহেবের আমন্ত্রণে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলুম এবং বক্তৃতা শেষে আমাকে বেশ কয়েকটি কবিতা পড়তে হয়েছিল। সুতরাং আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম যে অমিয় বাবুকে পড়তেই হবে। তাঁরই দেওয়া উপহার 'কবিতাসংগ্রহ' আমি নিয়ে গিয়েছিলুম। উনি কবিতা বাছতে বললেন, বেশ কয়েকটি কবিতা বেছেছিলুম। প্রত্যেকটি কবিতাই পড়লেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপক এঁদের সবারই কাছে অসাধারণ লেগেছিল কবিতা-পাঠ, বিশেষ করে 'সাবেকি' (গুরুচরণ কামার) কবিতার প্রতিটি স্তবকের শেষে 'রাম নাম সত্ হ্যায়' এর ধ্বনিসুষমা আমার কানে এখনো বাজছে। এই আবৃত্তি সহজে কি আর শোনা যাবে? প্রায় গানের refrain এর মত সুর; এ ছাড়া বেছেছিলুম 'বৃষ্টি', 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', (এই কবিতাটির সঙ্গে একদা তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার যোগসূত্র গ্রথিত ছিল, বলেছিলেন তিনি সেদিনই) 'চিরদিন', 'গাছ', 'পিঁপড়ে', এমনি কয়েকটি কবিতা। শ্রীনরেশ গুহ এবং শ্রী সুধাংশু দে-কে ধন্যবাদ। একটি জরুরি কাজ করেছেন অমিয় চক্রবর্তীর 'কবিতাসংগ্রহ' প্রকাশ করে। তিনি যে এই বয়সে কত উৎসাহ বোধ করেছেন বইটির জন্য, তা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি। বর্ধমান থেকে সেদিনই আমরা কলকাতায় ফিরলুম, ট্রেনে আগুন ধরে গিয়েছিল, ব্যাণ্ডেল স্টেশনে হৈ হৈ করে হাজার হাজার লোক নেমে পড়লো, কিন্তু আশ্চর্য, অমিয় বাবুকে বিশেষ বিচলিত হতে দেখি নি। এই প্রশান্তিই কি সাধনার ফলশ্রুতি!

পরের দিন শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এমারেল্ড বাওয়ার' ক্যাম্পাসে ওঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। বড় দুঃখের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ে অমিয় বাবুর 'কবিতাসংগ্রহ' বা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কিছুই পাওয়া গেল না।

কবি হিসেবে আমি দুঃখ বোধ করেছি এজন্য যে আধুনিক বাংলা কবিতার সংগ্রহ বড়ই শোচনীয়। সেদিন রীতিমত লজ্জা পেতে হয়েছিল আমাদের। বিভাগীয় অধ্যাপকরা যদি একটু দৃষ্টি দেন, তাহলেই তো ব্যবস্থা হয়ে যায়, শুনতে পাই টাকার কোন অভাব কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা 'পূরবী' থেকে পুরো আবৃত্তি করলেন। সে আবৃত্তি অসাধারণ। আমি অন্তত জীবনে এমন কবিতা-পাঠ খুব বেশী শুনি নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে আমি একবার অনেক অনুরোধ করে 'রেনেশাঁস ক্লাবে' নিয়ে এসেছিলুম, কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের তিনতলায়। সুধীন্দ্রনাথের সেদিনের কবিতা-পাঠ স্মরণে এলো, যদিও এই দুই কবির আবৃত্তির ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। অমিয় চক্রবর্তীর একটি মাত্র কবিতার বই গ্রন্থাগারিক মহাশয় কোনরকমে এনে দিলেন, তাই থেকে দু-তিনটি কবিতা বেছে দিলুম। তবু সান্ত্বনা এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল অধ্যাপকই, ছাত্রদের মতই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে, আগাগোড়া উপস্থিত থেকে তাঁর বক্তব্য শুনেছেন। আমাদের অধ্যাপকদের একটা দুর্নাম এই, তাঁরা নিজেরাই সব সময়ে বক্তৃতা করেন, অন্যের বক্তৃতা শোনেন না। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা প্রমাণ করলেন, সে কথা সব সময় সত্য নয়। পরের দিন উপাচার্য মহাশয় ওঁকে রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেদিন উনি বললেন, রবীন্দ্রনাথেরই বিষয়ে। যতদূর মনে পড়ছে, ২৫শে ফেব্রুয়ারীর সকাল ছিল সেদিন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বলতে বলতে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, কবির জীবনী 'রবীন্দ্রজীবনীর' মধ্যেও আবদ্ধ নয়। নদীর ধারার সঙ্গেই অন্য ধারা যুক্ত করতে হয়। বিরাট প্রবাহে অবগাহন করতে হয়। শিলাইদহ গেলেন, পদ্মায়। রবীন্দ্রনাথ সব জায়গা থেকে তীর্থবারি নিয়ে আসতেন। তাইতেই হল তাঁর মুক্তির নির্দেশ, ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করলেন নিজের মত। সাবেকি ঠাকুরবাড়িকে অমিয় চক্রবর্তী একটি ছোট্ট দ্বীপবর্তী সমাজের সঙ্গে তুলনা করলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মনটা, আসলে ছিল বাংলা দেশেরই, একথা তিনি জানালেন। একটি তথ্য অমিয় বাবু সেদিন আমাদের নিবেদন করলেন। তা হল, 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে' গানটি রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁর পিতৃদেব মহর্ষিকেই শুনিয়েছিলেন। শেষ করলেন তাঁর কথা বলে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের সেতু। এই সেতু পারাপার

চলছে বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর আজও, ততদিন চলবে যতদিন ভারতীয় সংস্কৃতি তার ঐতিহ্যকে ভুলতে পারবে না।

শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে অমিয় বাবু চিঠি দিলেন, জোড়াসাঁকোয় এবং রবীন্দ্রভারতীর নতুন বাড়িতে দুদিনই উনি বড় আনন্দ পেয়েছেন। উপাচার্য মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাতে বলেছিলেন সুন্দর ব্যবস্থার জন্য। রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে, তরুণ শিক্ষকদের কাছে এ স্মৃতি পরবর্তীকালে গল্প হয়ে থাকবে। আমার একটু দুঃখ থেকে গেল। আমার বন্ধু, গ্রামোফোন কোম্পানীর পি. কে. ব্যানার্জিকে আর্জি পেশ করেছিলুম, কিছু রেকর্ডে কবির কণ্ঠ ধরে রাখুন। উনি চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সময় অভাবে এবারে সেটা হ'ল না। পরের বার যখন আসবেন, নিশ্চয়ই হবে, আশ্বাস পেলুম।

এমনি করে ঘুরে বেড়িয়ে, কথা বলে, বক্তৃতা দিয়ে কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে কবি অমিয় চক্রবর্তীর ছ' মাসের পরিক্রমা একদিন শেষ হল। ফিরে যাবার দিন স্থির হল। সেই সুদূর নিউইয়র্ক, ন্যু পলজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত গবেষণা-ঘর।

সতেরোই এপ্রিল ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর যাবার কথা। সকাল থেকে আকাশে ঘন মেঘ। দমদম বিমানবন্দরে গেলুম। দুজনের সঙ্গে দেখা হ'ল হলঘরে। ওঁর এক ভাই ছিলেন। প্রায় একঘণ্টা গল্পগুজবে কাটলো। মালপত্তর ওজন করবার শেষে যাবার তাড়া এল ; ঘোষণা হল, প্লেন এবার তৈরী। প্রণাম করে শ্রীমতী চক্রবর্তীকে বললুম, 'ওঁকে পাকাপাকি নিয়ে আসুন, জীবনের শেষ ক বছর দেশে থাকুন'। শ্রীমতী জানালেন, 'আমি তো উৎসুক, ওঁকে আপনারা বলে কয়ে রাজি করান'। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে আশ্বাস দিলেন, আগামী বছর আবার আসবো, ইচ্ছে আছে।' বলেই পোর্টফোলিও নিয়ে হাঁটা ধরলেন, আর পেছনে তাকালেন না। আমি, যতদূর দেখা যায়, দেখে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে এলুম। হাঁটতে হাঁটতে উনি কি বলেছিলেন, 'কলকাতা, বিদায় দাও। টার্মিনাল বিল্ডিং-এ জ্বলছে দপ্ দপ্ দুটি তারা।'

অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কিছু উজ্জ্বল মুহূর্ত

সুগতা সেন

কবি শ্রী অমিয় চক্রবর্তী Zen (জেন) সম্পর্কে বললেন, এঁদের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম থেকেই উদ্ভূত। এঁরা জগতের কোন একটি সূত্র অবলম্বন করেই অনন্তের সন্ধান পান। একজন Zen আর একজন Zenকে বললেন, বহু জপতপ ধ্যানধারণার পরেও তিনি জীবনের অর্থটি খুঁজে পেলেন না। তখন উদ্দিষ্ট Zen বললেন, সামনের নদীটি পেরিয়ে চলে যাও ঐ বনে—সেখানেই পাবে জীবনের অর্থকে খুঁজে। বিস্মিত Zen তাই করলেন। নদী পার হয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে দেখলেন কাঠুরেরা কাঠ কাটছে বনে। আনন্দের হিল্লোল তাদের দেহে মনে, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। মুহূর্তমধ্যে সাধক অবিষ্কার করলেন জীবনের অন্তর্নিহিত আনন্দময় সত্তাকে।

সর্বাপেক্ষা বড় জেন সুজুকী (৯৩ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন) একদিন আমার এক ক্লাসে লীলাচ্ছলে বলেছিলেন, প্রথম মানব আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল অর্ধেকটা। তাই তার জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নি! পুরোটা খেলেই তার জ্ঞানচক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত হত! বস্টনে আমার ছাত্রছাত্রীরা তাদের পুরনো বাইবেলের প্রসঙ্গে এই ব্যাখ্যায় চমকিত হল। সুজুকীর মতে ঘাসের আগায় একবিন্দু শিশিরকণা দেখলে প্রতীতি জন্মায় যে জগতের কোথাও করুণারস সঞ্চিত হয়ে আছে। তা নইলে এ বিন্দুটি এল কেমন করে? এঁরা হাল্‌কা সুরে গভীর জীবনদর্শন ব্যক্ত করেন।

একবার আমি কিয়োটোতে একটি জেন মন্দিরে গিয়ে দেখলাম—একটি সরোবরের ধারে গৃহকর্ত্রী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ বসে আছেন—নিশ্চুপ হয়ে। একটি নীলপদ্ম ফুটবে একটিমাত্র বৃন্তের উপরে—তারই প্রতীক্ষায়। ক্রমে শতদল বিকশিত হবে—ভিতরে স্বর্ণগোলকটি বেরিয়ে আসবে—সেই বিকাশের মধ্যে তাঁরা বিশ্বসৃষ্টির উৎস সন্ধান করবেন। রবীন্দ্রনাথ টোকিয়ো শহরে বাসকালীন একদা এইরকম জেন-ধ্যানপরতায়-বিধৃত শিল্পদৃষ্টির

কথা শুনেছিলেন। তাঁর জাপানী বন্ধুর বাড়িতে শুনলেন কাছের একটি কারখানায় ঘণ্টা বাজছে, ভাবলেন বোধ হয় মজুরদের বিরতি-লগ্ন, তাই ছুটির ঘণ্টা। গৃহস্বামী বললেন—ওরা সবাই যাচ্ছে একটি হ্রদে বিশেষ পদ্ম উন্মীলিত হবার লগ্নে—গিয়ে দেখবে শতদলের বিকাশ—যা সমস্ত সৃষ্টির বিকাশ-প্রতীক।

জাপানের যে কোন আর্টেই এই প্রতীকধর্মিতা দেখি। তারা নাটক করে, কোন মঞ্চসজ্জা নেই, একটি গাছের ডাল হাতে নিয়ে জানিয়ে দেয় গভীর অরণ্যের উপস্থিতি। নাটকে দেখি—একটি পথিক চলতে চলতে একটি গাছের নীচে দাঁড়ালো, সেইখানে কোনো যুবক যুবতীর ভালবাসার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। পথিকের চোখের সামনে সেই স্মৃতিগুলি মূর্তি পরিগ্রহ করল, যেন অন্য জগৎ থেকে তারা ক্ষণিক লগ্নের যোগে একত্র হতে পারল, তাদের জীবনব্যাপী বিরহ যেন সেই মুহূর্তে অবসিত হল। আবার তারা মিলিয়ে গেল, পথিক চলে গেল। বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্যদেশে এই জাতীয় প্রতীক-শিল্প অভাবনীয়।

Li, T'ien প্রভৃতি জেন ধর্মের কতকগুলি ধাপেও দেখি, অনন্ত নীহারিকা, বিশ্বপরিমণ্ডল থেকে শুরু করে একবিন্দু শিশিরকণা, একটি ঘাসের ফুল—সকলেরই একটি পারমাত্মিক যোগ তাঁরা দেখেছেন। ঘাসের উপর একটি ফুলের পাঁপড়ি পড়ে আছে, কিন্তু তার পিছনে সূর্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবই কাজ করছে—নতুবা এ সম্ভব হত না। এই দৃষ্টিভঙ্গিই মহাপুরুষদের বিশ্ববিষয়ের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌভ্রাত্র্য-বোধ জেগে ওঠে। তাই কনফুসিয়স বলেছেন—'যতদূর দৃষ্টি চলে সবাই আমার ভাই'। স্পষ্ট বলেছেন "Within the four stars we are all brothers," এত বড় কথা খুব কম শোনা যায়। চীন ও জাপানের ধর্মের ভাবগত যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ।

'পূরবী' কাব্য রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। এর মধ্যে বিদায়ের করুণ সুর ধ্বনিত। পূরবী রাগিণীতে যেমন একদিকে সূর্যাস্তের অপূর্ব বর্ণ-সমারোহ, অপরদিকে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার একত্রে রূপ পায়, এই কাব্যেও তেমনই স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রেমধারণার সঙ্গে আসন্ন বিদায়-বেদনা একত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমবোধ ছিল বিশ্বব্যাপী। শুধুমাত্র একটি বা দুটি

নারীর মধ্যে সেই প্রেম সীমিত হতে পারে না। বিজয়া, বা কাদম্বরী দেবী—পূরবীর আনন্তিক প্রেম মাত্র এঁদের বা অন্যদের নিয়েই নয়। বিজয়া সম্পর্কে মাত্র চার পাঁচটি কবিতা আছে। কবি নিজেই বলেছেন 'আম রে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?' ক্ষুদ্র পরিসর বা গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ করা যাবে না—কারণ 'কেবলই এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে'। কবি-জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা কবি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন, তার ফলে তাঁকে সেগুলির মধ্যেই বেঁধে রাখবার চেষ্টা করা হয়। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ বহুবার হয়েছে, কিন্তু ঐ সদর স্ট্রীটের কথাই বারে বারে বলা হয়। তিনি নিজেও প্রতীক বা ঘটনার যোগে ঐ বিশেষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্য অনুবাদ করে পড়া যায় না। তাঁর নিজের মাতৃভাষাতেও একটি শব্দ অদলবদল করা যায় না। 'হে নন্দনবাসিনী উর্বশী'—কথাটি কি অনুবাদের সাহায্যে বোঝানো সম্ভব? শেকস্‌পীয়রের কবিতাও তেমনি পরিবর্তনের বাইরে। "Springtime merry ringtime" কোরাসে গাওয়া হয়, আর একটিমাত্র লোক বাঁশি বাজিয়ে গায় "For the rain it raineth everyday"। তেমনি সমুদ্রে নিমজ্জিত মৃতব্যক্তির কথায় বলেছেন, "Suffers a sea-change into something rich and strange". এইরকমে ইঙ্গিতে সমগ্রতায় মিলে অপূর্ব অনুভূতির রাজ্য সৃষ্টি হয়। কি সূক্ষ্ম বেদনা, কি অপার প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশ মহাকবির রচনায়—তা ব্যাখ্যাগম্য নয়। অথচ বিশ্লেষণ করতেও দোষ নেই যদি তা অরুণ বাবুর মতো গুণী, 'উত্তরসূরি'র সম্পাদক শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, সুরে ও কথার সন্ধানে এবং ধ্যানের ভাব নিয়ে তুলে ধরেন।

সামান্য বিষয়কে অবলম্বন করে অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ঘটে। 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে' গানটিতে সামান্য একটি দ্বিধাকে অবলম্বন করে কি অনন্ত বেদনার জগতে কবি চলে গেছেন—'আকাশে উড়িছে বকপাঁতি, বেদনা আমার তারি সাথি'। কিংবা বলছেন, 'কিছু বলব বলে এসেছিলেম, রইনু চেয়ে না বলে কিছু'—একটি গুনগুন গান, একটি অ-গাঁথা মালা—সব মিলে অনুভূতির কি অপরিসীম প্রগাঢ়তা। দ্বিধার গানটিতে বেদনা অনুরণিত হয়েছে বারবার 'আমি বসে বসে ভাবি নিয়ে কম্পিত হৃদয়খানি'। আরেকটি গানে দ্বারের পাশে মল্লিকার লতা দেখে মনে হচ্ছে, আমি যখন থাকব না, তখনও ঐ ফুলটি

আমারই স্মৃতি বহন করবে। যেমন আছে আশ্চর্য তাঁর ভৈরবী সুরে রচিত প্রভাতী গানটিতে—

"এমন ঊষা আসবে আবার সোনার রঙিন দিগন্তে
কুন্দের দুল সীমন্তে"।

বলছেন, "সেদিন নাই যদি ব্যোম নাই রবি"
এই যে পরমতাকে আজ জানলেন বিদায় বা মৃত্যুতে তার অবসান নেই। ইঙ্গিতে, আভাসে; রূপকল্পনায় সামান্য উপলক্ষ নিয়ে কত কথা বলা হয়ে যায়, বিষয়বস্তুর সন্ধান করতে গেলে তার কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। যথার্থ কবির রচনায় এই ভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম অনুভূতির সন্ধান মেলে।

সাহিত্যে শিল্পীর বেদনা ও অন্তর্দৃষ্টির চেতনা বিদেশী কবির রচনায় প্রভূত পরিমাণে আছে। ফ্রান্সিস টমসন snowflakes দেখে বলছেন (On Snow-flakes)—

"...Filigree petal
of imagineless metal
hammered on the anvil of God"

এই কবিতাংশে শব্দচয়ন, উপমা সবই অসাধারণ। কবির শিল্পশক্তির চরম প্রকাশ এগুলির মধ্যে। এগুলি কিন্তু চেষ্টাকৃত নয়, স্বতস্ফূর্ত। তাই, এগুলি এমন সার্থক এবং কবির বিস্ময়কর অনুভূতির এমন সফল বাহক। আবার এই বিশেষ শব্দগুলির প্রয়োগে বিশ্ব-শিল্পকলার পিছনে শিল্পীর যে অপরিসীম শক্তি ব্যয় হয়েছে, তারও পরিচয় পাওয়া যায়। অসীম শক্তি ব্যতীত এত সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সৃষ্টি করা অসম্ভব। একটি কোমল ফুলের পাঁপড়ি বা তুষারকণা গড়তে যে শক্তির প্রয়োজন, একটি পর্বত গড়তেও হয়তো তত শক্তির প্রয়োজন হয় না। তাই একজন রুশ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের 'Crescent Moon' এর সেই কবিতার লাইন পড়ে অভিভূত বোধ করেছিলেন—'Who gave the smile to the baby's lips ?' নবজাত শিশুর মুখের যে সুকোমল হাসি এত মধুর, এত ক্ষণিক, এ কে গড়ল ? তেমনই মাতৃস্নেহ কে ভরে দিল নারীর বুকে ? তার যে অপার শক্তি তরে তুলনা কোথায় ? যাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগে তিনিই সেই অসীম শক্তিময় পরমকারুণিকের সন্ধান পান। কিন্তু তাঁকে কেবলমাত্র একটি পুরুষ বলে মেনে নিতেও দ্বিধা হয়।

সেই একটি মাত্র লোক মেঘের উপরে বসে দুনিয়া চালাচ্ছেন, এত কিছু সৃষ্টি করছেন—এ যেন কেমন লাগে। পারমিক শক্তিটাকেই মেনে নিতে ইচ্ছে জাগে।

ট্র্যাপিস্ট মঙ্ক টমাস মার্টন (Thomas Merton) অসাধারণ সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁদের নীতি, দিনে মাত্র পঁচিশ মিনিট কথা বলবেন। তাঁর মূর্তি থেকে এমন একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হত অচেনা ব্যক্তিও তাঁকে চিনতেন সাধু বলে। কলকাতায় এসেছিলেন—চোখ মেলে সবকিছু দেখতেন, উড়ন্ত পাখি, গরুর গাড়ি, চলমান মানুষ। যামিনী রায়ের কাছে গিয়ে যীশুখৃস্টের একটি ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন। ছবিটির চারপাশ নীল, মাঝখানে যীশুর দেহ ঘিরে অপূর্ব সোনালী জ্যোতি বিকশিত হচ্ছে। ক্রুশবিদ্ধ যীশু—কিন্তু প্রথাগতরূপে রুধিরের ছবি নেই, কেবল একটি বিন্দু রক্ত দেখা যাচ্ছে। যামিনী রায়ের মনে এই ছবি কেমন করে এসেছিল—ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তিনি কোনদিন বিদেশ যান নি। টমাস মার্টন এই ছবি দেখে মুগ্ধ, বিস্মিত হন। ছবির রঙ, তুলি, এমন কি কাগজ পর্যন্ত শিল্পীর নিজের তৈরী। টমাস মার্টন বললেন, তাঁদের সাধনাও এই একাগ্রতার সাধনা। চীজ তৈরী করতে, হাল চষতে, আবার প্রার্থনার সময়ে গ্রেগেরিয়ান চাণ্ট (অনেকটা আমাদের রাগরাগিণীর আলাপের মত শুনতে) গাইবার সময়, এই একাগ্রতার এবং ত্রুটিহীনতার প্রয়োজন। এই ছবির উপযুক্ত স্থান হিসাবে টমাস মার্টন একটি কনভেণ্ট এর ঠিকানা দিলেন যেখানে বারো জন nun বাস করেন।

টমাস মার্টন কলকাতা থেকে দালাই লামার কাছে যান ধরমশালায়, উত্তর ভারতে। বহুক্ষণ তাঁদের ভাবের আদান প্রদান চলে। যদিও তাঁদের কথা বলবার রীতি হয় ধ্যানে নয়, নির্বাকতার দ্বারা। দালাই লামা তাঁদের ধর্মসাধনার সঙ্গে ট্র্যাপিস্ট সাধনার খুবই সাদৃশ্য দেখেছিলেন। সেখান থেকে ব্যাংকে গিয়ে টমাস মার্টন একটি ছিন্ন বৈদ্যুতিক তার দৈবাৎ স্পর্শ করায় electrocuted হয়ে মারা যান।

টমাস মার্টনের ইচ্ছেমতো সেই ছবিটি কিছুদিন পরে আমি সেই সাধিকাদের আশ্রমে নিয়ে যাই। সানফ্রান্সিসকো থেকে চার ঘণ্টার পথ। তিন হাজার বছরের পুরনো গাছ সব দাঁড়িয়ে আছে, নীচে অতল, নীল প্রশান্ত মহাসাগর—

তারই ধারে তাঁদের আশ্রম। এই ছবিটি দেখে তাঁরা নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন। জানতে চাইলেন এর সৃষ্টিরহস্য। কিন্তু যামিনী রায়েরও তখন মৃত্যু হয়েছে। এই সাধিকাদের জীবনযাত্রা অসাধারণ। তাঁদের সঙ্গে ছিলাম দু'টি দিন। মার্কিনের Hartford এর বাইরে একটি শিল্পরুচিসম্পন্ন বিদগ্ধ অধ্যাপকের নিজস্ব সংগ্রহে যামিনী রায়ের আরও ক'টা ছবি দেখেছি। পূর্বতন ছবিটি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় সংগ্রাহক বললেন, যামিনী রায় তাঁকে একদিন কলকাতায় বলেছিলেন—মনে হয়েছিল যীশু যেন ক্রুশের ভার আর বহন করতে পারছেন না। Via Dolorosa—নির্বাণপথযাত্রী যীশুর ছবি তিনি যেন হঠাৎ স্পষ্ট দেখলেন। প্রচণ্ড ভারী ক্রুশ তাঁকে বহন করে চলতে হয়েছিল—বারবার পড়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গের অত্যাচারী দুর্বৃত্তরা ব্যঙ্গ করেছিল—তুমি না king of kings ? তাহলে নিজেকে রক্ষা করছ না কেন? তারা তো জানত না কোথায় বিস্তৃত হয়েছিল যীশুর সাম্রাজ্য। আমিও সেই দুরূহ দুঃখের পথে যেন খানিক চলেছিলাম। দুঃখের চেয়ে যা আনন্তিক বেশি তারি পথে। ঐতিহাসিক একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা কত গভীর করুণায়, এমন কি চরম ত্যাগের, সান্নিধ্যের আনন্দে সমাশ্রিত, করুণায় অভিষিক্ত। খৃষ্টধর্ম ভালো ক'রে জানি নে, সেই ধর্মাবলম্বী নই। কিন্তু সে ধর্মের যাঁরা সাধক, তাঁদের দেখলে মনে হয়, ধর্মের একচ্ছত্র অধিকার আমাদেরই—এ অহংকার কত মূল্যহীন।

জনৈক লেখক কবিকে বলেছিলেন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি-সমস্যার সমাধানের উপায় কিছু লোককে হত্যা করা। এ কথা দূরযাত্রী কবিকে বিশেষ ব্যথিত করে। কোথায় মানুষ ভালো করে বাঁচবে, মানুষের কল্যাণবৃদ্ধির চেষ্টা হবে—তার বদলে তাদের হত্যা করার চিন্তা অকল্পনীয়। বক্তার যুক্তি—এরা সমাজের কাজে লাগে না। কবি বলছেন, আমরা একটু লেখাপড়া শিখে চাকরী করি, কিংবা দুটো কবিতা লিখি, তাতে আমাদের বাঁচবার অধিকার জন্মায়, আর যে মুড়ি বেচে অতিকষ্টে এক পাশে পড়ে দিন কাটায়, তার বাঁচবার অধিকার নেই? সমাজের বুকে বসে এরকম অ-মানবিক চিন্তা কেমন করে আসে, বিশেষতঃ তরুণ চিন্তাশীল সাহিত্যিকের মনে। আরো অনেকে যেন এই কথায় খানিক সায় দিলেন। কবির পক্ষে এ খুবই বেদনাদায়ক। অনেকে বলেন শুনেছি, সভ্যতার পরিচয় শক্তিতে। আমি তো বলব, সভ্যতার পরিচয় মানুষের কল্যাণে, মঙ্গলে

শক্তির ব্যবহারে, পরিণতি ধর্মে। সমাজে নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। নারী কেবলমাত্র গৃহস্থালীই করবে—এতো অবিচার। নারী তো কেবলমাত্র পুরুষের সম্পত্তি নয়, পুরুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নয়। সমাজে প্রতিটি নারীর সামাজিক ও মানবিক পূর্ণ দাবি আছে। আজকাল মেয়েরা চাকরী করছে, পড়াশোনা করছে, আকাশে উড়ছে, ব্যাংকে কাজ করছে। এই সমতা ও পারস্পরিক কর্মের যোগই সভ্যতার লক্ষণ। নারী ও পুরুষের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ—তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, স্বীকার করতে হবে। দাসপ্রথা উঠে যাচ্ছে—ধনী নির্ধনের উপর, সবল দুর্বলের উপর যে অন্যায় অধিকার স্থাপন করেছিল—আজ তা অনেকটা অপসৃত। নারীর কোন অধিকার ছিল না সমাজে, কোন অনুষ্ঠানে, এমন কি শাস্ত্রপাঠেও। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতিক্রম মাত্র ছিলেন। তাঁদেরই নামোচ্চারণ করা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়, কিন্তু সার্বিক জনসমাজের প্রকৃত চেহারা ধরা পড়ে না। আজকাল শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে। ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হবার পথে বাধাই দিয়েছে। তাদের স্বার্থ ছিল আমাদের জনসাধারণের উন্নতির পরিপন্থী। কয়েকটি নাগরিক ব্যক্তিকে সামান্য শিক্ষা দিয়ে এবং চাকরি দিয়ে তারা সমস্ত ভারতীয় গ্রামবাসী এবং জনসাধারণের শিক্ষা ও সামাজিক পরিণতির প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। দোষ অবশ্য অনেকাংশে আমাদেরই—তাদের দাস হয়ে আমাদের দাবিই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। U. S. A. তে I. L. O (International Labour Organisation) কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার দ্বারা পরিচালিত সংঘ। তাঁরা দেশে দেশে গিয়ে নারীর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করেন। খনির নীচে আসন্ন-প্রসবা নারীকে মজুর খাটাবার জন্য নামানো—তাঁরা বন্ধ করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী অসমর্থনীয় বিধান জারি করেছিলেন, কিন্তু নারীর উন্নতির জন্য সাহায্য করেছেন। সেখানে তাঁর প্রাণ করুণায় ব্যথিত হয়েছে; dowry-র নামে যে ব্যবসায় প্রথা চলত, তাকে অনেকাংশে রদ করেছেন।

মস্তিষ্কবিকৃতি একটি অসুখ। পাগলদের প্রতি অত্যাচার, মারধোর বা ব্যঙ্গবিদ্রূপ একান্ত গর্হিত এবং অমানুষিক। অন্যান্য অসুখের মত এই রোগকেও সারাতে হবে। য়ুরোপ এবং এখন আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠান আছে উন্মাদ

এবং বিকলাঙ্গদের চিকিৎসার জন্য। আমাদের দেশে এবং সমগ্র বিশ্বেই এইভাবে একটু একটু করে সভ্যতার অগ্রগতি দেখা দিচ্ছে। এখনও সামগ্রিক বা সর্বাঙ্গীণ সভ্যতার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় নি। কিন্তু এই যে প্রচেষ্টা, এই তো যথার্থ সভ্য মানুষের কথা। সামগ্রিক মানুষের কল্যাণই তো সভ্যতা—কার কত সৈন্য আছে তাই দিয়ে কি সভ্যতা মাপা যায়? মাঙ্গলিকবোধ ও প্রয়োগশক্তির দ্বারাই সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলে।

দেশ ছেড়ে শীঘ্রই সুদূরে যাচ্ছি, তাই ভারতবর্ষের কল্যাণমাধুরীতে মন ভ'রে আছে। সম্প্রতি ইম্ফল, মণিপুরে গিয়ে ওই শ্রীসমন্বিত, শৈলপরিবৃত শিল্পসমাজকে আমাদের দেশের প্রতীকরূপে জেনেছি—নারীদের অধিকার সেখানে গৌরবে প্রকাশিত হয়েছে; কী নির্মল আনন্দময় বীর্য তাদের। সেখান থেকে দু' ঘণ্টার পথ দূরে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের স্মৃতি-প্রতীক ও গ্রন্থালয় দেখে এসেছি। আমার কাছে সেই স্থান তীর্থ-স্বরূপ। এবার দেশে এসে একটি তীর্থ দর্শনও হল।

শান্তিনিকেতনে এবারে ছ-মাসের বেশি থেকেছি। প্রতিদিন মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মহৎ সৃষ্টি এই আশ্রমজীবন শক্তিমান, কারণ তার মূলে প্রীতি ও সমতা বিরাজিত। অন্ধ আবেগ অথবা কেবলমাত্র মানবিকতা সেখানে স্থান পায় নি। শিক্ষার সঙ্গে মিলেছে আত্মশক্তি, মানবসভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা। সেই ভারতবর্ষকে প্রণতি জানিয়ে যাচ্ছি।

অমিয় চক্রবর্তী

মরমিয়া

নাইকো এদের কোন দাবি
এমনি চেয়ে রয়—
আপন মনে না পাই ভাবি
কার বারতা কয়।
হলদে পাথর, ধানের শীষে
একটি দিনের কোন্ ধ্বনি সে —
আদিম মেঘে হঠাৎ জেগে
কিসের পরিচয়।
কাহিনী রোদ চির-অবোধ
কার বারতা কয়।

পথে যেতে উতল হাওয়ায়
সুর দিয়ে যায় চ'লে—
দূর গগনে হঠাৎ মিলায়
তারার নয়ন জলে।
চিনি যেন, চাহনি কার
কোটি জন্ম এসেছে পার,
কনকচাঁপার খুলেছে দ্বার
স্বপ্ন হেমাঞ্চলে—
ধরণী ধন, উজল আঁধার
সুর দিয়ে যায় চ'লে।

উলু দিয়ে বাজায় শঙ্খ
সবুজ তৃণের ঘরে,
মরণমায়ার নেই আতঙ্ক
প্রাণের স্বয়ম্বরে।
সারাজীবন কেবল ছোঁওয়া,
কোমল গভীর রঙিন ধোঁয়া
ধূপের রূপের, গন্ধে নোওয়া
সারঙী অম্বরে—

কারা এরা উৎসব দূত
তানপুরা তান বাজায় নিখুঁৎ
মদির মনের সুরে—
প্রাণের স্বয়ম্বরে।

শান্তিনিকেতন ১৯২১
ম্যাপলজ ১৯৭৮

টীকা: এই কবিতাটির ইতিহাস 'উত্তরস্থরি' বর্তমান সংখ্যায় ২নং চিঠিপত্রে রয়েছে।

আমার কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

বাংলার কবি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে একটি ভয় প্রকাশ করেছিলেন 'আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখা সমালোচন'—মনে হচ্ছে নিজের লেখার দায় দ্রুত শেষ হওয়াই ভালো। যখন আমার কবিতাবলীর জন্যে ভূমিকা লেখার কথা উঠলো, লুপ্ত না হ'য়ে লিপ্ত হবার ভয় সত্যই দুরূহ মনে হ'লো। নিজেকে জড়িয়ে থাকা শিল্পীর পক্ষে শাস্তি; ছড়িয়ে যাওয়া ছাড়িয়ে চলাই তার ধর্ম। মাঠের পথে, জাহাজ নৌকোর ঘাটে, প্লেনের উচ্চ হাওয়ায় ঘুরেছি, বাড়ী ফিরেছি। স্তরে-স্তরে লোকালয়ের দান অন্তরজীবনে পূর্ণ হলো। আজ বেলাশেষে সেই পরিক্রমা একটি মাত্র মৃৎ-রেখায় পরিণত। উপরে আকাশ, পাশে দিগন্ত। মাটি, ধরণী, বসুন্ধরা যে নামেই হোক ভূমিস্পর্শ অভিযানই আমার স্বপ্রকাশ তার অন্য-ভাষা নেই, ভাষ্য নেই। সংসারে একটি মৃন্ময়ী বাসা বেঁধেছিলাম সেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। যাবার সময় কত দূরে জানি না, কিন্তু এই বেলা বলতে চাই ভূমিকা আমার শুধু এই। যা লিখেছি তারই মৃত্তিকায় গড়া প্রদীপ রইলো, আরো দু-সন্ধ্যা তুলসী-তলায় জ্বলুক। যদি আমার ভাগ্যে থাকে।[১]

ম্যাপলজ, ন্যুইয়র্ক
১০ই জুন ১৯৭৭

১ অমিয় চক্রবর্তীর 'কবিতাসংগ্রহ'-এর ভূমিকা।

শ্রীনরেশ গুহ এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। শ্রীসুধাংশু দে মহাশয় প্রকাশ করেছেন। আশার দিয়েছেন দ্বিতীয় খণ্ড শীগ্‌গীরই বেরুবে।

Visva-Bharati
founded by
Rabindranath Tagore

Amiya Chakraborty
Visiting Professor
Santiniketan, 731235
West Bengal, India

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য
কলিকাতা

৩রা এপ্রিল, ১৯৭৮

প্রিয়বরেষু,

আপনার স্নিগ্ধ পত্রখানি আমাকে বিচলিত করেছে। প্লেনে যাবার আগে[১] নিশ্চয়ই আপনাদের জানাব।

Income Tax-এর ব্যাপারে দু একদিন দেরি হয়ে যাচ্ছে—শিউড়ি যাতায়াত করে কার্যোদ্ধার করতে হবে। হৈমন্তী সামান্য একটু বেশি বিশ্রাম পাবেন এটা কল্যাণকর।

ইম্ফল, মণিপুরে ঘুরে এলাম। অপূর্ব দৃশ্য স্থান মাহাত্ম্য শিল্প নৃত্য সম্ভার এবং নারী প্রগতির কেন্দ্র। পুরুষরা যে এক জায়গায় কেবল মাত্র "পৌরুষের" গর্বে সমস্ত সমাজে কর্তাগিরি করতে পারেন নি এটা মস্ত ঘটনা। মনিপুরী-নৃত্যে শুধু নয়, সর্ববিধ কল্যাণ ও কর্মের নিপুণতায় নারীদের প্রতিভা ব্যক্ত হয়েছে।[২] প্রকৃতির বর্ণাঢ্য কোমল সৌন্দর্য, নিত্য বাসন্তী হাওয়ায় প্রস্ফুটিত ফুলফলের প্রাচুর্য ইম্ফলকে এবং সমস্ত উপত্যকা ও শৈলপ্রান্তরকে ঔজ্জ্বল্যে ভরে তুলেছে। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় খুবই ভালো গড়ে উঠছে, তাদেরই নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম ঘণ্টা দেড়েকের পার্বত্যগ্রামী পথ দিয়ে; মৈরাং (Mairang) শহরটিও দেখে এলাম। সেখানে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তর মূর্তি ও গ্রন্থালয় মনকে গভীর নাড়া দিল। পাশেই প্রসিদ্ধ লোক-টাক্ হ্রদ স্বর্গোজ্জ্বল নীল।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী সুগতা সেন[৩]-এর কাছ থেকে "সাক্ষাৎকার" প্রবন্ধটি পেয়ে থাকবেন।...আচার্য প্রবোধ সেনও এটি আপনার "উত্তরসূরী"তে ছাপানো সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল।

আমি তো দূর বিদেশে চলে যাচ্ছি—পরে একদিন আপনাদের পত্রিকার সংখ্যাটি মার্কিনে দেখতে পাবো।

আপনাদের কন্যা দুজনেরই[৪] কী সুন্দর গানের কণ্ঠ, আমরা শুনে কত যে আনন্দিত হয়েছি বলতে পারি না। শীঘ্রই আবার যোগাযোগ হবে।

প্রীতি গ্রহণ করুন।
আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

State University of New York
Dept. of Philosophy
College at New Paltz
New Paltz, New York 12562

২৭ এপ্রিল ১৯৭৮

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য
"উত্তরসূরী", কলিকাতা

প্রিয়বরেষু

একটা কবিতা পাঠাচ্ছি।[৫] পাদটীকা হিসাবে যোগ করে দিতে পারেন—যতটা উন্মার্গ মনে হচ্ছে, কবিতাটি আসলে ততটা নয়। ইচ্ছা করেই জীবন-ভুবনের দূতগুলিকে মিশ্রিত করা হয়েছে, তাঁরা নানা ভাষায় একটি অব্যক্তের কথা বলছে। তারা কে ঠিক জানি না। একটু ক্ষ্যাপামিতে রঙিন ভাষা ব্যবহার করা হল। কিন্তু যে-স্পন্দিত কেন্দ্রে তাদের মিলন তা অধ্যাত্ম এবং দার্শনিক—"সারঙি অম্বরে" তাদের ঐকতান শোনা যায়, "সবুজ তৃণের ঘরেও"।

কয়েকটা সমুদ্র, মরু প্রান্তর পেরিয়ে দূরে এসেছি। এখানে চেহারা পরিবেশ ভাষা অন্যরকম কিন্তু কবিতায় যা বলেছি সবের মধ্য দিয়েই প্রাণ স্বদেশের সন্ধান

পায়। এখন আমার মন বাংলায় ভর্তি, গানে কথায় সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে আছে। কিন্তু ক্রমে প্রাতিবেশিক সমগ্র বোধ সঞ্চারিত হবে। চারিদিকে বনফুল ফুটছে; মানুষজনের মুখে প্রীতির ভাব। তবু দেশের বিরহ বুকে বিদ্ধ হচ্ছে।

একটা মজার কথা ব'লে নিই। সামান্য এই কবিতাটার প্রথম কিছু লাইন ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে লিখেছিলাম, শেষ করলাম এই হ্যাপল্জে, ১৯৭৮-এ! মনে কোথায় একটা ধারাবাহিকতা থাকে, ভেবে আশ্চর্য হই।

পরপৃষ্ঠে কবিতাটা রইল। শেষ করার সময় মনে পড়ছে কলকাতার শেষ প্রহরে আপনি এয়ারপোর্টে এসে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন।[৬] তার পরেই প্লেনে উঠলাম, কিন্তু স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

প্রীতিনমস্কারান্তে,

আপনাদের

অমিয় চক্রবর্তী

১. ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭৮ কবি সস্ত্রীক নিউ ইয়র্ক চলে গেলেন।

২. অমিয় চক্রবর্তীর এহেন মন্তব্য থেকে বুঝতে পারবো রবীন্দ্রনাথও কেন 'চিত্রাঙ্গদা' লেখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

৩. আচার্য শ্রী প্রবোধ সেনের কন্যা। রবীন্দ্র কাব্য ও সঙ্গীত বিষয়ে সম্প্রতি একটি সুন্দর গবেষণা করেছেন।

৪. মধুমাধবী ভট্টাচার্য, ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য, আচার্য শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ছাত্রী।

৫. কবিতাটি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল।

৬. বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'কবিতার ভাবনা (৬)' প্রবন্ধে কবি-সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা রয়েছে।

অমিয় চক্রবর্তীর জীবনীপঞ্জী

জন্ম: ১০ই এপ্রিল ১৯০১, হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের মাতুলালয়ে। আদি নিবাস পদ্মাপারে পাবনায়। পিতা দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী (আসামে গৌরীপুর স্টেটের দেওয়ান); মাতা: অনিন্দিতা দেবী—'খুব ভালো সংস্কৃত জানতেন, বেদ উপনিষদ ষড়দর্শন এবং প্রাচীন কাব্য সাহিত্যে তাঁর অগাধ অধিকার ছিলো।' সেজমামা সোমনাথ মৈত্র, তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের কৃতি-অধ্যাপক।

শিক্ষা: গৌরীপুরে প্রতাপচন্দ্র ইনস্টিটুট্যশন, কলকাতায় হেয়ার স্কুল। হাজারিবাগে আইরিশ মিশনের সেণ্ট কোলাম্বাস কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, বটানিতে বি. এ., ১৯২১। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. ১৯২৬। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (বেলিয়ল কলেজ, ১৯৩৪-৩০) থেকে টমাস হার্ডির কাব্য অবলম্বনে গবেষণার জন্য ডি. ফিল. ১৯৩৭। ভারতবর্ষ, ইরান, আফগানিস্থান ভ্রমণ ক'রে আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবিধ ধর্ম আন্দোলন বিষয় গবেষণার জন্য অক্সফোর্ডের (ব্রেজনোস কলেজ) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ১৯৩৭-৪০।

কর্মজীবন: রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব ১৯২৬-১৯৩৩।

অধ্যাপনা: বার্মিংহামে কোয়েকারদের পরিচালিত উডব্রুক কলেজ (ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য ফেলোশিপ, লেকচারার) ১৯৩০। লাহোরে আমেরিকান মেথোডিস্টদের পরিচালিত ফরমান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ (অনারারি প্রফেসর), ১৯৩৭-৪০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ, ১৯৪০-৪৮। ওয়াশিংটনে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (ধর্মতত্ত্ব ও ইংরাজি সাহিত্যের অতিথি অধ্যাপক), ১৯৪৮-৫০। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় (ভিজিটিং ফেলো এবং ইংরেজী কাব্য বিষয়ে ট্রুমবুল লেকচারার), ১৯৫০। জাতিপরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সরকারি উপদেষ্টা, ১৯৫০-৫১। কানসাস্ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫১-৫৩। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে (তুলনামূলক প্রাচ্যধর্ম ও সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক) ১৯৫৩-১৯৬৫; পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর।

স্মিথ কলেজ (ভারতীয় ও প্রাচ্য ধর্মের অধ্যাপক) ১৯৬৬-৬৭; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম রবীন্দ্র অধ্যাপক, ১৯৭৩। ন্যুইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৭-৭৭। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত অতিথি-অধ্যাপক, ১৯৭৭।

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নোয়াখালি, বিহার এবং অন্যত্র মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত শান্তি পদযাত্রায় যোগদান, ১৯৪৬-৪৮। পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন প্রোটেস্টান্ট চার্চ সম্মেলনে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি, ১৯৫১ গ্রীষ্ম। এই সময় পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ধর্ম এবং প্রাচ্য সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা।

১৯৪৮ সাল থেকে মার্কিন দেশে প্রবাসী।

সম্মান, সম্বর্ধনা : গবেষণার জন্য রকেফেলার ফাউণ্ডেশান গ্রান্ট, ১৯৫০-৫১। আলবার্ট আইনস্টাইন এবং রবার্ট অপেনহাইমারের আমন্ত্রণে, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটুট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ্-এর ফেলো, ১৯৫১। আমেরিকার ফাই-বিটা-কাপ্পা সংস্থার সম্মানিত সদস্য, ১৯৫৯। আলবার্ট শোয়াইটজার পদক, ১৯৬১। বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি, লিট, 'চলো যাই' গ্রন্থের জন্য য়ুনেস্কো পুরস্কার, 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৬৩। ওয়াটুমল্ ফাউণ্ডেশান পুরস্কার, ১৯৬৭। এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা) এবং আমেরিকার এশিয়া সোসাইটি ও পি. ই. এন-এর সদস্য। আমেরিকার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির পরামর্শদাতা সদস্য, ১৯৭০। ফ্রেণ্ড্স য়ুনিভার্সিটি কলেজের ট্রাস্টি, ১৯৭৪। মার্কিন প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে অভ্যর্থনা অভিনন্দন, ১৯৭৫। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে আমন্ত্রণ, ১৯৭৭।

ভ্রমণ : রবীন্দ্রনাথের সহকারীরূপে জর্মানী, ডেনমার্ক, রাশিয়া এবং আমেরিকা ভ্রমণ, ১৯৩০। (পরে আরো দু'বার রাশিয়া ভ্রমণ, ১৯৫৯ সালে পাস্টেরনাকের সঙ্গে কথোপকথন।) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ, ১৯৩২। প্রশান্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ; পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং জাপান ও কোরিয়া সহ পৃথিবীর নানা মহাদেশ বহুবার পরিভ্রমণ। জাপানে Zen-মনীষী সুজুকির সঙ্গে বন্ধুত্ব।

বৌদ্ধ কিয়োতো ও নারা-য় জৈন ধর্মচর্চা। আফ্রিকায় আলবার্ট শোয়াইটজার-এর সঙ্গে তাঁর সেবাকেন্দ্র গাবুন অঞ্চলে লম্বারণে-তে বাস ১৯৫৪।

মার্কিন প্রবাস থেকে পরপর .৯৪৯-৫:-৫৪-৫৬-৬০-৬৩-৬৬'''৭২-৭৬— সালে দেশে এসেছেন।

বিবাহ: ডেনমার্কের কন্যা হিওর্ডিস্ সিগো (Hjordis Siggaard)-কে শান্তিনিকেতনে বিবাহ করেন, ১৯২৭ ডিসেম্বরে। বিবাহে রবীন্দ্রনাথ উদ্‌যোগী ও উপস্থিত ছিলেন। হৈমন্তী নাম তাঁরই দেওয়া। কন্যাসম্প্রদান করেন সি. এফ. এণ্ডরুজ। একটি কন্যা, সেমন্তী (ভট্টাচার্য) জন্ম, মে ১৯৩০, বার্মিংহাম; স্বামী ড. সুব্রত ভট্টাচার্য ও পুত্রকন্যাসহ শিকাগোতে বাস করেন।

শ্রীনরেশ গুহ সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত। দে'জ পাবলিশিং এর সৌজন্যে।

●

কবিতাবলী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কল্যাণ সেনগুপ্ত অরুণ ভট্টাচার্য পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য শান্তিকুমার ঘোষ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মলয়শংকর দাশগুপ্ত জগৎ লাহা নূর নওয়াজ যতীন্দ্র পাল অমিত কুমার মুখোপাধ্যায় সমরেশ দাশগুপ্ত জয়ন্ত সান্যাল সুব্রত সান্যাল কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় নারায়ণ ঘোষ রবীন সুর স্বদেশরঞ্জন দত্ত সুশীল রায় শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

নতুন সাহিত্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত ॥ আমরা যে গান গেয়ে যাই : অরবিন্দ পোদ্দার ॥ নির্মল গুপ্ত -অনূদিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমার খৈয়াম এবং মুণ্ডারি কবিতাগুচ্ছ : কণাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা কবিতা

দীপক ঘোষ কালোবরণ পাড়ই অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় সমীরণ মজুমদার নির্মল হালদার সৈয়দ হাসমত জালাল তপন কুমার গঙ্গোপাধ্যায় শৌনক লাহিড়ী

চিঠিপত্র

অমিয়ভূষণ মজুমমার অমূল্য চক্রবর্তী শোভন সোম

●

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড কলকাতা ৫০

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্ল্যাক আউট (১)

ছুটিয়েছিলেন তিনি অশ্বমেধের ঘোড়া ;
কপালে তাঁর সেদিন ছিল কি রাজটীকা ?
প্রশ্নটা খুব গোড়ার—
কেননা তাঁদের খাতির করে নি বিসূচিকা।

ছুটিয়েছিলেন তিনি অশ্বমেধের ঘোড়া ;
ঘোড়া এখন স্বর্গে, তিনি এখন থোঁড়া।
প্রশ্নটা খুব গোড়ার—

২৩শে আগষ্ট, ১৯৭৮

কল্যাণ সেনগুপ্ত

নিঃশব্দ উত্থান

কোনো অস্থিরতা নেই, শব্দহীন বেড়ে উঠছে গাছ।

এদিকে হাত-পা ছুঁড়ছে রাত্রিদিন ক্ষিপ্তপ্রায় অসংখ্য মানুষ :
কে কাকে ছাড়িয়ে উঠবে,
তুলবে আরো বড়োসড়ো দাম্ভিক দালান—
কার আলো-বাতাসের পথ বন্ধ ক'রে
পাওয়া যাবে একখণ্ড মহার্ঘ আকাশ।
গাছের তেমন নয়। চুপচাপ ঠাণ্ডা মাটি
থেকে রস টেনে
অঘোষিত, নিঃশব্দ উত্থান।

অরুণ ভট্টাচার্য

জেনেছি আবহমান

[অবন ঠাকুর -কে নিবেদিত]

এই শিশু জামরুল গাছটিকে আমি
দীর্ঘকাল থেকে জানি। চিনি এর স্নায়ু,
চিনি প্রতিটি শিকড়, তার অন্তর্গত
গূঢ় রস লতাপাতা, পাতার শিহর
বৃষ্টিতে, বৈশাখে, শীতে অথবা ফাল্গুনে
চিরসুখী আনন্দিত বিভা।

আমি কিন্তু আরো কিছু গোপনীয় কথা
জেনে গেছি। এবং জেনেছি আবহমান
জামরুল গাছটির প্রথম প্রেমিক
নগ্ন বসুন্ধরা। তার দ্বিতীয় প্রেমিক
উড়ন্ত শকুন। যত গোপনীয় কথা
তার বলবে একান্তে। আহা কী সুখ কী
সুখ তার। ভালোবাসবে প্রেমিকেরা শিশু
জামরুল গাছটিকে ঘিরে।

২৫. ৮. ৭৮

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

এখনো

[বীরেনদা-কে]

পুরহীন পাটিশপ্ত পিঠের মতন
কোলাহলে স্বপ্ন নেই। সতত সজাগ
কাজে কাঁদে নানান চাহিদা: মূর্ছা হোক,
কাল মানে কণ্ডূয়ন,—পরস্পর পিঠ চুলকে চলো।
কে খোঁজে অত্যন্ত কথা? বাক্যের বাদশাহী
সমুদ্রে সোনার কেল্লা বানাতেও পারে।

রাণীতন্ত্র থুরি প্রাণবারি-তন্ত্রে বাসা
বাঁধতেই হবে, নইলে প্রস্তুত মশাল!
শহীদ হওয়ার সাধও বাতাসে বিলায়,
বাঘা বাঘা বক্তৃতার রোদে মাঠ গলে
গঙ্গা, তাকে সৈন্ধব লাবণ্য দেবে কোন্ ভগীরথ?

অল্পেই নিবিষ্ট থাকে হারান-রশিদ।
সংসারে দরদামে কিন্তু সুবিধে থাকে না।
কোন পুরস্কার প্রাপ্য প্রযোজক সংস্থার প্রসাদে,
তির্যক বিদ্রূপ ভাবি যখন শুধাও।

প্রেম-অপ্রেমের ফেরে না ভুলেই বলি,
ফিরে যেতে রাজি আছি প্রামাণিক হাঁসের জগতে
চাঁদের স্ফটিক স্রোতে ঈশ্বরীয় অলীক মায়ায়,
নিকষ মেহেদী শোনে উচ্চকিত জোনাকির ডাক,
যখন বটের চোখে স্মৃতির কুয়াশা;
ইটের ভগ্নাংশ ফুঁড়ে শিশু বনস্পতি
নিয়ত শোনাতে পারে বাইশের সহজিয়া স্তব॥

শান্তিকুমার ঘোষ

বুখারেস্ট

অবশেষে সত্যিই বসন্ত এল
দীর্ঘ সরল গাছগুলোতে পাতা জেগেছে
কুঁড়ি ধরেছে দরিদ্র ডালে
মুক্তোর বিন্দু পাতা-পল্লবে
হাওয়ায় দুলছে ভূর্জপত্র
জলের ধারে সমস্ত চুল এলিয়ে দিয়ে
উইলো থামিয়েছে তার কান্না

পিয়াৎসা রোমানায় মানুষ হেঁটে যাচ্ছে স্বাধিকার নিয়ে
দেবতার মতো দেহের গঠন
বীরের ভোগ্য বসুন্ধরা
তাড়া গ'ড়ে দিয়েছে বড়ো সড়ক
তৈরি করেছে সাঁকো
এনে দিয়েছে বিজলী

এই তা হ'লে স্বর্গখণ্ড
হাসির কিরণ ঝলকিয়ে উঠছে চোখে-মুখে
নগর জুড়ে এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা
এখুনি ফেটে পড়বে আগ্নেয় সংগীতে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু নেই কিছু আমার মনে নেই

কিছু নেই কিছু আমার মনে নেই শুধু অবশ রঙের চারদেয়াল,
বাসি ফুটির মতন কখনো-শুকনো মাঝদুপুর আমার দু'হাত ভর্তি ঘষা আঁচড়,
আঙালমাটির মেঝেয় চিড়কালো দিয়ে উঠল মনভাসান সুর—
পলক খোয়ানো সুর, শিক ধরে উবজে গলে আসে বনকরলার লতা—

দিনের পরে দিনের পরে দিনের পরে দিনের পরে দিন—
সবজে ঘষা লেগে লেগে বালিমাটি খসা মুখ—ও কি তোমার ? তুমি কি
ছিলে কেউ ? চিকন বোতামে বুনে গিয়েছিলে আভাময় দুঃখ,
ছুঁচসুতো খুঁজতে বেরিয়ে গেলে এ ঘর ও ঘর···তারপর আর
কিছু নেই কিছু আমার মনে নেই শুধু অবশরঙের চারদেয়াল...

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

মুহূর্তের গণ্ডী ছিঁড়ে

স্বপ্নের মধ্যে এক এক দিন কে যেন
প্রশান্ত প্রহর আনে
জাগরণে সূর্যকরোজ্জল দুরন্ত আশ্বাস,
এক এক দিন মুহূর্তের গণ্ডী ছিঁড়ে
রক্ত নাচে সবুজের স্নেহে
নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ে ঘোরে ফেরে
হাওয়া কানে কানে
বলে যায়, জ্যোৎস্নায় ঘুমাও না
ভিতর বাহির

খুলে রাখো, ছাখো চেয়ে
তোমাদের আগামী সকাল
আরো আলো দেবে বলে বিকশিত
থরো থরো মাটি কাঁপে, কান পাতো
সবুজের বুকে
বাংলার দু'চোখে স্নেহ, হাওয়ায় আশ্বাস,
জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী
আমার স্বদেশ ॥

জগত লাহা

নদীর জলে কাঁপে

দেউড়ি থেকে ফিরে যাবে এমন কথা স্বপ্নে ভাবি নি
তড়িঘড়ি দিন ফুরল সাত-সকালে পিদিম জলে না
একটু না হয় দাঁড়িয়ে থাকতে ছাতিম গাছের ছায়ায়
সাড়া পেলে ডেকে আনতুম দাওয়ায় আসন পেতে
বসতে দিতুম পিঁড়েয় কদম ফুলের বাতাস উড়ে আসত
বাদলা মেঘের ফাঁক গলিয়ে তারা ফুটত চাঁদ উঠত—একাদশীর চাঁদ
নদীর ঘাটে দাঁড় বাইত গান গাইত হয়ত কোনো মাঝি
আমি শোনাতুম বারোমাসি চোখের পাতা উপ্‌চে পড়ল জল
লক্ষ্মীপেঁচার গায়ে উড়ত জোনাক গহন বাঁশের বন কেঁপে উঠত
শিরশিরিয়ে রাতদুপুরে বাঁশীর সুরে ছাপিয়ে উঠত বুক

কখন এসে ফিরে গ্যাছো কী-ই-বা ছিল এমন কাজের তাড়া
দু-চার দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে নারাজ হলে বলেই এখন ছাতিম গাছের ছায়ায়
থমকে গেছে বানভাসি সুখ মুখর বিকেলবেলা ম্রিয়মাণ
অন্ধকার কথা কয় না নদীর জলে কাঁপে দিনের মুখ।

নূর নওয়াজ

নিজেরই কণ্ঠস্বর

সময় খারাপ, জোরে কথা বোলো না।
নইলে শুনবে নিজেরই কণ্ঠস্বর
নিজেকে বিদ্রূপ করছে।

চোখ তুলে তাকিও না। প্রিয়জনের চোখে দেখবে
কেবল অনুকম্পা। আর ঘাসের বনের
কানাকানিতে দেখবে কেবল অবজ্ঞা।

রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও
কেউ কেউ তোমাকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়েছে
তাদের জয়রথের ধুলি মোহাঞ্জন এঁকেছে কুলবধূদের চোখে
রাজপথ তাদের, তুমি
রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও।

আজকের বেতারে রাত নটার খবর শুনো
হয়ত শুনতে পাবে বিশেষ কিছু
আমার তোমার। ইচ্ছা-অনিচ্ছার
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বের সংবাদ।
বসুন্ধরার কোন ক্ষতি নেই তাতে। কিন্তু
আমার তোমার বিশেষ কোন সংবাদ থাকতে পারে।

উত্তরস্মৃতি

অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়

জল, পাথর

১. কালনাগিনী মুখ তুলে খা
প্রভুর চরণে সেবা লাগে
কালনাগিনী

ছিটকে যাই তোর পরশে
মাথা বড়ো কলসের
কালনাগিনী

ভরা আছে দূর্বা দাম
অনন্তের ক্রিয়াপদে।

২. আমি তার দুয়ার গিয়েছি ভুলে
ভুবন-মায়ায়, কঙ্কনে ধরেছে সুখ
মুখ নামিয়ে সুতো কাটো
পারাপারে চোখ।

কড়া নাড়ো, কাশফুলে জমে আছে ধুলো
দশদিক ছিঁড়ে ফেলো দশদিকে ধান
আমি যাব যেদিকে যাবার
ভালো লাগে না কারণিক ব্যবহার
লতার পাতার

আমি যাব যেদিকে যাবার
যেখানে যায় নি কেউ।

সমরেশ দাশগুপ্ত

বত্রিশ পুতুলের খেলা

বত্রিশ পুতুলের খেলা দেখিয়ে
ক পয়সাই বা হাতে আসে লোকটার
তবু সে এমন করে বিড়ি খায়
যেন তার দুঃখ বলে কিছু নেই।

সেই লোক চষে বেড়ায় সারা কয়লাভূমি।
কে একজন বলে, দুর্দিনে এতে চলে নাকি?
পুতুলগুলোও কিছু ঠিকঠাক নেই তোমার।
শুনে লোকটা কেমন কাঠকয়লার ছবি হয়ে যায়।

এখন সেই মানুষ কাজ করে কয়লাখাদে।
শট ফায়ারার। ব্লাস্টিং-এর ভরাট শব্দে
তার কেবলই মনে হয় বত্রিশ পুতুলের সংসার
ভাঙছে। ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে যায়।
তবু সে বাইরে এমন করে বিড়ি টানে
দেখলে মনে হয়
তার মতো সুখী ত্রিভুবনে কেউ নেই।

জয়ন্ত সান্যাল

শুভাকর এক আদর্শ যুবক

একদিন এমন ছিল নাম না বলতেই
যে যার মতো ঠিক ঠিক শব্দ
সাজিয়ে নিয়েছিল। চোখের গভীরে চেনা
রঙ, দৃষ্টিতে সময়ের কাঁটা ঠিক্ ঠিক্
বাজলে চশমা মুছে ঝুলবারান্দায়
শুভাকর এক আদর্শ যুবক।

হাসির শব্দে তিরতির কাঁপে
মাধবীলতা, প্রথম আর তৃতীয় অক্ষর
মিলেমিশে নাম হয়, খানিক পরে
কাচের চুড়ি বাজলে শব্দ তার ভেঙে ভেঙে
নতুন নামের হাতছানি ঠিক পৌঁছে যায়
হাওয়ার নৌকোয়, জলান্তরে

সবকিছু ফিরিয়ে দিয়েছে শুভাকর, যেখানে
যেমন ছিল নাম-চিঠিপত্র-প্রতিশ্রুতি
সব, তবু ঋতুবদলেও শব্দেরা ঠিক আছে।

সুব্রত সান্যাল

তুলনায়

তুলনায় বড় একা, বড় দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকি
বড় ক্লান্তিকর হয় এইসব ঘর, গেরস্থালি
ভুল হয়ে যায় চিনতে তোমায়, প্রকৃত তোমায়।
নদীর জলে কি থাকো শান্ত নীল
অথবা যৌবনবতী ঝরনায়।

বড় ক্লান্তি আসে সুখে
ক্লান্তি চারিদিকে
আধবোঁজা চোখে শুয়ে থাকি আমি সুঠাম কালো নৌকায়।

এবং শৌখিন আসবাব,
ঘর ও গেরস্থালি
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পরে ভাঙা এস্রাজে,
তুলনায় বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত সময় নিয়ে থাকি।

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্তন

খেলতে খেলতে কখন ছোটবেলা চলে যায়
অহৈতুক সম্মেলনী-সুখ
পেছনের সিঁড়ি বেয়ে পালাতে পালাতে
জামা থেকে মুছে ফেলি বালির দাগ
শামুক ঝিনুক
বাগানে সঙ্গীহীন পড়ে থাকে গড়মান্দারণ
দেবীদহের উপকথা
শৈশবের মুঠি থেকে রঙিন নাটাফল
গড়িয়ে পড়ে

কালেশ্বরের পাষাণমন্দিরে
এখনও প্রতীক্ষিত তবু
প্রবুদ্ধ শামুক এক

কোন্ সেই ভোরে
লাল জুতুয়া পায়ে আবার সে আসবে রাঙা
নাটাফল কুড়োতে।

নারায়ণ ঘোষ

ফিরে এলে

কেউ কেউ ফিরে এলে
পুরোন বাড়িতে ঝর্ণা নামে
পুরোন ঘরের পর্দা সরালেই
বুকসেল্‌ফ হোয়াট নট থেকে
ফিস্‌ফাস্‌ শব্দে নড়ে ওঠে
কবিতার বই আসবাব
পুরোন কলম।
কেউ কেউ ফিরে আসে, ফিরে এলে ঝড় ওঠে
ঝড় থামে,
কেউ কেউ ফিরে এসে বন্ধুদের
বাড়ানো আঙুল ছুঁয়ে কাঁধে হাত রাখে
নতুন ঘোড়ার পিঠে উঠে
চিনে নেয় যুদ্ধের সড়ক।

যতীন্দ্রনাথ পাল

কবিতায় শব্দ-মাপ

মুঠোর ভেতর যেন নেচে ওঠে সাপ
ভয়ানক সাপগুলি নাচে—
যারা সব স্বাভাবিকে
ইতস্ততঃ পথে-ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুধু থাকে—
সমস্ত পৃথিবীময় ; তেমন কিছুই নয়

চারদিকে শুধু চলে যায়—
চলে যাচ্ছে : একরকম :
বিশেষ কেউ কি মনে রাখে ?

আপাত-নিরীহ সাপ, তবুও ভীষণ কিন্তু
মুঠো করে যত্নে তুলে তাকে—
যদি বা ইচ্ছার মত, গোপন স্বপ্নের মত
নাচাতেই চাও পাকে পাকে—

সে দাঁড়াবে বিরুদ্ধ-ছোবল
নিজের স্বভাব নিয়ে
কঠিন এবং ভয়ানক
জেদী—
এবং তারই মধ্য থেকে তাকে
নিপুণ কৌশলে—
যদিবা নাচাতে—সমুৎসুক—
সুন্দর শিল্পের ছাঁদে : হয়ত নাচাতে পার :
সমুদ্রের ধ্বনি জেগে থাকে।

রবীন সুর

পাখিটা

কয়েক হাজার মাইল উড়ে এসে ডানার বিশ্রামে
যার পায়ের নিচে কূলরেখার—স্থলভূমির সবুজ
কয়েকটি শস্যের কণা খুঁটে খেয়ে
ডানার ঝটপটানিতে স্নান সেরে পাখিটা যখন ভাবছে
আবার নিরুদ্দেশে উড়তে হবে
হঠাৎ গুলির শব্দ······

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

তরুণ-তরুণ-ভাব-বিপ্লবী কবিকে

তোমাকে যখন দেখি মঞ্চে পদ্য-পাঠে
ঝড় তোলো বাক্যবাণে। চুল ওড়ে।
উত্তেজিত মুখ। মুঠি উচ্চে ঝেঁকে পদ্য পড়ো।
তরুণ-তরুণ-ভাব-বিপ্লবী তুমি।
মঞ্চ থেকে নেমে এসে একগাল হাসি : কেমন পড়েছি, আহা!
দারুণ বিস্ময় লাগে, কি বিপ্লবী, রক্তের কবিতা।
কবিতা পড়তে হলে চুল এলো করে নিতে হয়
হাতের আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ হবে
মুখের গোপন শিরা ফুলিয়ে প্রকট করে নিতে হবে বুঝি?
নাহলে কবিতা বুঝি বিপ্লবী হবে না।
বিপ্লবী মানে কি কিছু চড়া সুরে শব্দ বেঁধে
উচ্চস্বরে হাত পা তুলে পড়া?
নাকি অন্য কিছু আছে, অন্য কিছু যা তুমি নিজেই জানো না।
কবিতা নাটক নাকি? জানা ছিল না তো?

সুশীল রায়

অকাল

শালের প্রকাণ্ড কাণ্ড ছিল শূন্য কিছুকাল আগে—
আজ অকস্মাৎ তার ডালে-ডালে সমারোহ লাগে
সবুজের ; দুই চোখ ভরে যায় অকালের বসন্তবাহারে।
মৃত্তিকার গভীর আঁধারে
কোন্ ভাণ্ডে জমা করা আছে এত রং,
কোন্ সে নিভৃত উৎসে আছে এত ঐশ্বর্য, এবং
রয়েছে প্রাণের প্রচুরতা—
জানি নে সে কথা, ওই শালতরু জানে না সে কথা।
জীবন যখন জীর্ণ হয়, মনে হয় ব্যর্থ সব—
অন্তরালে আশা থাকে, দৈন্যের নেপথ্যে থাকে
উদ্দীপ্ত উৎসব—
ওই শাল দীর্ঘদেহে অবিচল দাঁড়িয়ে সদলে
নীরবে কেবল বুঝি ওই কথা বলে।
বসন্তে বসন্ত আসে, এ প্রথা তো নিতান্ত মামুলি,
অকালেও আসে ওরা—সে কথা ঘোষণা করে এই গাছগুলি।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

পুরস্কার চাই

এ সময় উদ্ভিজ যখন সবুজ এবং সবুজ
তখন প্রতিবারই দু'একটা বুলবুলি ঐখানে এসে বসে আর গান গায়
আমরা সম্পাদকের ঘর থেকে ঘরে বুলবুলির গান পৌঁছে দিই এত স্পর্ধা!
আমরা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঘাড়ে করে
পুরস্কারের দোকানে গিয়ে চা খাই, হেঁ হেঁ করে হাসি
মনে করি বিদ্বজ্জন আমাদের জয়তিলকের চন্দন বেটে রেখেছেন।

বছর ঘুরে যায়
আবার বুলবুলিটা, কিংবা তার ছেলে, ছেলের বউ
অথবা অন্যান্য প্রেমিকা ওখানে জানালার পাশে
সবুজের ভিতরে সবুজে ডুবে যায়
তার তীক্ষ্ণ গলার শব্দে আচ্ছন্ন বাগান পৃথিবী
আমরা আবার তার গান পৌঁছে দিতে যাই কাগজে কাগজে
বুলবুলি আমার কণ্ঠ উচ্চারিত হতে শুনে
ফিক করে হেসে উড়ে যায়।

আমরা যে গান গাই : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : যুবকণ্ঠ প্রকাশনী

মানুষের মুক্তিসংগ্রামে আস্থাশীল একজন কবি একদা একটি কবিতায় লিখেছিলেন, "আমি এই কবিতাকে কোনওদিন কাঁদতে দেব না মানুষের কাঁধ ছুঁয়ে / আমি তাকে শেখাবো পুনর্বার ফুঁসে উঠবার নূতন উপক্রমণিকা।" এই চরণ দুটির মধ্যেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের অংশীদার, বিশিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে আশ্রিত কবিদের মেজাজ ও কবিতার বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটির মেজাজও তাই, যা সব নৈরাশ্য ও অকর্মণ্যতার প্রাচীর ভেঙ্গে জীবনরূপায়নের অঙ্গীকারে ছুটে যেতে চায় অবিচল বিশ্বাসে।

এই সংকলন গ্রন্থটিতে সতেরো জন কবির কুড়িটি তুলনায় দীর্ঘ-কলেবর কবিতা সংকলিত হয়েছে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ সনের মধ্যে রচিত এই কবিতাগুলোতে কালের একটি বিশিষ্ট চেতনা একটি অনন্য মনোভঙ্গি, মানবমনের একটি বিশিষ্ট আকৃতি বিধৃত, মুখবন্ধে সম্পাদক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তা তাঁর স্বল্প-পরিসর বক্তব্যে বিশ্লেষণ করেছেন। সুতরাং, এই কাব্যগ্রন্থের পাঠকের নিকট এর যা আবেদন, তারও একটা বিশেষ চরিত্র আছে, একটা শ্রেণী আছে; আর, একথা মানতেও কোন দ্বিধা নেই যে, প্রত্যাশার সীমাও বিশেষভাবেই চিহ্নিত। কাব্যরসিকের নিকট যা বিচার্য তা হলো, এই সীমার মধ্যে এদের কাব্যিক আবেদন আনুভূতিক সত্যে ও সততায় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে কিনা, নাকি বক্তব্যের ভারে রসাভাসের কারণ ঘটেছে। সে বিচারে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, একটি বিশেষ কালের আর্তনাদকে সংবেদনশীলতায় আত্মস্থ করার জন্য বোধের যে প্রখরতা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন, এই সতেরো জন কবির অধিকাংশই তাঁদের রচনায় সে স্বাক্ষর রেখেছেন। অনুভবশক্তিকে যখন উচ্চ গ্রামে বাঁধা হয়েছে তখনও কবি তাকে চিত্রকল্পময়তার আশ্রয় দিতে ভোলেন নি; ফলে, তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যেমন, অভীক গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি পংক্তি :

"সকালের ঘাসে ধানের গায়ে যে বিন্দু শিশির
সে আমার রাত জাগা কান্না

শোকের আঁধার বন যে দাবানল পুড়িয়ে মারে
সে আমার চোখ-জ্বলা আগুন,
পশুরা গুহায় ঢোকে যে মেঘের ডাকে
সে আমার হুঙ্কার",…ইত্যাদি।

কিন্তু, হুংকারটা তো বড়ো কথা নয়, বড় জোর, সেটা একটা উপায়; এবং হাতিয়ার। এর পরিণতিতে আছে সেই স্বপ্ন-অধ্যাসের জগৎ অথবা সেই আশ্বাস যা বিশ্বমানবিক মুক্তি ও সম্ভবনাময়তার দ্বার উন্মুক্ত করে। সেই স্বপ্ন-অধ্যাসের রঙ-এ উপলব্ধ আগামী দিনের বাস্তবও রাগ-অনুরাগের সম্মোহে কম আকর্ষণীয় নয়। যেমন, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এই মুহূর্তে সে মনেপ্রাণে কামনা করছে
একটা সূর্যকরোজ্জ্বল দিন মাথার ওপর একটা জ্বলন্ত আকাশ
তারপর রাত্রি চোখের সামনে খুলে রাখুক
নক্ষত্রময় বিশাল মহাব্যাপ্ত নীলিমায় মেঘের চলাচল

(বৃষ্টির দিনে কলকাতার এক উপাখ্যান)

অথবা পুনরায় অভীক গঙ্গোপাধ্যায়ের

একটা দুঃস্বপ্নের মতো পুরোনো জীবন ছেড়ে
মানুষ পৌঁছে যাক উৎসবে
ক্ষেতের মুখে ফুটুক হাসি
ধানগাছগুলো দুলে করুক নাচ
তোমার পায়ের ছাপ
আলপনা হয়ে ফুটে উঠুক পৃথিবীর বুকে।

(তুমি উঠে এসো)

কিন্তু সেই নয়নাভিরাম রূপের জগতে উপনীত হওয়ার আগে পার হতে হবে একটি যন্ত্রণাদগ্ধ অস্তিত্ব নাম যার ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষকে গভীর মমতায় সততায় সত্যতায় উপলব্ধি করেছেন সাগর চক্রবর্তী। ফলে, পাঠকের আনুভূতিক নির্দিষ্টতায় ও একতায় মিলিত হয়ে এইসব পংক্তি সহজেই কবি ও পাঠককে একই অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তায় সম্মিলিত করে। যেমন,

আমার বুকের মধ্যে আমার ভারতবর্ষ
আমার ভবিষ্যৎ
বোবা হয়ে আছে
তিরিশ বছরেও তার ভাষা ফোটে নি
আমার ভারতবর্ষ আমার ভবিষ্যৎ
এখন জেলখানার চারদেয়ালে প্রহর গুণছে
(আমরা যে গান গাই)

আর, এই অস্তিত্বেরই ভিন্নতর উপলব্ধি পাই মণিভূষণ ভট্টাচার্যের রচনায় যেখানে সর্বত্রব্যাপ্ত ভণ্ডামির বিরুদ্ধ সংগ্রামের অঙ্গীকার বর্ষীয়ান স্বাধীনতা-সংগ্রামীর অস্থিমজ্জায় তন্ময় হয়ে আছে :

সেই তাম্রশাসিত বেনিয়া অপরাহ্নে তাঁর বিশাল
কুঁজো ছায়াটার সঙ্গে প্রচণ্ড রাগে গরগর করে উঠলো।
আগামী দিনের ভারতবর্ষ,
তিনি দুটো ঝোলা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে
বিনয় বাদল দিনেশ বাগের টাই এবং স্টিয়ারিং-এর
ঘূর্ণায়মান চালাকি আর লাম্পট্য ভেঙ্গে ধীরে ধীরে
শহীদ মিনারের দিকে এগিয়ে গেলেন। (দধীচি)

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার স্বাদে বৈচিত্র্যে অন্যান্য কবিগনও আজকের ভারতবর্ষ নামক অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছেন। এর মধ্যে দেবব্রত ভট্টাচার্য, নবারুণ ভট্টাচার্য, সংবর্ত রায়, সনৎ দাশগুপ্ত, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের কবিতা অধিকতর বিশিষ্টতা অর্জন করেছে বলে আমার মনে হয়েছে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের প্রতিটি কিছুটা অবিচার করেছেন বলে মনে হয়; কারণ, সংকলনে গৃহীত কবিতাটি তাঁর এই পর্যায়ের কাব্যকৃতির প্রতিনিধিত্ব ঠিক করছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান। আর সমীর রায়ের মন্ময়তায় সত্য অভিজ্ঞতা কাব্যশরীর লাভের পথে কিছুটা সংহতি হারিয়ে ফেলে বলে আমার মনে হয়। এ নিয়ে তো আজ আর তর্কের কোনো অবকাশ নেই যে, কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার উপর নির্ভর করে না; কিন্তু গদ্যের সহজ মুক্তির মধ্যেও সে একটা ব্যঞ্জনা অর্জন করে, একটা গভীরতার

স্বাদ আনে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "বচনাতীতের আস্বাদ"। কাব্যের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, লেখার জাদুতে সেই আস্বাদ আপনা থেকেই প্রতিভাত হয়। এই সংকলনেও এর প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। অনুভূতিকে রূপের কাঠামো দান করার সময় এ কথাটা স্মরণে রাখা প্রবীন-নবীন সকল কবির নিকটই কাম্য। নতুবা, অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ না-করতে-পারার আশঙ্কা থাকে।

কিন্তু এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পরেও সংগ্রামী চৈতন্যের কবি ও কবিতাকে স্বাগত আহ্বান জানাতে কোনো দ্বিধা নেই। কারণ, প্রাণের স্পর্শে সমুজ্জ্বল এই সব কবিতা হৃদয়ের বিচরণ ক্ষেত্র যেমন ব্যপ্ত করে, তেমনি তাকে উন্নীতও করে, বৃহৎএর পানে, মহতের পানে। আর অনুভব করা যায়, কিভাবে কবিতার সন্তানসম্ভবা সময় প্রতি মুহূর্তেই তার আহ্বান জানাচ্ছে; সময়ের এই ডাকে সাড়া দিতে পারাই প্রাণশক্তির প্রকাশ। যেমন সব্যসাচী দেবের কবিতায় পাচ্ছি,

রক্তে ভিজে থাকে মাটি
মাটি ছুঁয়ে থাকে মানুষ,
মানুষকে কাছে টানে শব্দ
শব্দের আঙুল ছুঁয়ে বেড়ে উঠে
কবিতার রূপসী শরীর—
ভালবাসা হয়ে ওঠে অস্ত্রময়। (কবির স্বদেশ)

গদ্যমন্ত্রের মত এই চরণগুলো যখন পাঠ করি তখন শব্দার্থ ছাড়াও অন্য এক অনুভব হৃদয়ে বাজতে থাকে, বাজতেই থাকে। এর অনুরণন যেন থামতে চায় না।

অরবিন্দ পোদ্দার

রুবাইয়াৎ-ই-ওমার খৈয়াম। মুণ্ডারি কবিতাগুচ্ছ অনুবাদক : নির্মল গুপ্ত।
পরিবেশক—বাক্‌ সাহিত্য লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো ॥ কলিকাতা ৯

অনুবাদ কবিতা নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা সংশয় মনে জাগে। আলোচনা কি অনুবাদকে ভিত্তি করে হবে, না, কবিতাকে? আসলে অনুবাদ কবিতা—এ যেন বহুশ্রুত 'সোনার পাথর বাটি'। কবিতার অনুবাদ কি সম্ভব! সব কিছুকেই ভাবান্তরিত করা যায়, যথা শব্দ, শব্দবিন্যাস ও ভাব। কিন্তু কবিতাকে—অর্থাৎ বহিরঙ্গের ঐ সব কিছুর আড়ালে যে শুদ্ধতম সৌন্দর্যের অস্তিত্ব, যার নাম কবিতা, সেই কবিতার অনুবাদ কি আদৌ সম্ভব! তবু অনেক সময় অনুবাদকের গাঢ় সহমর্মিতা বোধে অনুবাদ কবিতাও সৃষ্টির স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে অনুবাদক মূল স্রষ্টার কাব্যরূপকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে প্রেরিত পুরুষের মত অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। এই উপমাকে উদাহরণে বিধৃত করে বলা যায়, ওমার খৈয়ামের ক্ষেত্রে ফিট্‌জেরাল্ড সেইরকম এক প্রেরিত পুরুষ। যেন মনে হয় ওমারের রুবাইয়তের অনুবাদ হয়েও তাঁর রুবাইয়াৎ একটি সার্বভৌম শিল্পকর্ম। ফার্সী না জানার জন্য ওমার খৈয়ামের মূল রচনার রস আস্বাদন করার সৌভাগ্য হয় নি। আলোচ্য অনুবাদের পূর্বে কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নজরুল ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদগুলি পড়েছি। নজরুলের অনুবাদ খুবই সুন্দর, কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদও অপূর্ব ঝংকার সমৃদ্ধ। এ কালের পাঠকদের কাছে ভাষা ও রীতিতে আধুনিকতা এনেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। নির্মল গুপ্তের ভাষা ও রীতি যথেষ্ট কালানুগ না হলেও অনুবাদ কর্মে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি মূলানুগ। অবশ্য রসের মূল উৎসটিকে প্রত্যক্ষ ভাবে না জেনে এরকম উক্তি করা দুঃসাহসিক মনে হতে পারে, কিন্তু ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদকে প্রামাণিক বলে ধরে নিলে একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নির্মল বাবু রুবাই-এর ছন্দরীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। একথা অন্যদের সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে অনুবাদ কর্মটির জন্য নির্মল গুপ্ত আমাদের সাধুবাদের অধিকারী।

অনুবাদকের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থটির নাম 'মুণ্ডারি কবিতাগুচ্ছ'। এই কবিতাগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে অনুবাদকের নিজস্ব ভূমিকার কিছু অংশের উদ্ধৃতি তুলে ধরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি :

"আদিম বন্য জাতি মুণ্ডা। ছোটনাগপুরের বনভূমি, পর্বত-সানু ও

সন্নিহিত কিছু অঞ্চল এদের বাসভূমি। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে মুণ্ডারি বা কোলারীয় ভাষা-গোষ্ঠী পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মনখ্‌মের গোষ্ঠীর আত্মীয়। …এদের সংগীত মূলত প্রেমের এবং ঋতু-কেন্দ্রিক। এদের পর্ব ঋতু আবর্ত, উৎসব সংগীত মাধ্যম ও সংগীত নৃত্য-সহযোগী। এদের উৎসবের ঋতু বিভাগে কার্তিক থেকে পৌষ "সোহ্‌রাই" উৎসব সাথে "মাগে সংগীত"। পৌষ-পরব শেষ হয় 'জার্গা' গানে।"…

ভূমিকাটি পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নিছক অশিক্ষিত-পটুত্বের জোরে লেখক মুণ্ডারি লোক সংগীত অনুবাদের কাজে হাত দেন নি, মুণ্ডারি জীবন-চর্চার সঠিক পটভূমিটি চিনে নিয়েই তিনি অনুবাদ কর্মে হাত দিয়েছিলেন।

আধুনিক যুগের সর্বগ্রাসী সভ্যতা মাটির কোল থেকে উঠে-আসা প্রাচীন মানব সম্প্রদায়গুলির বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধ্বংস করতে উদ্যত। নগর-সভ্যতা ধ্বংস করছে অনেক কিছুকেই যেমন নগর ধ্বংস করছে অরণ্যকে। এর ফলে সভ্যতার অগ্রগতি হয়তো হচ্ছে, কিন্তু নষ্ট হচ্ছে মানুষের প্রাণের সম্পদ। এই পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রাচীন উপজাতির সংগীতকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে অনুবাদক একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। অনূদিত কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি মানুষের মন সর্বদেশে ও সর্বকালে কোথায় ঐক্যসূত্রে গাঁথা। এইভাবে বিভিন্ন উপজাতির লোক সংগীত যদি কেউ নির্মল গুপ্তর মত সহজ ও সুন্দর অনুবাদে আমাদের কাছে পৌছে দিতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে তা মহৎ কাজ বলেই কীর্তিত হবে এবং দেশ ও কালের ব্যবধানে মানুষের ঐক্যসূত্রের ভাব-রূপটি আমাদের অনুভবে আরও উজ্জ্বল হবে। উদাহরণ স্বরূপ মুণ্ডারি কবিতার একটি অনুবাদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

হে নিরুপমা হেন না কুপিত নয়ন বাণ
হৃদয় আমার অনুখন জ্বলে অনির্বাণ
দেখেছ ত তুমি পাত্র এবং পাত্রাধার
আমাদের প্রেমও হবে অপরূপ অঙ্গীকার
হে অনুপমা নয়নে হেন না অগ্নিবাণ
বক্ষ আমার নিরবধি জ্বলে অনির্বাণ।

কনাদ গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন কবিতা

[বাংলা আধুনিক কবিতার জগতে সম্প্রতি সবচেয়ে বড় এবং নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে 'উত্তরসূরি'র পৃষ্ঠায়। গ্রাম বাংলার এবং কলকাতার, শহরতলীর অজস্র অসংখ্য 'লিটল ম্যাগাজিন' থেকে অতি সযতনে কবিতা উদ্ধার করে সম্পাদক প্রমাণ করেছেন, কত ভালো কবিতা অনাদরে অবহেলায় এতকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। বাংলা দেশে কবি হবার জন্য আজ আর কোন তরুণকে বাজারে পত্রিকাগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। বাংলা কবিতার ইতিহাস যেদিন সঠিক লেখা হবে তখন এই নিঃশব্দ বিপ্লব একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে থাকবে।

সম্পাদক : উত্তরসূরী]

দীপক ঘোষ

নীলনখ

কিছুটা কর্কশ এই নীলনখ আরম্ভে রয়েছে!
আঁচড়ে কামড়ে দেয়, রক্ত ঝরে ; ফুলের নির্যাস
যথা, গোলাকার চাঁপা, ঝুমকোটা! এ নম্র আশ্রমে
অর্জ্জুনবৃক্ষটি গেছে, সেও তীব্র পুণ্যফলহেতু
দিয়েছিলো লুপ্তোপমা, উপবীত নামের বাঁধন।
তবু ভাঙে পেয়ালাপিরীচ শাদা, উমদো-মামদো
নাচে, ট্যারা-খোঁপা, দাঁত খায় কিচকিচে বালি
জড়িয়ে জড়িয়ে নেয় এ আঙুল, যাকে তুমি চাঁপাকলি বলো!
এ কোনো মন্দির নয়, শুধু ঘৃণা, ফিরেছে নিজের প্রতি
বিদ্ধিবারে আজ

কিছুটা কর্কশ এই নীলনখ, আজ আর পালানো যাবে না।

[আঙিনা ১৪, খাসবাটি, হালিসহর, হাজিনগর, ২৪পরগণা]

কালোবরণ পাড়ুই

কাছে নয়

কাছে নয়, নীলপাখি উড়ে গেছে দূরে
গাছ তাকে ধরতে পারে নি।
সোজা নয় হিমনদী চলে গেছে বেঁকে
বাঁক তাকে রুখতে পারে নি।
ছায়া নয়, নিরাকার ফুটে আছে ফুল
স্মৃতি তাকে কখনো আঁকে নি।

[দুন্দুভি, শরৎ ১৯৭৭, ঝাড়গ্রাম]

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

অভিমান

ঘরের মধ্যে কেউ
আনল ডেকে অসংলগ্ন
সমুদ্দের ঢেউ

তবুও সব বাকি
নিজের কাছে নিজেই নত
রাত্রি নিয়ে থাকি

সঙ্গে নিয়ে যা
প্রতিধ্বনি ফিরল একা
কেউ দিল না রা

এ ভার তবে নামা
বুকের ভিতর সাধের পাখি
নড়ে বসল না।

[রূপায়ন, শরৎ ১৩৮৪, মাঠময়দানকারখানা সাহিত্য পরিষদ, বেনাচিতি, দুর্গাপুর]

সমীরণ মজুমদার

যুদ্ধ

এখন একটা যুদ্ধ হবে —
তোমরা সব প্রস্তুত হও।
রক্তাক্ত বিপ্লব নয়
প্রচলিত অর্থে যুদ্ধ নয়।
এ যুদ্ধ লেখকের স্বাধীনতার যুদ্ধ
তবুও এ যুদ্ধে শহীদ হবে অনেকেই,
লেখনীটা শক্ত করে ধরো, সাহস করে।

এটাই তোমার বাঁচার শেষ অস্ত্র।

[সায়ক, শরৎ ১৯৭৭, দাঁতন, মেদিনীপুর]

নির্মল হালদার

আপেলবাগান

আপেলবাগান দিয়ে নিয়ে যাবো তাঁকে
একটা আপেল যেন তাঁর মুখ ছুঁয়ে যায়, আপেলের স্পর্শে তিনি বুঝবেন
আমরা এখনও স্পর্শ করি নি কোন্ শুকনোপাতার হাহাকার
বরং আপেলের কাছে দাঁড়ালে দুমড়ে মুচড়ে উঠবে একেকটি আপেল এবং
রস হ'য়ে ঝড়ে পড়বে আমাদের মুখে
তাঁর কাছে ফল চেয়ে ক্যাডবেরি পাই নি কখনো।

[হীনযান, বৈশাখ ১৩৮৪, ৩৩ডি, শ্রীমোহন লেন, কলকাতা ২৬]

সৈয়দ হাসমত জালাল

বাতাসে হলুদ পাতা

বাতাসে হলুদপাতা উড়ে যায়, সৈনিক ছাখো শেষরাতে
বৃক্ষশরীর থেকে খসে পড়ে স্মৃতি
বৃক্ষের শোক নেই, সাবলীল বেড়ে ওঠে সূর্যের দিকে
অইখানে সুন্দর, মধ্যাকাশে খেলা করে মেঘ,
সাদাতুলো ঘনীভূত হয়, সমূহ প্রতিশ্রুতি
গাঢ় হয় বৃক্ষের বুক, সবুজ গন্ধে স্ফীত হয়ে ওঠে পুষ্পের ভ্রূণ
ভোরের সৈনিক ছাখে হলুদপাতার বুকে সংক্ষিপ্ত শিশির
গ্রামের বুকের ভোর আসে, নারীর বিভায় ঘুম-ভাঙা সূর্যগোলাপ
চোখের ভিতরে তার অশ্রুর তরলতা, পারদের মতো ভারী,
উটের নিদ্রার মতো জবুথুবু বসে থাকে স্মৃতিসার শব্দ-প্রহরী
দিন যায়, শব্দ অথচ শব্দ নয়, স্থিতধী বৃক্ষের বুকে বিস্মৃত বিলাপ।

[সৌধ, শরৎ ১৯৭৭, হাটখোলা, আলিপুরদুয়ার]

তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পলাশ ও গোলাপ বিষয়ে

দারু শাখা ভরে আছে,
পলাশের লাল
বনস্থলী দগ্ধ হবে
জ্বেল না মশাল।

কে তুমি রাখাল ছেলে
হৃদয় চৌকাঠে
রাধাচূড়া দেহলীন—
যেও না মাঠে।

[অনামিকা, ২৩ সংখ্যা, তাম্রলিবাঁধ, বাঁকুড়া]

শৌনক লাহিড়ী

অন্তর্গত পদ্য

সহস্রমুখ পিদিম হাতে কেউ
আরামবাগে নূরজাহানী ঢেউ

নিরঙ্কুশ তামার-পাশা বুকে
বাদ্য না ঝিনুক তার 'তুকে

চুক্তিরাজার দু'খানি ঢের, বাউটি
পাঙ্কিরাঙা গোসাপ কানা দেউটি

কেরানী তুই নাকছাবিতে কেত্তন
ঝাপটা দাগে মুখর গোড়াপত্তন

সন্তুপুর বলতে ঝামা-থালা
গুপ্তজ্ঞানে শাস্ত্রী রাজবালা

মানুষভর্তি আচ্ছাদিত রেশম
খোঁড়া দিঘির সভ্য ঘিরে কে, যম

অতঃপর, টুঁ মেরে শিং, শঙ্কা
বাপের চোখে এইটুকুনই দমকা।

[বিষপাথর, বর্ষা ১৩৮৪, ৯৩/১ বি, বোসপুকুর রোড, কসবা, কলকাতা ৪২]

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের প্রতি

১.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রিকা এবং পরে আপনার চিঠি পেলাম। উভয়ের জন্যই ধন্যবাদ।

তারাপদবাবু (গঙ্গোপাধ্যায়) আমাদের বাল্যবন্ধু। তিনি বন্ধুকৃত্য করেছেন। সমালোচক যে সব প্রশ্ন তোলেন তার উত্তর দেওয়া গল্পলেখকের উপযুক্ত কাজ নয়। 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড' কতগুলি বিষয়ে পরীক্ষা। ভাষা বিষয়ে তো বটেই প্রথমত ওটা সেকালের ভাষা নয়। স্বকপোলকল্পিতই বলা উচিত। পড়লে, অর্থাৎ ঠিক যতি দিতে জানলে, বাংলা গদ্যকে ঝিয়েদের, রকবাজদের প্রাকৃত-জনের ভাষা থেকে অন্য রকম এক ভাষা বলে মনে হতে পারে। অপর এক মজুমদারের ভাষাও নয়—আশা করি তা লক্ষ্যে এনেছেন। বাংলা গদ্য যে ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকে গলি ঘুঁজি দিয়ে পদাতিক হয়ে সুট্‌সুট্ করে পালাবে, নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না—এটা এক সময়ে আমার কাছে কষ্টের মনে হতে থাকায় ওই ভাষায় লিখে নিজের দুঃখ দূর করেছিলাম। আপনি ইংরেজীতে দক্ষ, আপনার কানে ইংরেজির ক্রিয়াপদের d, ed, t, en, ing-যুক্ত শব্দগুলো অথবা তার অজস্র অজস্র অন্তে আঘাত-যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি যে যে সুশ্রাব্যতার সুখ দেয়, বাংলার এছ, ছি, লাম, লুম প্রভৃতিতে কি তার একআনাও পেয়েছেন? যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি তো আমাদের হারাম হ্যায়। হিন্দি, উর্দু এমনকি ওড়িয়া শুনে দেখবেন মনে হবে পুরুষরা সে ভাষা ব্যবহার করতে পারে। কাঁটা বেছে ফেলে নরম মাছের থসথসে খানিকটা মাংস দিয়ে আর কত লেখা চলবে। না, অন্তে ঘাত দিয়ে নতুন ভাবে ভাষা গড়া যাবে না। একটা কৌশলই আছে তা স্বরধ্বনির টানা পোড়েনে মন্ত্রের নকসা ফুটিয়ে তোলা।

দ্বিতীয় বিষয়: ডানিয়েল ডিফোর পুস্তককে আমি যা মনে করা উচিত তাই মনে করি, অর্থাৎ অনার্সের পরীক্ষায় short notes লেখা বলে বালক বয়সে পড়া যায়। ডিফোর সেই পুস্তক নিয়ে অত হৈহৈ ক্রাইডে আইল্যাণ্ডে-এটা নতুন নয়; অন্যান্য পুস্তকের সামনেও নরবলি দেখা হয়েছে। যথা বাইবেল ডস্ ক্যাপিট্যাল। তা হলে ডিফোর বই এর সামনে নরমাংস ভক্ষণ করলে দোষ কি? তবুও তো ডিফোর বই এর কাল্পনিক আভিজাত্য (আমাদের সব ঐতিহাসিক আভিজাত্য যেমন, আমরা যে নিজেদের আর্য ব্রাহ্মণ বংশীয় মনে করি) সেই কাল্পনিক দ্বীপের অধিবাসীদের শিকড় যোগায়। আসলে আমরা যা কিছু করছি, ইডিওলজি, সবই কোন না কোন বইকে পূজা, এবং পূজাটা নিরামিষ নয়); সে জন্যই শেষ কটা লাইন। ভগবান জানেন এরা শয়তান। ভগবান পারেন এদের মুহূর্তে শেষ করে দিতে। করেন না বোধ হয় এজন্য যে ভগবান ক্রিশ্চিয়ানদের মতো অনুতাপ বিধিকে বড় মনে করেন, সে জন্য শয়তানকেও অনুতপ্ত দেখতে চান।

কিন্তু অন্য ধর্ম বলে, অস্থি মাজ্জা পাশাপাশি থাকবে। কিংবা বলে তুমি কে হে, পাপ করবে? ভগবানকে ভালোবাসার সুযোগ পেয়েছিলে আলাদা হয়ে, সুযোগ নষ্ট করলে তোমার লোকসান। ভগবানেরও কিছু নয়, ধর্মেরও কিছু নয়। তোমাদের পুণ্য টাকা পয়সা-নোট, অ্যাটমবোম কিছুই ভগবানের আইনের মধ্যে পড়ে না। ভগবানের কিছু এসে যায় না তুমি Penal Code এর ধারা ভাঙলেও। শুধু তুমি সমাজ ব্যবস্থার এমন ভাবে conditioned যে ধারাগুলো ভাঙলে ভগবানকে ভালোবাসার মতো মনকে নষ্ট করো। এটা অবশ্য 'ক্রাইডে আইল্যাণ্ডের' বিষয় নয়। বলার কারণ এই যে বইটা লেখকের নিজস্ব ধর্মমতের ভিত্তিতে লেখা নয়। Dramatization of Christian Consumar Society বলেই Christian morality আনা হয়েছিলো।

অন্যদিকে আপনি কেমন আছেন বলুন। এখন অনেক লিখতে চাই, আগে আপনি প্রায়ই চিঠি লিখতেন। আজকাল তেমনি যোগাযোগ থাকছে না; আমার মনে হয় Fortnightly একখানা চিঠি দেয়া-নেয়া করা যায়। আসুন না,

art এবং literature সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধ লেখা হোক। যাকে standard বলা যাবে।

আপনি প্রকৃতি এবং কন্যারা আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

প্রীতিবদ্ধ

কোচবিহার। অমিয়ভূষণ মজুমদার

১. শরৎ ১৩৮৪ 'উত্তরস্থরি'তে শ্রীতারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় অমিয়ভূষণ সম্পর্কে যে রচনাটি লিখেছিলেন সেইটি পাঠে অমিয়ভূষণ মজুমদার উক্ত চিঠিটি দেন। চিঠিটি মূল্যবান মনে করে প্রকাশ করা হ'ল। : সম্পাদক

২.

প্রিয় অরুণবাবু,

উত্তরস্থরি শ্রাবণ-আশ্বিন (১৩৮৪) সংখ্যার অধিকাংশ কবিতা পড়ে প্রেরণা পেয়েছি, শিল্পের স্বাদে তৃপ্তি পেয়েছি। প্রবন্ধ সব ক'টি আমাকে চিন্তার দিকে নিয়ে গেছে। এজ্‌রা পাউণ্ড সম্পর্কে রচনাটি জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। কবির সৃষ্টি কান্টো সম্পর্কে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগাল, এখন আমি কি করি? এত পড়ব কখন?

আপনার কবিতার ভাবনা (৫) আমাকেও ভাবনার গভীরে নিয়ে গেছে। আয়াসহীন স্ব-চ্ছন্দ বাংলা গদ্যে কবিতার তত্ত্ব ও ভাষা সম্পর্কে ওরকম আলোচনা লেখা সম্ভবপর কিনা সন্দেহের বিষয় হয়ে থাকত আপনার প্রবন্ধ (১) পড়া না হলে। vision কি দৈব অনুগ্রহ? আপনার কি মনে হয়? তাছাড়া মনন-শীলতা ও vision কি দুই মেরুর মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন? Blake -এর কবিতায় 'মিস্টিক' ভাবনা নিশ্চয় সম্পদবিশেষ, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' এই উপাদানে

মহিমান্বিত—আপনি ঠিকই বলেছেন—এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। আলোচনার ভিন্ন খাতে আপনাকে টেনে নিতে ইচ্ছা করছে, এবং জানবার ঔৎসুক্য হচ্ছে : জীবনযাত্রার অসংখ্য সমস্যা এই যুগে সৃষ্টি করেছে হতাশা, প্রত্যয়ের ভূমি সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে, এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাস কবিতায় সার্থক প্রকাশ লাভ করবে এটা নিশ্চয় আশা করা যায় ; সে ক্ষেত্রে vision অথবা মনন কোন উপায়টি বেশী কার্যকর হ'তে পারবে ? জানি, কবিতা লেখার ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত সূত্র ধরে মীমাংসা বা শেষ সিদ্ধান্ত সম্ভব নয় ; তবু বিষয়টির ওপর আপনি আলোকপাত করলে খুশী হব, উপকৃত হব। "কবি বা শিল্পী, ভাবুক বা রসিক তো এই vision নিয়েই বেঁচে থাকেন।"—লিখেছেন আপনি। এর মধ্যে যে যুক্তি ও ব্যখ্যার অতীত কোন ব্যাপার আছে তাও আপনার নিজের কবিতার দৃষ্টান্তেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। খুব ভাল লেগেছে পড়ে। ড. অমলেন্দু বসুর 'কাব্যে সারল্য' বিষয়টি ও আপনার আলোচনার মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু এরপরও আমার জিজ্ঞাসা, কাব্যে মননশীলতা কোন্ নিরিখে বিবেচিত হবে ? নিশ্চয় এর উত্তরও আপনার কাছে আছে। অনুগ্রহ করে যদি জানান ত খুশী হব, কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তরস্বরি আবার কবে বার করছেন ? এবারকার প্রচ্ছদটিও চমৎকার, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ দেবেন।

২৫৬ লেক গার্ডেনস্, কলকাতা ৪৫ অমূল্য চক্রবর্তী

১. 'কবিতার ভাবনা' রচনাটির বিষয়ে এবম্বিধ প্রশ্ন তুলেছেন শ্রদ্ধেয় ড. অমলেন্দু বসু এবং ড. ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, ছোট্ট চিঠিতে। এ বিষয়ে তাঁদের মতামত লেখকের কাছে মূল্যবান। সম্পাদক আশা করেন, তাঁরা যদি এ বিষয়ে নিজের নিজের ভাবনার কথা জানান বর্তমান লেখক উপকৃত হবেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ও লেখাটির নতুন শৈলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লেখক সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ বোধ করছে। সম্পাদক : উত্তরস্বরি

৩.

সম্পাদক উত্তরসূরি সমীপে

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি 'কবিতার ভাবনা ৫' এ অমিয় চক্রবর্তীর 'চিরদিন' কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

"দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয় আলো হয়, কথা যাই বলি।

লক্ষ্যনীয়, 'যাই' ক্রিয়াপদ নয়, শব্দটি 'যেই' অর্থে ব্যবহৃত। এরকম ব্যবহার রূপকথার অসম্ভবের রাজত্বেই সম্ভব।"

এ বিষয়ে আমি শ্রদ্ধেয় অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়কে লিখেছিলুম :

"আপনার এই শব্দটি 'যাই' কিংবা 'যা কিছুই' যাহাই অর্থে প্রতিভাত হয়েছে বরাবর, অন্য অর্থে কিংবা ক্রিয়াপদে 'বলিয়া যাই' অর্থে তো নয়ই। শব্দটি 'যেই' বা 'যে-মাত্র" অর্থে যদি আপনি ব্যবহার করতেন তাহলে 'যেই'-ই লিখতেন। এখানে 'যাই' ক্রিয়াপদ কিনা এ নিয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে আমি মনে করি নে, তাতে বাক্য সংলাপ ভ্রষ্ট হয় এবং অর্থচ্যুতি ঘটে। 'যাই' শব্দটি এখানে 'যাই' অর্থাৎ 'যা কিছুই' ছাড়া অন্য অর্থ বহন করে না।

অনুগ্রহপূর্বক সত্বর আমায় নিঃসংশয় করুন, আপনার একজন পাঠক হিসেবে এই বিনীত অনুরোধ।"

জবাবে তিনি জানিয়েছেন :

"আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। 'যাই' শব্দটি 'যাই' অর্থাৎ 'যা কিছুই' ছাড়া অন্য অর্থ বহন করে না, আপনার এই ধারণা নির্ভুল।

আপনি কষ্ট করে আমাকে লিখেছেন এবং আমার মতামত জানতে চেয়েছেন, এত বিশেষ আনন্দিত বোধ করছি। প্রীতি নমস্কারান্তে আপনাদের

অমিয় চক্রবর্তী।"

কলকাতা ১৫.১১.৭৭

শোভন সোম

লেখকের বক্তব্য

কবি নিজের কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু পাঠক, বিশেষ করে, উক্ত কবির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত পাঠক যদি কোন শব্দের ব্যঞ্জনাকে আরো দূরে

নিয়ে যান তবে স্বয়ং কবিরও আপত্তি থাকবার কথা নয়। 'যেই' অর্থে 'যে মুহূর্তে' আমার ধারণা এবং উক্ত শব্দটি কবিতার ভাবনায় যে 'ত্বরিৎ গতি' সঞ্চারিত করে তাতে কবিতার অর্থবহতা আরও বহুদূরে পাঠককে নিয়ে যায়। একজন অনুজ কবি হিসাবে আমি আমার প্রিয় কবির কবিতাটি এভাবেই বুঝেছিলুম। কাব্যের বিচারে 'শুদ্ধ' বা 'ভুল' বলে স্কুলের মানদণ্ড কিছু নেই। এটা রসের জগৎ, এবং অনন্ত এর পরিধি ও ব্যাপ্তি। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে এই কবিতাটি নিয়ে সামনাসামনি আমার আলোচনা হয়েছে শান্তিনিকেতনে 'রাস্কা'য় বসে, গত পৌষমেলার সময়ে। আমার বক্তব্যকে উনি মোটেই অস্বীকার করেন নি।

অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ।
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায়-শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে ॥

—অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা থেকে

Regd. with the
Registrar of Newspapers
for India R. N. 8571/57

বিশ্বকোষ

সাধারণ বাঙালী পাঠকদের সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী জ্ঞানকোষ। মানবিকী এবং বৈজ্ঞানিকী বিদ্যার প্রায় চৌত্রিশটি বিষয়ে প্রসঙ্গ নির্বাচন এবং সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নিজ নিজ বিষয়ে ভূয়োদর্শী প্রবীণ বিদ্বজ্জনেরা।

কুড়ি খণ্ডে এই গ্রন্থমালা সম্পূর্ণ হবে। পাঁচটি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত, ষষ্ঠ খণ্ডের মুদ্রণ চলছে।

২৫ টাকা দিয়ে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হতে হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৫ টাকা।

এই গ্রন্থমালার উপস্বত্ব থেকে গ্রামে গ্রামে বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য শিক্ষাদান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

●

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

১০০

'কবিতার ভাবনা' ৭ম অধ্যায়। বাংলা কবিতার দীর্ঘ যুগ 'উত্তরসূরি'র ১০০টি সংখ্যায় ধরা আছে। উপনিষদ বিষয়ে বিতর্কিত প্রবন্ধ। কবিতার সুনির্বাচিত সংকলন যে কোন সম্পাদকের কাছে ঈর্ষণীয়। সঙ্গীত চিত্রকলা বিষয়ে আলোচনা। 'কবিতা কবিতা' পর্বে গ্রামগঞ্জের তরুণতম কবিদের সংকলিত নতুন কবিতা। শর্বরী রায়চৌধুরীর অসাধারণ শিল্প-কর্মের প্রতিলিপি।

উত্তরসূরি ২৫শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৫
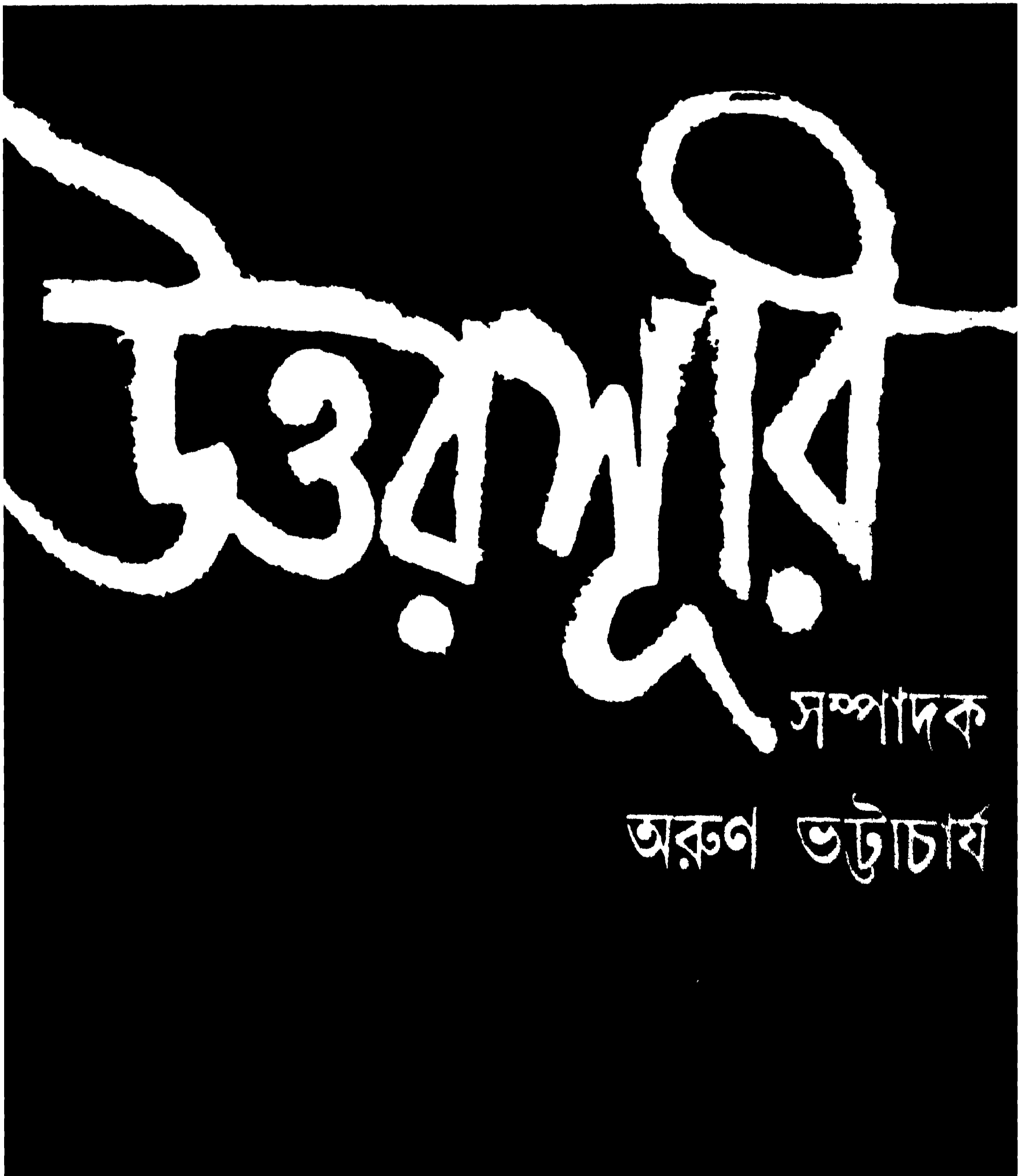
কবিতা পড়ুন

সাগরের ওই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখী ছিল ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে ! : জীবনানন্দ দাশ

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ; : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে
তপ্ত ঢেউএর মত্ত জোয়ার-জ্বরে
কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঞ্জমা : বুদ্ধদেব বসু

এক একটা দিন এমন
সমস্ত তারের ঝলমল যেন এক দীর্ঘ স্থির রেখা
সমস্ত বিক্ষোভ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
সমস্ত অশ্রু জমাট তুষার : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

"আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়গাথা আগমনী কত যে—
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে॥"

—রবীন্দ্রনাথ॥

"সুপ্ চপ্ কাটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট,
কুক বেটা ফার্স্টরেট, যত পার খাও!
মাথামুণ্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জমি নিয়ে,
জনমি বাঙ্গালিকুলে, সুখ করো যাও।
পতিত পাবনি সুরে, পতিতে তরাও॥"

আজ্ঞে না, এটি আমাদের ম্যাক্সিমস্ রেস্টুরেন্টের বিজ্ঞাপন নয়। এটি বঙ্কিম রচিত জাতীয় "অধঃপতন সঙ্গীত"। অধঃপতন সেই বাঙ্গালির—যারা "হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণির কাজ করে, মুন্সেফ চাপরাশি আর ডিপুটী পিয়াদা। অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাশ লয়ে, খোশামুদি জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা।" ...সেই নব্য বাঙ্গালি, যার জাতই নাকি মেরে দিয়েছিল গ্রেট ইস্টার্ন—অর্থাৎ উইলসন সাহেবের হোটেল যে হোটেলের ওপর বর্তেছিল ইয়ং বেঙ্গলের 'স্খলনের' একটা বড় দায়ভাগ।

তাই 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কালীনাথকে নিজের গুণ জাহির করে বলতে হয়, "আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না, শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ীর আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই..." (মাফ করবেন, মাইকেলকে এডিট করা যায় না)।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান রসিক নায়ককে অপেক্ষা করে থাকতে হয় যে ভোজের "সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়াল ডোজ! পরের তহবিল চোকায় উইলসনের বিল থাকি মনের সুখে, হাস্য মুখে কে কার রাখে খোঁজ।"

শরৎচন্দ্র নাটকীয় চরিত্র বিবর্তনের উপমাস্বরূপ লেখেন, "ধরো একজন হয়ত বিশ বচ্ছর আগে উইল-সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্মিক বৈষ্ণব...।"

জাতির সমাজ জীবনে একটি প্রতিষ্ঠানের এই যে "অকাজের" অবদান তা সে প্রতিষ্ঠানের গ্লানি নয়, গৌরব।

দুই শতাব্দীব্যাপী সেই গৌরবের ধারক

কলকাতা-৭০০০৬৯

॥ সংবাদ সংগ্রহে ॥

— পর্য্যবেক্ষক

কলকাতায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সি. এম. ডি. এ-তে অনেক সাংবাদিককেই আসতে হয়েছে। কারণ অনেকগুলি, তবে একটা বড় কারণ হল, কলকাতা সম্বন্ধে দুর্বলতা। কলকাতা নিয়ে খবর করতে সকলেই চান—এবং যখন সি. এম. ডি. এ-র কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হয়, তখন কিন্তু আমরা সমালোচনাটা সেই ভাবেই নিই। অর্থাৎ ভালবাসার শহরে কাজে বিলম্ব হবে কেন? ত্রুটি থাকবে কেন? সমস্যার সমাধান হবে না কেন? লোকের দুর্দশা লাঘব হবে না কেন? এসব প্রশ্ন করবার অধিকার তো প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে—সাংবাদিকদের তো আরও বেশী।

জবাব দিতে গিয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রায় সময়ই দিতে পারি নি। তবে চেষ্টা করেছি।

নতুন সরকার আসার পর সি. এম. ডি. এ এবং কলকাতা সম্বন্ধে আগ্রহটা অনেক বেড়ে গেছে। কারণ এখনকার নীতি অনুযায়ী, জনগণের সঙ্গে এই সংস্থার সম্পর্কটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। যেমন স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করে বস্তী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। যেমন শিয়ালদায় রূপান্তর এবং পুনর্বিন্যাস করার ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। এবং আপনারা জানেন যে, এই সহযোগিতা পাওয়াও যাচ্ছে। 'জনগণ আমাদের আস্থা দিয়েছে' সেদিন একথাটা বললেন, সি. এম. ডি. এ-র ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীপ্রশান্ত শূর মৌলালীর নতুন বাজারে।

এখন যে জিনিসটা দরকার সেটা শুধু সমালোচনা নয় বা শুধু প্রশস্তি নয়। দরকার শহর সচেতনতা বা নাগরিক সচেতনতা। বহুদিন পরে এই প্রথম এই শহরের খেটে-খাওয়া মানুষের কিছু কল্যাণ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সময় যদি আমরা শহরটা সম্বন্ধে আরেকটু সচেতন হই, তাহলে খুব উপকার হয়।

তাই বলছিলাম। সাংবাদিকরা অনেক কিছু খবর জোগাড় করেন। অনেকের মাথায় অনেক 'আইডিয়া' দেন। কলকাতার লোকের মধ্যে এই শহর সচেতনতাটা আনতে পারেন না?
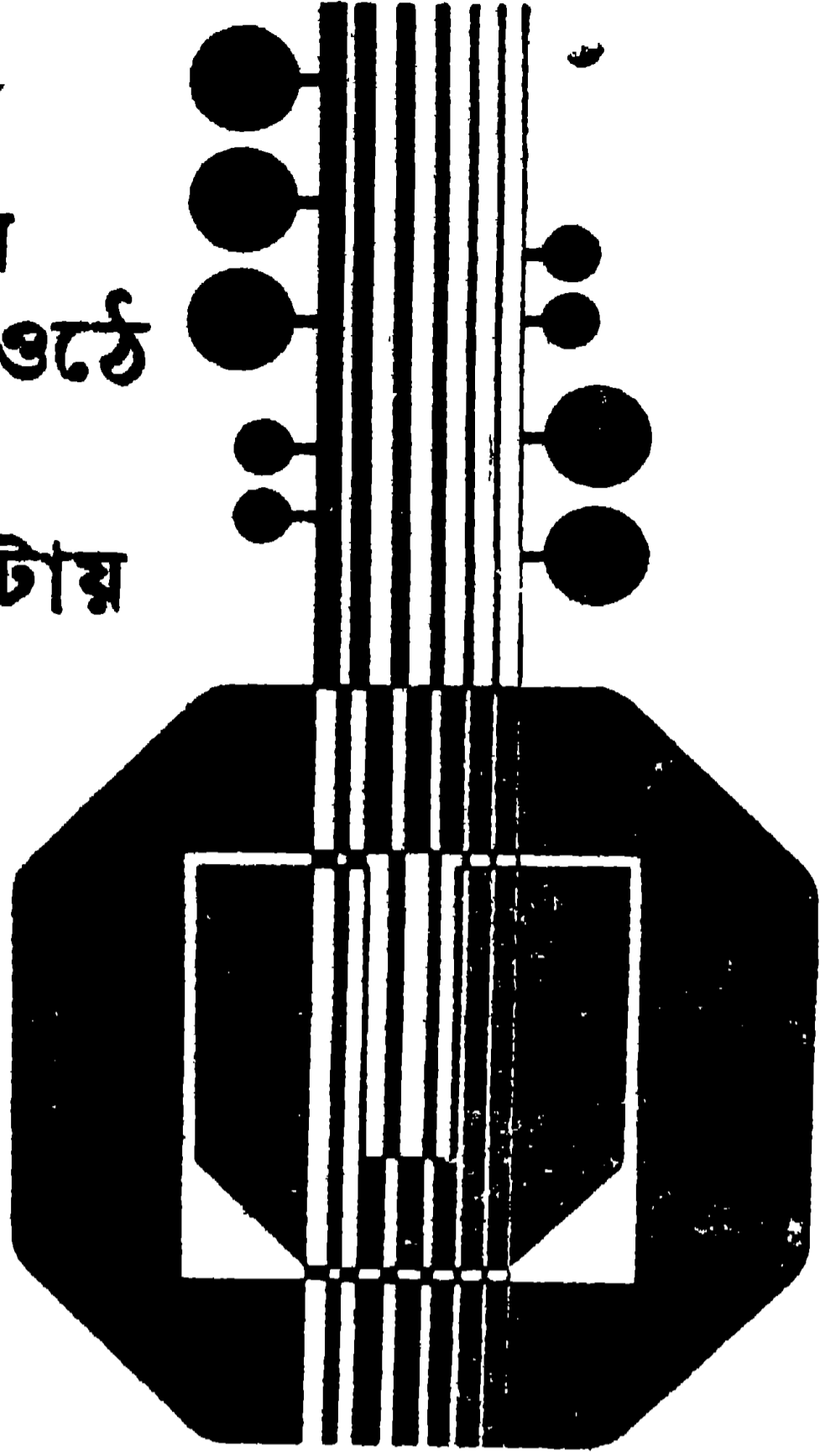
ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী
করে তুলতে সাহায্য করছে
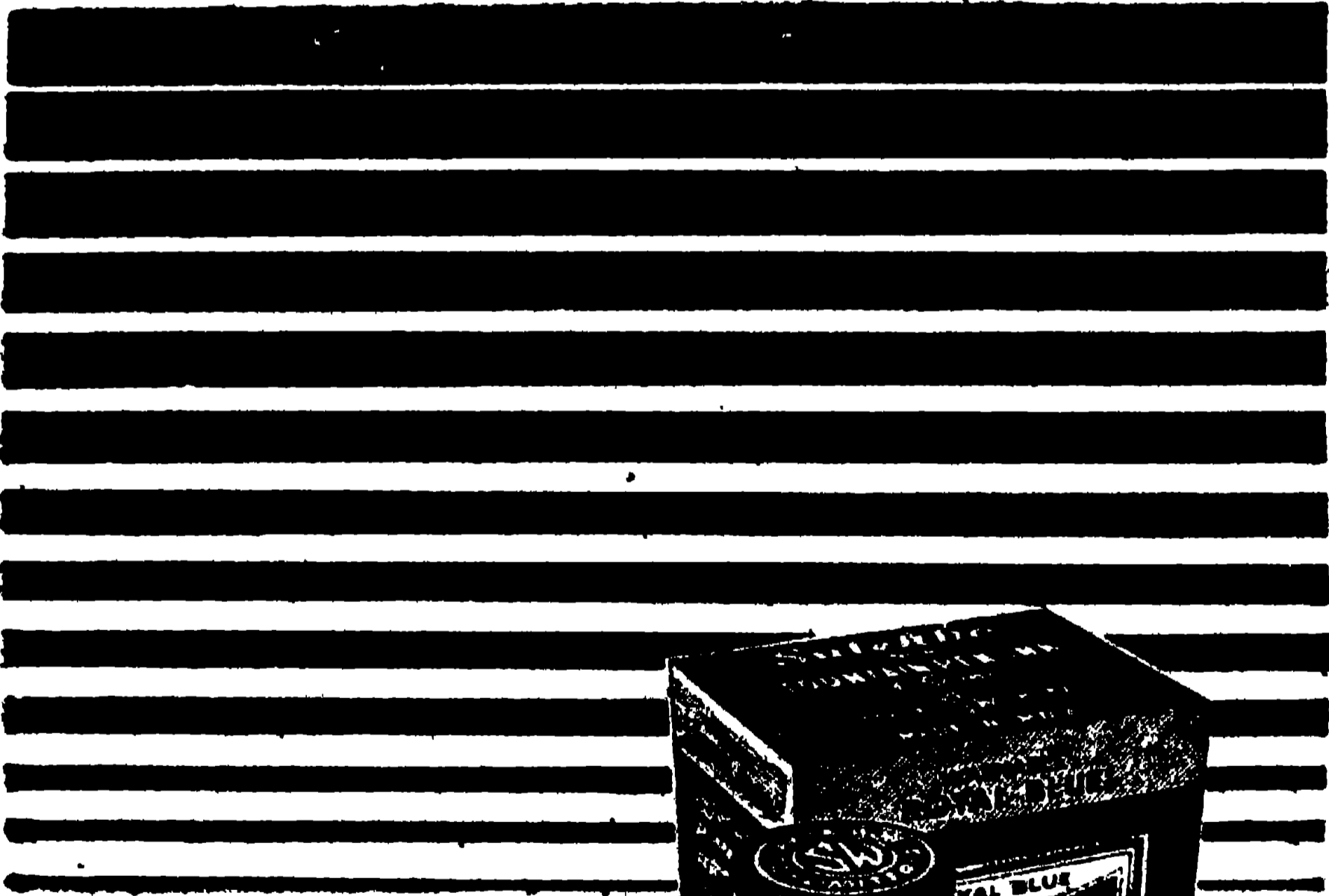
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড • কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

পূজোয় চাই
নতুন জুতো
খোকার জুতো খুকুর জুতো
বাবার জুতো মায়ের জুতো
সবার জন্যে বাটার জুতো
লিলিপুট ১৪
সাইজ ৫-৮
টা. ১৭.৯৫
Bata
ওরিয়েন্টা ৩৫
সাইজ ৩-৭
টা ২১.৯৫
ফিয়োনা ১২
সাইজ ৩-৭
টা. ৩২.৯৫
Bata understands shoes
এক্সক্লুসিভ
মুন সারফেস ২৪
সাইজ ৫-১০
টা. ৬৮.৯৫

INDIAN RAILWAYS

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেনঃ
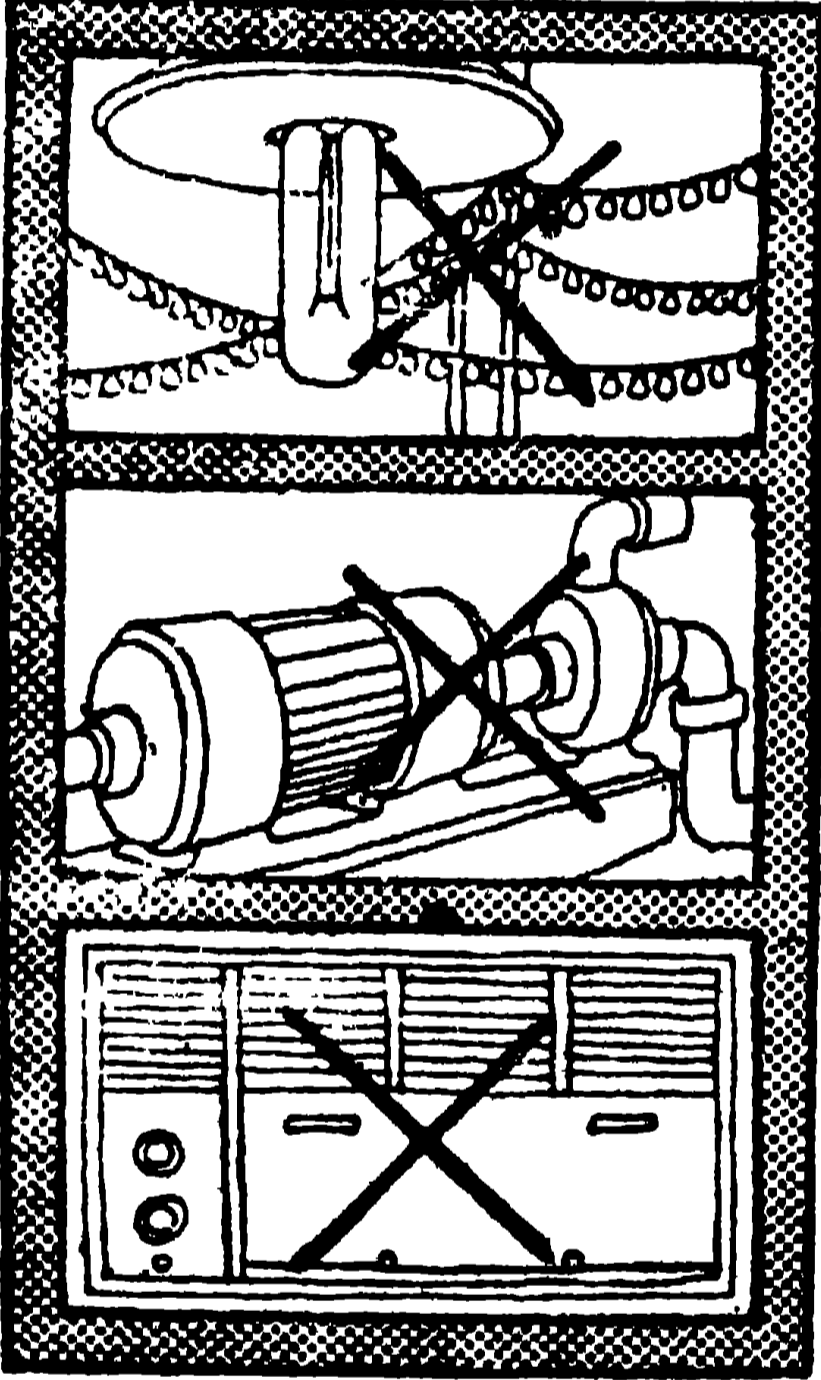
খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন ঃ

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মনে রাখবেন। সকাল ৯–৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

SEB 459A3/77

"...তব রথচক্রে মুখরিত
পথ দিনরাত্রি'
সেই কবে ইতিহাসের উষালোকে আদিম যুগের মানুষ আবিষ্কার করলো চক্রের রহস্য—সুরু হলো সভ্যতার জয়যাত্রা। হাজার-হাজার বছর অতিক্রান্ত হলো। তারপর একদিন জন বয়েড ডানলপ আবিষ্কার করলেন হাওয়া-ভরা নিউম্যাটিক টায়ার—চক্রের জয়যাত্রা এবার দ্রুততর হলো। বিজ্ঞানের এই বিচিত্র আশীর্বাদকে ভারতবর্ষে প্রথম নিয়ে এল ডানলপ। তারপর থেকেই প্রগতি মিছিলের পুরোধায় রয়েছে ডানলপ ইণ্ডিয়া।
ডানলপ
প্রগতির পথিকৃৎ
DPRC-79 BEN
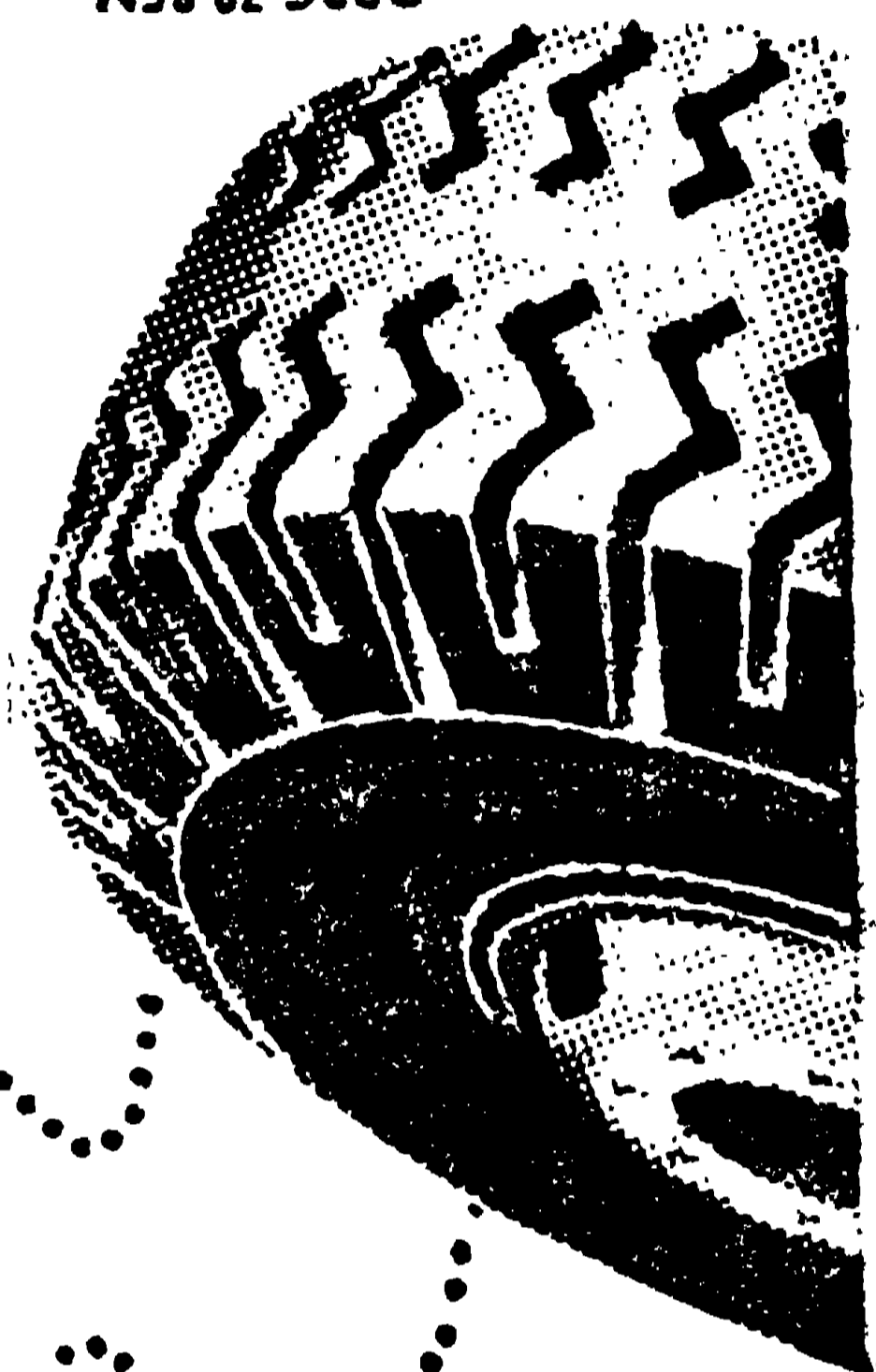
জাতির জীবনে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় নিহিত রয়েছে তার শিল্পকর্মে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রনীতি সাময়িকভাবে একটি জাতিকে পরিচালিত করে একথা সত্য, কিন্তু তার আদর্শ বিধৃত রয়েছে চিরদিন এই সংস্কৃতির রূপান্তরের মধ্য দিয়ে।

ভীমচন্দ্র নাগ বাংলা দেশে মিষ্টান্ন শিল্পের ঐতিহ্যে একটি স্বতন্ত্র নাম। শতবর্ষেরও অধিককাল জাতীয় জীবনে তার অবদান আজ একটি ইতিহাস।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'উত্তরসূরি' তার শততম সংখ্যায় ধরে রেখেছে জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে। আমরা এই পত্রিকাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

●

উত্তরসূরি ॥ নিয়মাবলী

গ্রাহকদের প্রতি : এই সংখ্যার সঙ্গে ২৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শেষ হ'ল, পূর্ণ হল ১০০টি উজ্জ্বল সংখ্যা। অবিলম্বে বাকী গ্রাহক চাঁদা, বার্ষিক টাঃ ১০·০০ করে, উত্তরসূরি দপ্তরে পাঠান। গ্রাহকদের সক্রিয় সাহায্য উত্তরসূরির একান্ত কাম্য।

এজেণ্টদের প্রতি : এক সঙ্গে ৫ কপির অর্ডার দিলে শতকরা ২৫% কমিশন দেওয়া হয়। ২০ কপির বেশী অর্ডার দিলে শতকরা ৩৩⅓% কমিশন দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক : উত্তরসূরি ॥ ৯ বি-৮ কে. সি. ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০

●

প্রবন্ধ ● তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় : উপনিষদ বিতর্ক ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : কবিতার ভাবনা।

কবিতাবলী ● অরুণ ভট্টাচার্য লোকনাথ ভট্টাচার্য আলোক সরকার কল্যাণ সেনগুপ্ত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বটকৃষ্ণ দে কবিতা সিংহ প্রকৃতি ভট্টাচার্য অমিতাভ দাশগুপ্ত যশোদাজীবন ভট্টাচার্য বাসুদেব দেব শংকর দে রবীন সুর তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় তুলসী মুখোপাধ্যায় শিখা সামন্ত উত্তম দাশ সামসুল হক মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মঞ্জুভাষ মিত্র।

সঙ্গীত ● গৌরী ভট্টাচার্য : সীমান্ত-বাংলার ঝুমুর গান। রবি বক্সী : ভাওয়াইয়া সঙ্গীত।

চিত্রকলা ● শোভন সোম : ছবির জগৎ এবং কবিতা ॥ অসীম ঘোষ : শর্বরী রায়চৌধুরী প্রসঙ্গে।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য ● বিজয় দেব । ভিসেন্তি আলেইকজান্দ্রে

কবিতা কবিতা ● নীতীশ বসু সমীর রায় ফারুক নওয়াজ হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় দীনবন্ধু হাজরা পীযূষকান্তি নন্দী গৌতম বাগচী অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাবলী ● বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিত্ত ঘোষ স্বদেশরঞ্জন দত্ত মানস রায়চৌধুরী শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় দিব্যেন্দু পালিত মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত কালীকৃষ্ণ গুহ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় শান্তিকুমার ঘোষ বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক জগদিন্দ্র মণ্ডল শরৎসুনীল নন্দী দেবপ্রসাদ ঘোষ অমূল্যকুমার চক্রবর্তী কবিরুল ইসলাম দেবী রায় প্রদীপ মুন্সী প্রদ্যুম্ন মিত্র মুরারিশংকর ভট্টাচার্য গোকুলেশ্বর ঘোষ পরেশ মণ্ডল বিমান ভট্টাচার্য অমল ভৌমিক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ন্ত সান্যাল শান্তা চক্রবর্তী মধুমাধবী ভট্টাচার্য অনুপ মতিলাল বাসুদেব গুপ্ত অশোক মহান্তী হিমাংশু বাগচী

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য সুমর জোয়ারদার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় উদয়ন ভট্টাচার্য সুব্রত সান্যাল পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গৌতম গুহ শ্যামল বসু নিখিল কুমার নন্দী জীবেন্দ্র সিংহ রায় দাউদ হায়দার কমলেন্দু দাক্ষিত পবিত্র সরকার শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় অজয় দাশগুপ্ত শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় রাম বসু গোপাল ভৌমিক বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

আলোচনা ● প্রিয়তোষ মৈত্রেয় : মার্কিন উপন্যাসের ভাবনা

রূপান্তর ● ল্যাংস্টন হিউজ : পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী ॥ ব্রায়ান প্যাটেন . অর্ণব সেন ॥ এডুয়ার্দো মোরিকে : সুনীথ মজুমদার ॥ এডনা সেন্ট ভিনসেন্ট মিলে : অভিমান সরকার

চিঠিপত্র ● গুস্তাফ ফ্লবেয়ার প্রসঙ্গে : অনুপ মতিলাল

বিয়োগপঞ্জী ● উমা দেবী এবং উদয়ভূষণ ভট্টাচার্য : নির্মল দে

ভাস্কর্য ● শর্বরী রায়চৌধুরী

●

অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ত্রৈমাসিকপত্র। ১বি-৮ কে. সি. ঘোষ রোড, কলকাতা ৫০

অ্যাবস্ট্রাক্ট : ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরী

উপনিষদ কি বেদ-বিরুদ্ধ?

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশ্নটি অর্বাচীন, তবু উপরোক্ত সংকল্পের অভীপ্সা নিয়ে আধুনিক চিন্তায় বিশেষ আকার দেবার চেষ্টা হচ্ছে, যেমন বলা হচ্ছে উপনিষদের চিন্তায় বেদ-বিরুদ্ধ কথা আছে, এমন সব চিন্তাযুক্ত পরিকল্পনা আছে যা সত্যিই বেদ-বিরুদ্ধ! প্রশ্নটি অর্বাচীন হলেও চিন্তা করতে হয়, সত্যিই কী তাই? কিম্বা যাঁরা এভাবে চিন্তা করেন তাঁরা কী এমন কোন উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছেন যার দ্বারা আমরা তাঁদের চিন্তা নঞর্থক বলে ধারণা না করতে পারি? এটা আমরা জানি, ইতিহাসের দ্বার কোন সময়েই বন্ধ বলে ধারণা করা হয় না। ধারণা করা হয় না বলেই 'সভ্যতা' নামক শব্দটি এতখানি সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে থাকতে পেরেছে। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন আনেন বৈদিক যুগাশ্রিত 'যজ্ঞ' নামক শব্দ নিয়ে, তার আশ্রয় ও সমাহার নিয়ে, যদি প্রশ্ন তোলেন কর্ম ও জ্ঞান নামক ধর্মের বৃত্তি নিয়ে, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে তার প্রকৃত তাৎপর্য সেই যুগোপযোগী ধারণার সাথে ধরতে পেরেছি কিনা? কারণ বৈদিক সাহিত্যের ব্যাখ্যাকারীদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি—'যজ্ঞ' নামক শব্দের ভিতর যেমন কর্মও আছে তেমনি যুক্ত আছে জ্ঞান।[১] এবং সত্যস্বরূপ গীতার তাৎপর্যের দিকে যদি তাকানো যায়, দেখা যাবে গীতা-ও সেই তাৎপর্য নিয়ে চিন্তায় সেই ধারণাকে আবার বিশেষ করে সম্বন্ধ করেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি যজ্ঞ নিয়ে ব্যাখ্যা, বৈদিক যুগের স্বররহস্য নিয়ে চারবেদকে স্মরণ, দ্বাদশ উপনিষদের ধর্ম বৈদিক সাহিত্যের রূপগত আকার ও প্রকার নিয়ে, কোথাও স্পষ্ট কোথাও প্রতীকের দ্বারা আশ্রিত। আমরা জানি, শব্দ হলো বৈদিক সাহিত্যের মূল সম্পদ যে-জন্যে তা বাকব্রহ্ম বলে চিহ্নিত করা হোয়েছে। বলা হয়েছে বাক্‌বিভূতির দ্বারাই জাগতিক ও নৈসর্গিক জ্ঞানের সম্বন্ধ হয়। যখন বৃহদারণ্যক বলে: 'বাগ্‌ বি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভুত্বাবতি' (১।৫।৮), তারপর যখন বলে, পৃথিবী হচ্ছে

বাকের শরীর তখন মনে আসে জাগতিক জ্ঞানের প্রজ্ঞান রূপ, যে জন্যে বিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈদিক সাহিত্যে বাক্ হচ্ছে প্রথম ধারণা, এবং ক্রমগতির আকার। পণ্ডিতেরা তাই বলতে চান, এই বীজতত্ত্বের স্বরূপ ধরতে না-জানলে বৃক্ষের কারণ খুঁজতে গিয়ে বিকারগ্রস্থ হ'বার সম্ভাবনা। সেজন্যে বেদসংহিতার জ্ঞান প্রাথমিক প্রয়োজন হিসেবে সত্যস্বরূপ। কিন্তু এই প্রয়োজনকে অস্বীকার করে কেউ যদি বলেন : 'ঔপনিষদিক ধর্ম এলো পুরোহিত সম্প্রদায়ের একান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন যজ্ঞ-প্রধান ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে।'[২] তখন প্রশ্ন এ ধরণের মন্তব্য কী ইতিহাস-আশ্রিত? এবং এই মন্তব্য সম্বন্ধ করবার জন্যে পরবর্তী সংযোজন : 'ভারতীয় আর্যধর্মের অভ্যন্তরে ঔপনিষদিক বিপ্লবই একমাত্র বিপ্লব।' যেহেতু 'বৈদিকধর্ম দেবপরতন্ত্র' সেই হেতু 'উপনিষদের ধর্ম আত্মশক্তি-নির্ভর।' এগুলো যদি তথ্যের দ্বারা বিশ্লেষিত না-হোয়ে যদি অনৈতিহাসিক চিন্তার দ্বারা সম্বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়, কি ঐতিহাসিক প্রবরে গ্রাহ্য? যেমন বৈদিক ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ,এবং বৌদ্ধধর্মের কারণ নিয়ে যে উল্লেখ তা-ও কি ইতিহাস-সিদ্ধ? যেমন উক্তি : পশুঘাতনরীতি বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্মের প্রেরণা জুগিয়েছিল।' জানি না বৌদ্ধধর্মের এই কারণের ইতিহাস কোন্ তথ্যের ওপর প্রোথিত! যদি কেউ জয়দেবের শ্লোক উদ্ধার করে প্রামাণ্য সূত্র আবিষ্কার করতে চান, প্রশ্ন—তা কী ইতিহাস-নির্ভর? আর এ-ও মনে রাখা দরকার—বুদ্ধদেবের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্ব থেকেই পশুবধ নিবারণের ব্যাপারে শতপথ ব্রাহ্মণে গোমাংস ভোজন নিষেধ করা হয়েছিলো। (৩।১।২।২১) ছান্দোগ্যে এই মন্ত্রও পাই : 'পশুন্ন নিন্দেৎ তদব্রতম্।' (২।১৮।২) আর এইসব ঘটনার বহু পরে বুদ্ধদেবের জন্ম। এইসব ঘটনার পর এমন কিছু কী বাড়াবাড়ি হয়েছিলো যা বুদ্ধদেবকে বিচলিত করেছিলো? আরও মনে রাখা দরকার, বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বেই জৈনধর্মের প্রাবল্য ছিলো, সেই ধর্মের বীজও—অহিংসা।

তবুও ঐতিহাসিক কারণে আলোচনার জন্যে, দুটো মন্তব্যই পাশাপাশি রেখে এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মতের দ্বারস্থ হতে চেষ্টা করবো, প্রথম বৌদ্ধধর্মের কারণ; পরে দেখতে চেষ্টা করবো—প্রকৃতই উপনিষদে বেদ-বিরুদ্ধ কোন বক্তব্য ছিল কিনা।

২.

যদিও প্রসঙ্গটা আপাত অবান্তর মনে হতে পারে, তবু অবান্তর নয় এই কারণে, যদি 'বিপ্লবাত্মক' কথাটা উল্লেখ করতে হয়, তবে সেই ধর্মের আচরণ করেছিলেন বৈদিক ধর্মের পর একজন, তিনি হচ্ছেন সাংখ্য ধর্মের কারক, কপিল, বৈদিক ধর্মের ঈশ্বরবাদকে 'ঈশ্বরাসিদ্ধঃ' বলে। এই কপিলের সময়কাল ? মনু কিম্বা রামায়ণে কপিলের উল্লেখ নেই, মহাভারতে আছে—বিশেষত গীতায়। এবং এই জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র ধারণা করে নিয়েছেন, কপিল বোধ হয় মনু, রামায়ণের পরে—মহাভারতের পূর্বে। 'বোধ হয়' শব্দ যদিও সন্দেহাত্মক, সন্দেহাত্মক এইজন্যে কপিলের প্রকৃত ইতিহাস এখনও বের হয় নি, তবে তিনি পূর্বভারতের লোক ছিলেন একথা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। এবং এ-ও স্বীকার করেন আর্যধর্মের সত্য পূর্বভারতে অন্যরকমে প্রবর্তিত হয়েছিলো. কপিলের সাংখ্য সেইরকম ছিলো, ছিলো মহাবীরের নিগ্রন্থও। আরও একটি জিনিষ স্মরণ রাখা দরকার, পূর্ব ভারতের এই মানসিকতা আর আর্যধর্মের একটি সত্য যা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে জানিয়েছিলেন, বিত্তের দ্বারা অমৃতের আশা নেই, তখন ভারত বিত্তকে কি অর্থে ধরেছিলো সেই অর্থ স্পষ্ট হয়। এগুলো হলো বিশেষ উপকরণ, এই উপকরণকে বাইরে রাখলে, ভারতীয় আত্মার মূলতত্ত্ব বোঝা অসম্ভব। বুদ্ধদেবের পূর্বে এইসব ধর্ম শ্রুতি হিসেবে পরিচিত ও প্রচলিত হ'বার পর, যুগধর্ম হিসেবে তা পরবর্তী কালে শাস্ত্রের গঠনতন্ত্রে তার গঠন ভিন্নরূপ নিয়েছে। সেগুলো কিভাবে এসেছে, তার আলোচনা ও পণ্ডিতদের বক্তব্য ধরে সংক্ষিপ্তাকারে দেখাতে চেষ্টা করবো। কারণ বৌদ্ধধর্মেব মূলগত জিজ্ঞাসা ছিলো শ্রুতির গুণগত ধর্ম নিয়ে, শাস্ত্রের আচার আচরণ নিয়ে নয়। পশুবধের আধিক্য একসময়ে হয়েছিলো, সেটা শাস্ত্রীয় বিকার, এই বিকারের দিকে বুদ্ধদেবের লক্ষ থাকলেও আন্তর জিজ্ঞাসার জন্যে তিনি আরও গভীরতর প্রশ্নের সাথে যুক্ত থাকতে চেয়েছেন, সেজন্য বৌদ্ধধর্মে 'নির্বাণ'এর যে-গুণ কিম্বা 'প্রজ্ঞাপারমিতা'-র মধ্যমা প্রতিপৎ' যা শাস্ত্রীয় সেই রকম নয়। শব্দ নিয়ে আলোচনায় না-গিয়ে আমরা ইতিহাস দেখি। পশুবধ কী সত্যিই বৌদ্ধধর্মের কারক ?

আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য উদ্ধার করি : 'যাগযজ্ঞে পশু হিংসা দেখিয়া বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্মের উদ্রেক হয়, এটা ত বুদ্ধের কোন জীবনচরিত বলে না।

ললিতবিস্তার বলে না, মহাবস্তু-অবদান বলে না, বুদ্ধচরিত বলে না। পালিগ্রন্থে বলে না।'[৩] শতপথ ব্রাহ্মণে পশুমাংস ভোজনের ব্যাপারে যে-রকম নিদান ছিলো, মাংস যদি কোমল হয় তবে তা ভোজ্য হতে পারে : বৌদ্ধবিধানেও এই রকম নিদান ছিলো! হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় : 'আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশ্যে মারা না হয়, অন্য কারণে কোন জন্তু মারা হয়, তাহারা সেই মাংস অনায়াসে খাইতে পারে।'[৪] এবং আরও মন্তব্য : 'কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম এত বড়, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান...সেটা তাহার মধ্যমাপ্রতিপৎ অর্থাৎ মাঝামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।[৫] শেষ নিদানটি লক্ষণীয়। ঠিক এই নিদানের ওপর লক্ষ রেখেই অশোক অহিংসা নীতির পক্ষপাতী সত্ত্বেও প্রজাসাধারণের ওপর নিজের ধর্মবিশ্বাসকে চাপিয়ে দেয়া সঙ্গত মনে করেন নি।[৬]

এবং বিবেকানন্দও আমেরিকা থাকাকালীন প্যাসাডোনায় শেকস্‌পীয়র ক্লাবে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বক্তৃতায় যে-সব তথ্যের উল্লেখ করেছিলেন তার ভিতরও এমন কোন সংবাদ নেই, যার দ্বারা আমরা বুদ্ধদেবের পশুবধজনিত ঘটনার জন্যেই তাঁর ধর্মের কারণ ঘটেছিলো বলে ধারণা করে নিতে পারি। বরঞ্চ সেইসব তথ্যের ভিতর এই রকম সংবাদ আছে যা প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলোকে স্বীকার করে। সেগুলো এইরকম, অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার জন্যেই বুদ্ধদেব নতুন একটি দিগন্তের অন্বেষণ চেয়েছিলেন, রক্ষণশীলতার কারণ ঘটেছিলো সেই যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মের সামাজিক গঠন ও জৈনধর্মের অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রপ্রিয়তা! বিবেকানন্দের ভাষায় : 'বুদ্ধদেবের জন্মকালেই প্রাণী হত্যা না করবার এবং জীবে দয়া প্রদর্শন করবার রীতি আদর্শরূপে গৃহীত ছিল।'[৭] এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিয়মতান্ত্রিকতা ও বাড়াবাড়ির বর্ণনা এইভাবে জানানো হয়েছে : 'নিয়মবন্ধন এত কঠোর এবং নির্মম ছিল যে, কোন কাজই নিয়মবহির্ভূত হবার উপায় ছিল না। কিভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে কিভাবে হাত মুখ প্রক্ষালিত হবে, এক কথায় জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি—সবই নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল।......পুরোহিতগণ ধর্ম বা দর্শন শিক্ষা দিতেন না। সমাজে নির্দিষ্ট বিধিবিধান পালিত হচ্ছে কিনা, সেটি দেখা এবং সে-বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের কাজ ছিল। বিবাহ দেওয়া শ্রাদ্ধশান্তিতে...কালক্রমে তাঁদের ভোগবাসনা তীব্রতর হলো...' এই সামাজিক

পরিবেশের ভিতর আর একটি সম্প্রদায়ও ছিলো, তাঁরা হলেন ভিক্ষু সম্প্রদায়, কিন্তু এঁদের সম্মান ও প্রকৃতি বিবেকানন্দের ভাষায় : 'জাগতিক ক্ষেত্রে সাংসারিক জীবনেই নিয়মাদি প্রযুক্ত হবে, কিন্তু যে মুহূর্তে কেউ কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করবে, জাগতিক সুখ বিসর্জন দেবে, তন্মুহূর্তে সে পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। কোন বিধি নিষেধ আর প্রযুক্ত হবে না। এদের নাম সন্ন্যাসী...'[৮] এবং এই গণ্ডীবদ্ধ সামাজিক পরিবেশের ভিতর এই সন্ন্যাসীদের ছিলো 'অদ্ভুত ব্যক্তি-স্বাধীনতা'। এই দুই সামাজিক প্রতিবেশ—একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধি-নিষেধ আর এক দিকে কাঞ্চনত্যাগী ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়; পাশাপাশি আর এক ধর্মের প্রাবল্য, তা ছিলো জৈনধর্মের কৃচ্ছ্রসাধনা। বিবেকানন্দ বলছেন : 'এরাই জগতের কৃচ্ছ্রসাধনার প্রধান শিক্ষক।' অপরিশুদ্ধতা থেকেই যদি দেহের জন্ম হয়, তবে দেহটি কোন উৎকৃষ্ট বস্তু নয়। যদি কেউ একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে—উত্তম, সেটি তার শাস্তিস্বরূপ হয়ে গেল। যদি অকস্মাৎ দেয়ালে মাথা ঠুকে যায়, তবে সেটিও আকস্মিক শাস্তি মাত্র।'[৯] এই সামাজিক ও ধার্মিক পরিবেশের ভিতরেই বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিলো, বিবেকানন্দের ভাষায় তা এক 'মহাসন্ধিক্ষণ'।

ওপরে যে তথ্যগুলোর বর্ণনা সারমর্মাকারে দেওয়া হলো তার ভিতরে কোথাও পাওয়া যায় না, পশুহত্যাই বৌদ্ধধর্মের কারক ছিলো। আরও মনে রাখা দরকার, বুদ্ধদেব নিজের সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রেখে যান নি। সেই ধর্মের ইতিহাস তৈরী হয়েছিলো তাঁর জন্মের প্রায় পাঁচশ' বছর পর। আরও মনে রাখা দরকার তাঁর জন্মের হাজার বছর পূর্ব থেকেই উপনিষদের ধর্ম মানুষের মনে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিলো। এবং মহাবীরের অহিংসা তত্ত্বের বীজ শাখাপ্রশাখায় তখন প্রসারিত, যে তত্ত্বের বীজও উপনিষদে সমাহিত। এসব হলো ইতিহাসের ঘটনা। সেজন্যে যা এখনো অনাবিষ্কৃত তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার জন্যে সতর্ক পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষাবিজ্ঞানী কিভাবে সতর্ক বিশ্লেষণের সম্মুখীন হন তার আর একটি প্রমাণ সামনে রাখছি। ১৯৫৬-এ দিল্লীতে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে এক আলোচনা-চক্রে একজন আধুনিক জার্মান পণ্ডিতের বক্তব্য এইরকম ছিলো : 'Between the comparatively primitive and crude concepts of the archaic mode of thinking and the highly refined means of the

Buddha there lay centuries of philosophical development. It may be that between these two periods other thinkers were active in shaping and perfecting these ideas, and in this respect the Buddhist doctrine that there were Buddhas before Gautama may not be without foundation.'[১০] শেষ বাক্যটি সন্দেহের দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন হলেও এটিই সত্য ঘটনা। আরও স্পষ্ট হয়, যদি এই ধারণা কারও থাকে ভারতীয় সভ্যতা শাস্ত্রীয় আচার ও নিয়মের দিকে না তাকিয়ে সেই নিয়ম কিভাবে এবং কি কারণের জন্যে বিকারগ্রস্থ হয় তার দিকেই দৃষ্টি রেখেছে বেশী, সেজন্যে 'দর্শন' শব্দটা এখানে প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সমভাবে যুক্ত। একটি সাধারণ উদাহরণ দেয়া যাক—বৌদ্ধধর্মের প্রচলিত শব্দগুলো প্রাচীনযুগে অন্যভাবে প্রচলিত ছিলো, যেমন বেবরের ভাষায়: 'These verses repeatedly contain very old Vedic forms. The words Arhat, Shramana, Mahabrahmana and Pratibuddha occur but not in Buddhistic sense'. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর ওপর মন্তব্য রাখছেন: 'ইহার কারণ এই যে বৌদ্ধযুগ অনেক দূরবর্তী।' সেজন্যে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে শব্দের যে-রূপ বিশেষ মূল্য আছে, সেই শব্দের সঠিক তদর্থ না জানলে আবার বিকার কিংবা বিকৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অসৎ বিশ্লেষণও ঘটতে পারে। সেজন্যে 'পুরাণ' 'ইতিহাস' যে ঘটনা ও পরিচিতি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, সেই 'পুরাণ' 'ইতিহাস' আমাদের কাছে বিশেষ সম্পদ—ছান্দোগ্যের ভাষায় তা পঞ্চম বেদ, 'ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্' (৭।১।২)।

৩.

এগুলো বলা হলো এই কারণে, য়ুরোপীয় নিয়মে যদি আমাদের দেশের ইতিহাস ধরতে চাই তাহলে বিকৃতি ঘটবার সম্ভাবনা। স্থান কাল অনুযায়ী অর্থাৎ ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক গঠনানুসারে ইতিহাসের আশ্রয় তৈরী হয়। ভৌগোলিক কারণেই য়ুরোপে যা একান্তভাবে অপরিহার্য ভারতীয় চিন্তামানসে তা গৌণ। নচিকেতার কাহিনীর ভিতর যেভাবে শ্রেয়স্ ও প্রেয়স্-এর স্থান তৈরী হয়েছে, সেটাই ভারতীয় চিন্তামানসের নিদান ভূমাতত্ত্বে যার পরিপূর্ণ

আকার। রামায়ণ ও মহাভারতে ইতিহাসের যে মূলতত্ত্ব ছিলো, য়ুরোপের আধুনিক ইতিহাস তাই কী পেতে চেয়েছিলো ? যখন ভলতেয়ার বলেন : 'Only philosophers should write history' কিংবা 'in all nations, history is disfigured by fable, till at last philosophy comes to enlighten us ..'[১২]—তখন এইসব বক্তব্যের ভিতর কী সেইসব মানসিকতার চিহ্ন পাই ? কারণ এটা আমরা জানি, রামায়ণ লিখতে গিয়ে সেই ঐতিহাসিক চরিত্রকেই ধরা হয়েছিলো যার ভিতর একটি যুগের পূর্ণ লক্ষণ পাই, গীতার আত্মাকে বোঝাবার জন্যে মহাভারতের পূর্ণ যুদ্ধ বৃত্তান্তটাই আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো ; এবং ভলতেয়ারের এই সদ্‌বাক্যও স্মরণীয় : 'Take away the arts and progress of the mind, and you will find nothing'. এটাই ইতিহাসের আদিমতম সূত্র, যে সূত্র থেকে একটি কালের প্রকৃষ্টতম ঘটনাগুলো আমরা ধরতে কিম্বা বুঝতে পারি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটি মন্ত্রের বাক্য : 'স্মৃতি প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানশ্চতুষ্টয়ম্।' (১।২) মাধবাচার্য ঐতিহ্য অর্থে ইতিহাস-পুরাণদি ধরে নিয়েছিলেন। আর যা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ভারতীয় লুপ্ত ইতিহাস আহরণের ব্যাপারে পুরাণাদি গ্রন্থ হচ্ছে একটি মূল্যবান উপাদান। বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ হতে জানা যায় কে কোন্ বেদের সংকলন কার্য করেছেন। আবার এই সংবাদ থেকে এ-ও ধারণা করে নিতে হবে —সংকলন-কর্ম ও সৃষ্টি-কর্ম দু'টো পৃথক বস্তু। কেউ যদি সংকলন-কর্মের সাথে সৃষ্টি-কর্ম এক করে ফেলেন, তাহলে ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে সত্য নির্ধারণ না-হয়ে কেবল বাদ-বিসম্বাদ তৈরী হবে। এ-ও আমাদের স্মরণ রাখা দরকার কালবশে বেদের অনেক শাখাই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেজন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য ছিলো : 'সম্ভবতঃ এখনও কীটদষ্ট পুঁথি-স্তূপের মধ্যে অনাবিষ্কৃত অনেক বেদসংহিতা লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত যত প্রাচীন পুঁথি যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই বিষ্ণুপুরাণোক্ত বেদ সংকলন ও শাখা বিভাগের সত্যতা সমর্থিত হইতেছে।'[১৩] ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুরাণকাহিনী-গুলোর মূল্য কি রকম এইসব ঘটনা তার সাক্ষ্যস্বরূপ। এ-ও সর্ববাদীসম্মত, সংকলন ও মহাভারতের যুদ্ধ প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো : 'According to all scholars the great war and the compilation of the Vedas

belong to the same period.'[১৪] সেই যুক্ত এবং সংকলন-কার্য কখন সংঘটিত হয়েছিলো সেই আলোচনায় না-গিয়ে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, ইতিহাসের গতি-পরিক্রমার জন্যে এই ধরণের চিন্তার সাথে যদি আমরা যুক্ত থাকতে চাই, তবে পুরাণ কাহিনীগুলো যেমন আমাদের প্রয়োজন, তেমনি ভারতীয় আস্তিক মানসকে ধরবার জন্যে রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিক নিয়মে কিভাবে জ্ঞানের প্রসারণ ঘটেছিলো, তা বোঝাও প্রয়োজন। উপনিষদের কিম্বা বৈদিক যুগের বিবর্তনের স্রোত এই দুই গ্রন্থে বিশেষভাবে যুক্ত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম আমরা রামায়ণে যে ভাবে পাই মহাভারতে তা গতায়ুর পর্যায়ে। যেহেতু সেইসব আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বলেই, আমরা উপনিষদ আলোচনার জন্যে আর একটি বিষয় উল্লেখ করে আলোচনার শেষ পর্বে যাব, সেটা হচ্ছে একধরণের য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের একটি সিদ্ধান্ত, উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের ভিতর যে গভীরতা বৈদিক যুগের অন্তেই তা সম্ভব। এইজন্যেই তা বেদান্ত নাম তারা ঠিক বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতদের মত, বেদের ভিতরেই এমন কতগুলো প্রশ্ন ও কূট তর্ক ছিলো যে সেইসব প্রশ্ন, তর্ক বেদ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিলো। উপনিষদগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় তার ভিতর ব্যাখ্যার জন্যে বহু প্রাচীন শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে, এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর ব্যাখ্যার সুবিধার জন্যে নিবিদ্-এর উল্লেখ আনছেন (বৃহদারণ্যক ৩।৯।১) এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন—বেদসংহিতার সংকলন অপেক্ষাও নিবিদ্ প্রাচীনতর। এইসব কারণের জন্যে ডুসেনও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: 'This rich mental life may not improbably have lasted for centuries and the fundamental thoughts of the doctrine of the Atman have attained an ever completer development by means of the reflection of this individual thinkers...the oldest Upanishads preserved to us are to be regarded as the final result of this mental process.'[১৫] এবং আমাদের দেশেও এই মতের সমর্থনে পণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর 'উপনিষদ' গ্রন্থে বিভিন্ন যুক্তি ও তত্ত্বের আলোচনা যুক্ত করেছেন।[১৬]

৪.

সেজন্যে আমাদের এ দেশীয় ইতিহাস আলোচনায় সতর্ক পদক্ষেপ প্রয়োজন। যদি আলোচনা তথ্য-প্রধান না হয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য পায়, তাতে বুদ্ধির সুকুমারত্ব বাড়তে পারে, কিন্তু মীমাংসা দুরূহ। উপনিষদ এই তথ্যপ্রধান আলোচনার উদ্গাতা এবং শংকরাচার্য তার প্রতিষ্ঠাতা। এইরকম প্রতিষ্ঠার ওপর লক্ষ রেখেই শংকরাচার্য তাঁর দ্বাদশ উপনিষদের ভাষ্য রেখেছিলেন এবং তাঁর এই ব্যাখ্যার পর এ-ও স্বীকার্য হোয়ে গিয়েছিলো, কোন্ উপনিষদ কোন্ বেদের ওপর আশ্রিত। এই আশ্রিত সত্যকে কেউ এখন পর্যন্ত অস্বীকার করেন নি, কিম্বা অস্বীকার করবার জন্যে নতুন কোন তথ্য পাওয়া গিয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবু কেউ যদি বলেন: 'ভারতীয় আর্য্যধর্মের অভ্যন্তরে ঔপনিষদ্ বিপ্লবই একমাত্র ধর্ম বিপ্লব'—তখন স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, কি কারণের জন্যে? যেহেতু এই ধর্মবিপ্লব: 'নূতন আর্থিক রীতি ও পরিবর্তিত সামাজিক জীবনের চাহিদার সাথে সম্পর্কশূন্য হর্তে পারে না।'[১৭] এই ধরণের সামাজিক ও আর্থিক বোধের ভিতর যাবার আগে আমাদের আধুনিক ঐতিহাসিকের আর একটি উক্তির সম্মুখীন হতে হয়: '...for all historians...to establish these basic facts rests not on any quality in the facts themselves, but *on a priory* decision of the historian.' সেজন্যে এই ঐতিহাসিকের নিদান ছিলো, 'Study the historian before you begin to study the facts'.[১৮] আমরা সেই সরজমিনে না-গিয়ে আবার মার্কসের একটি নিদান বাক্যের স্মরণ নিই: the dealer in metals sees only the market value, not the beauty and the originality of metal.'[১৯] আমরা এই উক্তির 'originality of metal' ধরেই অগ্ররে হতে চেষ্টা করবো। এবং এই প্রসঙ্গটি-ও উত্থাপন করবো, মার্কস্‌বাদ কী অর্থনীতিকেই সব কিছুর ভিত্তিমূল বলে ধারণা করেছে? না করেছিলেন, স্থান ও কালের প্রবৃত্তি?[২০] এ প্রসঙ্গের ভিতর না-গিয়ে সেই প্রসঙ্গই ধরি, উপনিষদের কালই কি প্রামাণ্য এবং একমাত্র ছিলো? ব্রহ্ম যদি একমাত্র হয়, সেই ব্রহ্মের সাথে কি যুক্ত, এবং কি জাগতিক ও নৈসর্গিক সম্পর্ক বিবর্তিত আধার নিয়ে ব্রহ্মে সংযুক্ত হয়! আমরা মুণ্ডক উপনিষদ নিয়েই অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করবো, কারণ এই

উপনিষদের 'পরা' ও 'অপরা' শব্দদ্বয় গ্রহণ করেই উপনিষদ যে বেদ-বিরোধী এই তর্কে অগ্রসর হ'তে চান, যেমন পণ্ডিতকুল গীতার কয়েকটি শ্লোককে বেদ-বিরোধী বলে ধারণা করেন, তেমনি এই দুই শব্দ। তাদের বোধ হয় জানা আছে, এই উপনিষদ অথর্ববেদের শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত। তবু প্রশ্ন, এই উপনিষদে এমন কোন কি সিদ্ধান্ত টানা হোয়েছে যা 'বেদ-বিরুদ্ধ'? আমরা উত্তরের জন্যে এই উপনিষদের সমাপ্তি মন্ত্রে যে উপদেশ রক্ষিত আছে সেই মন্ত্রটি পুরোপুরি উদ্ধার করি :

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥ (৩।২।১০)

'ঋক্ মন্ত্র দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে যে ক্রিয়াবান, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত একর্ষি নামক অগ্নিতে হোম করেন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিরোব্রতের (মস্তকে অগ্নি-ধারণ-রূপ ব্রতের) অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের নিকট এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে।' (অতুলচন্দ্র সেন কর্তৃক অনুবাদ, উপনিষদ ১ম খণ্ড)

ওপরে উদ্ধৃত শব্দগুলোর ভিতর কী এমন কোন শব্দ আছে যা বেদ-বিরুদ্ধ? যদি না-থেকে থাকে তবে এমন কি সূত্র আছে যার দ্বারা আমরা প্ররোচিত হ'তে পারি যে ঐ উপনিষদ বেদ-বিরুদ্ধ কথা বলেছে? ওপরে উদ্ধৃত শব্দগুলোর ভিতর একটি বিশেষ শব্দ আছে, সেটি হচ্ছে 'বিধিবদ্' যার ওপর সমস্ত বেদের ধর্ম নির্ভর করছে, এবং যে-শব্দের সাথে 'স্বাধ্যায়' নামক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, আর যেই স্বাধ্যায়ের জন্যে এই কথাই বলা হয়েছে—উপসন্ন শিষ্যকে গ্রহণ করার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বুঝতে হবে, প্রকৃতই এই শিক্ষা গ্রহণ করার উপযুক্ত কিনা। কারণ? অনধিকারীর কাছে তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত করলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। সেজন্যে বেদ সাহিত্য বুঝবার জন্যে শব্দজ্ঞান হচ্ছে একটি বিশেষ সম্পদ, যার জন্যে তার নামকরণ দেওয়া হয়েছিলো বাক্‌ব্রহ্ম বলে। এই মুণ্ডক উপনিষদেও শব্দের প্রথম সত্যটি অনুধাবন না-করলে, এই উপনিষদের যে একটি প্রধান সম্পদ—সত্যমেব জয়তে, ধরা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। আমাদের বিভিন্ন উপনিষদ পড়তে গেলে বেদবিদ্যা সম্বন্ধে কি কথা বলতে হয়েছে সেটা

আমাদের কাছে স্পষ্ট করে ধরে রাখতে হবে। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রথমেই জানিয়েছিলেন, যে-ব্যক্তি বেদসমূহকে আত্মা হ'তে ভিন্ন মনে করে বেদজ্ঞান তার ছিন্ন হয় (৪।৫।৭), কিম্বা বীণাযন্ত্র একক হিসেবে সত্য নয়, তার সত্য নির্মিত হয় যদি বীণাবাদক তার সাথে যুক্ত হয়; কোন বস্তুকেই স্বতন্ত্র বলে ধারণা করে নিলে সেই বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞানে ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। এই মুণ্ডক উপনিষদও এই রকম কতগুলো বিশেষ শব্দের দ্বারা আশ্রিত। পরা ও অপরা জ্ঞানের জন্যে একটি বিশেষ উপদেশ প্রদর্শিত হয়েছে, এই 'পরা' ও 'অপরা'র জ্ঞান পেতে হলে দুই বিদ্যার জ্ঞানই গ্রহণ করতে হবে—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে। এই দুই জ্ঞানকেই যেমন বিদ্যা বলে সংযুক্ত করা হয়েছে তেমনি পূর্বমন্ত্রে (১।১।২) 'পরাবরম' বলে দুটি বিশেষ শব্দ সংযুক্ত হয়েছে, যার ব্যুৎপত্তিতে অর্থ ব্রহ্ম ও জগৎ, এবং এই 'অবর' শব্দটি, যার প্রকৃতিগত অর্থ নিকৃষ্ট, এই উপনিষদে কয়েকবার অবিদ্যার জ্ঞানকে স্পষ্ট করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সেজন্যে এই ধরণের শব্দগুলো সামনে না রাখলে, যা এই উপনিষদের মূল শব্দ অক্ষর-ব্রহ্ম, তা বোধগম্য না-ও হতে পারে। কি 'ক্ষর' এবং কি 'অক্ষর', এই দুই শব্দই জাগতিক ও নৈসর্গিক জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়ে জগৎ ও ব্রহ্মের ধারণার সম্পর্ক তৈরী করেছে। যেমন ধরা যাবে না এই উপনিষদের প্রতীকের ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুই পাখীর বর্ণনা, যারা সদাযুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন। কিম্বা ধরা যাবে না এইসব মন্ত্রগুলোর তদর্থ—তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি (২।১।৬) এবং কিভাবে বিবর্তনের ক্রিয়ায় নামরূপ পরিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মে সংযুক্ত হয়—নামরূপাদ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্। (৩।২।৮)। সেজন্যে এই উপনিষদকে ধরতে গেলে প্রশ্ন-উপনিষদ, যা এই উপনিষদের ব্রাহ্মণ ভাগ বলে কিছুকিছু পণ্ডিতের ধারণা, তার সত্যগুলো সামনে রাখা উচিত। কিম্বা কঠোপনিষদের শ্রেয়স্‌ ও প্রেয়সের জ্ঞান, যেই প্রেয়সের জ্ঞান নচিকেতা পিতৃদেবের ভিতর না পেয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো, এ-ও জেনে নিতে হবে। ঐ কঠোপনিষদেই প্রেয়সের জ্ঞানের ওপর কোন জোর না-দিয়ে শ্রেয়সের জ্ঞান নিয়ে কেন এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা তৈরী করেছিলো? কঠোপনিষদের প্রশ্ন এই জন্যেই তোলা হচ্ছে যেহেতু মণ্ডুকের সঙ্গে কঠোপনিষদের মন্ত্রের সাযুজ্য অনেক বেশী। দুই উপনিষদেই যে-সব ব্যক্তি নিজেদের পণ্ডিতমন্য বলে ধারণা করেন

তাঁদের সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, অবিদ্যার দ্বারা চালিত হয়ে তাদের জ্ঞান অন্ধের জ্ঞানের মত প্রবৃদ্ধ হোয়ে কেবল স্বাদু ফলেরই কল্পনা করেন। এই ব্যক্তিবর্গকেই লক্ষ করে বলা হয়েছিলো : 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ন চ প্রমদাৎ' (মণ্ডুক-৩।২।৪) এখানে 'প্রমদাৎ' শব্দটি বিশেষ করে লক্ষণীয়, যার অর্থ অমনোযোগী ; এবং কঠোপনিষদের ধারণায় এইরূপ ব্যক্তিদের, যাঁরা একাগ্রতাহীন এবং অশান্ত, তাঁদের আত্মার ধারণা একমাত্র প্রজ্ঞানের দ্বারা মিলতে পারে—'প্রজ্ঞানেনৈ নমাপ্নুয়াৎ।' (১।২।২৪)

৫.

তবু প্রশ্ন, এই বিভ্রান্তি জন্মে কেন ? উপনিষদের ব্যাখ্যায় তা অবিদ্যা-জনিত জ্ঞানকর্মের জন্যে। 'বৈদিক ধর্ম—দেব পরতন্ত্র।' সত্যি কী ? বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণাপন্ন হই : 'সাংখ্যকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত নহে। ··· বেদে যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা।'[২১]

এবং বেদের দেবতা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ব্যাখ্যা : বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহার নাম নিরুক্ত।...নিরুক্তকার বলেন 'যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা। অর্থাৎ সূক্তের যা 'subject' তাই দেবতা।' এবং বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলছেন : 'দিব্ ধাতু হইতে দেব্। দিব্ দীপনে বা দ্যোতনে। যাহা উজ্জ্বল তাহাই। আকাশ সূর্য অগ্নি চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল, এই জন্য এই সকল আদৌ দেব। এ সকল মহিমাময় বস্তু, এইজন্য ইহাদের প্রশংসায় স্তোত্র, অর্থাৎ সূক্ত রচিত হইয়াছিল।'[২২]

উপরোক্ত বর্ণিত ধারণার ভিতর আমরা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারি বৈদিক সাহিত্যে 'দেব' কি অর্থে ব্যবহৃত হতো এবং নৈসর্গিক বস্তুগুলো কি কারণের জন্যে 'দেব' বলে গ্রাহ্য হতো। এই প্রাথমিক জ্ঞান বৈদিক ধর্ম নিয়ে না-থাকলে কি ধরণের বিভ্রাট ঘটতে পারে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উপরোক্ত মন্তব্য, 'বৈদিক ধর্ম-দেব পরতন্ত্র।' বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত : 'চেতনাবিহীন পদার্থ হিন্দুরের কাছে অস্পৃশ্য পদার্থ। আজকাল যাহাকে জড়পদার্থ বলা হয়,

যেমন অগ্নি বায়ু নদী পর্ব্বত ইত্যাদি, ইহারা হিন্দুদের কাছে চৈতন্যময় চেতনাযুক্ত পদার্থ।'[২৩]

'বৈদিক ধর্ম হিন্দুদের মূল, কিন্তু মূল বৃক্ষ নহে; বৃক্ষ পৃথক বস্তু। বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফলে শোভিত, মূলে তাহা নাই। কিন্তু মূলের গুণাগুণ না বুঝিলে আমরা বৃক্ষটিকেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।'[২৪]

পূর্বের এইসব ব্যাখ্যার পরও কেউ যদি ভিন্নতর মত পোষণ করতে চান, তবে প্রশ্ন স্বভাবতই আসে—বৈদিক সাহিত্য যে-ভাবে বিবর্তনের ধারা নিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলো, সেই ধারা সম্বন্ধে লেখক সচেতন কিনা! বঙ্কিমচন্দ্রের আরও মন্তব্য ছিল, বেদের 'অদিতি'-তত্ত্ব ধরা না-গেলে আকাশের অনন্ত প্রকৃতির কথা বোঝা যাবে না: 'জগৎ একই নিয়মের অধীন। একই নিয়ন্তার অধীন। "মহাদ্দেবানামসুরত্বমেকম্" (ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৫৪)। এইরূপে বেদে একেশ্বরবাদ উপস্থিত হইল। অতএব বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম, তেত্রিশ দেবতারও উপাসনা নহে, তিন দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসনা আছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। সুতরাং উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং অসংস্কৃতাবস্থা। সূক্ষ্মত উহা ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি এবং বিকাশের উপাসনা—ঈশ্বরেরই উপাসনা। ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের পরিণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা।'[২৫]

বৈদিক মূল ধর্মের সাথে উপনিষদ ধর্মের পার্থক্য ? ঈশ্বর জানেন। ঋগ্বেদ সংহিতার ৯০ সূক্তকে পুরুষসূক্ত বলা হয়, সেই সূক্তকে ব্রহ্ম-ব্যাখ্যার আদি সূত্র বলে ধারণা করা হয়। সেই সূক্তের বিখ্যাত মন্ত্র: 'সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ' মন্ত্রটি বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: 'ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহু ভাবে প্রকাশিত হন...ইহাই দশ সহস্র বাহু এবং অনন্ত; ইনিই ব্রহ্ম কারণরহিত কার্য্যরহিত অন্তররহিত বাহ্যরহিত; এবং এই আত্মাই ব্রহ্ম।' (২।৫।১৯)

যাঁরা মার্কস্‌বাদের ইতিহাস জানেন তাঁরা সেইজন্যে মার্কস্‌বাদের চিন্তা নিয়ে বলেন, ইতিহাসের ব্যবস্থা বড় নিষ্ঠুর: 'History is about the most cruel of all goddesses and she leads her triumphal heaps of corpses not only in war but also in peaceful economic development..,

And we men and women are unfortunately so stupid that we never pluck up courage for real progress unless urged to it by sufferings that seem almost out of proportion.'[২৬] এই ধরণের চিন্ত-বিমুখতার জন্যে এঙ্গেলস্ আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : 'What these gentlemen all lack is dialectic. They never see anything but here cause and there effect. That this is a hallow abstraction, that such metaphysical polar opposites only exist in the real world during crises, while the vast process proceeds in the form of interaction…everything is relative and nothing is absolute—this they never begin to see. Hegel never existed for them.'[২৭] শেষ বাক্যটি কী শ্রুতিসুখকর ? কারণ হেগেলের এই বাক্যও আমরা জেনেছি : 'The only unchanging thing is change itself.' আমরা এর সঙ্গে মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য যা বলেছিলেন সেটুকু শুধু যোগ করবো, যার দ্বারা এই সব কিছুকেই জানা সেই বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানবে ? 'যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ।' (২।৪।১৪)

পাদটীকা.

১. 'এই যুগে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর সাধক ছিলেন। এক শ্রেণীর সাধক কর্মবাদী ছিলেন, আর এক শ্রেণীর সাধক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিতেন।… কর্মবাদী বলেন যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়; বর্মবাদী বলেন 'য জ্ঞাতা' (যিনি জ্ঞাতা' তিনি ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করেন। 'যজ্ঞ এবং জ্ঞাতা' এতদুভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। 'যঃ' শব্দের 'য' এবং 'জ্ঞাতা' শব্দের 'জ্ঞ' লইলেই 'যজ্ঞ' হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া ঋষি বলিতেছেন যজ্ঞই ব্রহ্মচর্য।'

(ছান্দোগ্য উপনিষদের ব্যাখ্যা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৭)

২. ঔপনিষদ বিপ্লব : তারাপদ লাহিড়ী, বালার্ক শারদীয় সংকলন, ১৩৮৩।

৩. বৌদ্ধধর্ম—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ ৩৫।

৪. ঐ ঐ পৃ ৪৫।

৫. ঐ ঐ পৃ ৪৭।

৬. প্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক লিখিত 'ধর্মবিজয়ী অশোক' পূর্বাশা, পৃঃ—৪৫-এ পাদটীকায় এই তথ্যটি আছে : 'অশোকের আদর্শস্থানীয় বুদ্ধদেবও স্বীয় সংঘভুক্ত ভিক্ষুগণের পক্ষেও মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেবদত্ত যখন ভিক্ষুগণের পক্ষে আমিষাহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেন তখনও তিনি তাতে সম্মতি দেন নি। Manual of Indian Buddhism by H. Kern পৃ ৭১ ও পাদটীকা ৫ এবং Hindu Civilisation by R. K. Mukherji পৃ ৪৭ পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।

৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—উদ্বোধন কার্যালয়, পরিশিষ্ট। পৃ ২০। ঐ বক্তৃতায় স্বামীজির এরকম কথাও ছিলো : 'বুদ্ধদেব নূতন কিছু করেন নি। কিন্তু তিনি নূতন যেটি করেছিলেন, সেটি হচ্ছে—জাতিভেদপ্রথা উচ্ছেদের জন্য একটি প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত। তাছাড়া আরও একটি অভিনব কাজ বুদ্ধদেব সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি তাঁর চল্লিশজন শিষ্যকে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরণ করেছিলেন এই নির্দেশ দিয়ে : 'বৎসগণ, তোমরা সকল দেশের সকল মানুষের সঙ্গেই উদার ভাব নিয়ে মিলিত হবে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মিলিত হবে, এবং সকলের কল্যাণসাধন কল্পে মহাবাণী প্রচার করবে।' ঐ-পৃ ২০-২১

৮. ঐ—ঐ, পৃ ৮

৯. ঐ—ঐ, পৃ ১৪

১০. Indian Council For Cultural Relations কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'The Indo-Asian Culture' Vol. V. No. 4, April 1957 এ প্রবন্ধ 'Buddhism and Other Philosophers' by Prof. Dr. Helmuth Glasenapp.

১১. উপনিষদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বই-এ পাদটীকা হিসেবে বেবরের উক্তির পর লেখকের মন্তব্য: পৃ ৮

১২. The Story of Philosophy—Will Durant, ভলতেয়ার প্রসঙ্গ, পৃ ২২০

১৩. উপনিষদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১৩

১৪. ঐ ঐ ঐ পাদটীকা থেকে উক্তি।

১৫. ঐ ঐ পৃ-৩২ পাদটিকা থেকে উক্তি।

১৬. ঐ ঐ পৃ-৩১ 'উপনিষদের প্রাচীনতা' অধ্যায়।

১৭. উপনিষদ বিপ্লব—তারাপদ লাহিড়ী, বালার্ক শারদীয় সংকলন।

১৮. What is History ?—E. H. Carr, পৃ. ১১ ও ২৩।

১৯. Literature and Art—Karl Marx and Frederick Engels.

২০. মার্কসের মৃত্যুর পর কট্টর মতের সংশোধনার্থ যে চিঠিপত্র বেরিয়েছে সেই চিঠিগুলো মনোযোগের সাথে পড়লে ধারণা করা যায়—অর্থনীতিই সবক্ষেত্রে প্রবক্তা নয়, একথা কেন বলেছিলেন, তা বোঝা যায়। যেমন বন্ধুর কাছে এঙ্গেল্‌স এর চিঠি, কিম্বা স্মিদ্‌ট (Schmidt) -এর কাছে এঙ্গেল্‌স-এর চিঠি: It would surely be pedantic to try and find economic causes for all this primitive nonsense . কিংবা Heinz Starkenburg -এর কাছে চিঠি: It is not that the economic position is the *cause and alone active*, while everything else only has a passive effect,' ঐ চিঠির ভিতরেই আছে: 'Men make their history themselves, but not as yet with a collective will or according to a collective plan or even in a definitely defined, given society. Their efforts clash, and for that very reason all such societies are governed by *necessity*, which is supplemented by '*accident*.' এখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 'accident' শব্দটি কি গ্রাহ্য ? সেজন্যেই রাসেল ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, বিশ্বে যখন নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন মার্কসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ঘুমুবার ব্যবস্থা করে নেবে। রাসেলের 'The Age of Reason' বইতে মার্কসের প্রসঙ্গ স্মর্তব্য।

২১. বঙ্কিম রচনাবলী সাহিত্য সংসদ ২য় খণ্ড, সাংখ্যদর্শন পৃ. ২২৯

২২. ঐ ঐ ঐ দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম পৃ. ৭৮০-৭৮১

২৩. ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ. ৮১৪

২৪. ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ. ৭৯৯

২৫. ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ. ৮১৮

২৬. F. H. Carr এর 'What is History ?' বই থেকে উদ্ধৃতি, পৃ. ৮১

২৭. এঙ্গেল্‌স-লিখিত Conrad Schmidt এর কাছে চিঠি, Oct. 27, 1890 in Karl Marx, Selected Works Vol. I p. 388.

অরুণ ভট্টাচার্য

কীটসের একটি কবিতা পাঠে

(ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু)

This living hand, now warm and capable
of earnest grasping ......
......See here it is—
I hold it towards you.

: John Keats

ছাখো, এই আমার শক্ত হাত
তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি, ধরো
যতদূর যায় আলোর মসৃণ
সুতো।

বাগানের সব ফুলগুলি আমি
তোমার হাত ভরে দিতে চাই, ধরো
যতদূর যায় ফুলের স্তবক, এই মুহূর্তে।

বইতে পারছি না আমি তোমার ভার,
ফুলের মত সৌরভ, ঈর্ষার মত আগুন,
বরফের মত স্তব্ধ।

ধরো আমার এই হাত দুখানি, বাড়িয়ে দিয়েছি
তোমার দিকে। তোমার মুখের স্বেদবিন্দু,
তোমার ওষ্ঠের চিকণ, তোমার শুভ্র
পা দুখানি সব আমার হাতের মুঠোয়
রাখতে চাই। ধরো। এই মুহূর্তে। চারিদিকে যখন
আঁধার ঘন হয়ে আসে ঝিমিঝিমি।

বিয়াত্রিচে চেঞ্চির প্রতিকৃতির[১] সামনে দাঁড়িয়ে

Beatrice : I have endured a wrong so great and strange,
That neither life nor death can give me rest.

: P. B. Shelley

কেন দাঁড়িয়ে আছ রমণী ! কি বলবে আমাকে !
অমন আঁখিপল্লবের তীব্র ভ্রূকুটি কার জন্য
কী অভিসম্পাত জমা আছে মানবসন্তানদের
পিতার জন্য !

তোমার ধারণা ছিল পবিত্র কুমারীজীবনের
তোমার স্বপ্ন ছিল নির্মল ঘরণী হবার ।
বাদ সাধল দৈব, বর্বর পিতৃ-পুরুষের
উলঙ্গ কামুকতা ।

এর বেশী কী বলতে চাও রমণী ! না কি,
তাকাবে না আমার দিকেও ? ছাখো, আমি
চব্বিশ বছরের সুকুমার যুবা, পৌরুষ
এবং বীর্য আমার এই দুটি শক্ত হাতে,
চোখে স্বপ্ন সুন্দর আকাশের ।

আমার দিকে একবার মুখ তোলো, রমণী । শুধু একবার
নয়ন মেলে তাকাও ।
তাহলে আমি ওই পাষাণমূর্তিকে ঘিরে
উলুধ্বনি দিয়ে বাসর সাজাতে পারি ।

১. ইট্যালি থাকবার সময় শেলী ও তাঁর স্ত্রী মেরী Colonna Palace এ Guido -র আঁকা বিয়াত্রিচের ছবি দেখে অভিভূত হয়েছিলেন । তার তিরিশ বছর পর ডিকেন্স ওই প্রতিকৃতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে বলেন : The portrait of Beatrice di Cenci is a picture almost impossible to be forgotten···She has turned suddenly towards you. আমি সেকারণে এই প্রতিকৃতিকে পাষাণমূর্তি ছাড়া আর কিছু কল্পনা করতে পারি নি ।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কুতূহলী নাবালকের পাঠ্য

হাত বাড়ালেই বল্লম, বল্লম তুলেই ছোঁড়া, এবং তা নির্ঘাৎ বিঁধবে। সেটা যেমন জানে হাত, তেমনি দেয়াল, ঘরের কোণে-কোণে উত্তাল আর্তি, রক্তের পিপাসায় হাঁ-করা মুখ ছবির, ধুলার, ভ্যাপসা গন্ধের নীরবতার। এমন-কি সেই আশ্চর্য সূর্যাস্তের আকাশ বা দুঃখের শতদল পদ্ম, যারা এখনো মায়ের জঠরে ভ্রূণ, তা চোখের ভিতরের চোখে ইতিমধ্যেই রঞ্জিত-প্রস্ফুটিত, হয়তো আরো সত্য বাহ্যের দৃশ্য বস্তু হতে। তাই দেখছি সেখানে কিছুই দেখা যায় না, শূন্যে জাগছে গাছ, যে গাছের ডালে ময়ূর নাচছে।

বর্তমান ও আসন্ন ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ এই ঘর এক আজগুবি রূপকথা, নানান রঙের প্রতিফলনে স্বচ্ছ স্ফটিক—মনে হয় যেটা দেখছি তা নেই বা যা দেখছি না তা-ই রয়েছে, অথবা যা আছে ও নেই বা যা হয়েছে ও হবে কিম্বা একেবারেই হবে না, তারা দুজনেই রয়েছে একের পিঠে অন্যে চেপে, গাছের খানিকটা দেয়াল, কান্নার সরল রেখাটাকে শুদ্ধতা যেখানে যেমন খুশি খান-খান কাটে। যে-যুদ্ধ চলছে ও আপাতদৃষ্টিতে যার জয়-পরাজয়ের ফলাফল ভয়ার্ত কল্পনারই খোরাক, তার ইতিহাস এখনই লিখিত হয়ে আছে অতি স্পষ্ট হাতের গোটা-গোটা হরফে লালায়িত সে কুতূহলী নাবালকদের পাঠ্য হতে—রণাঙ্গণে ঐ-তো দেখি সমাপ্তির সন্ধ্যা, যখন যত শকুন আগে পালিয়েছিল ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে, তারা শ্মশানের প্রহরী ফিরছে একের পর এক, চোখ যেন হিংস্র তলোয়ার, নিরীক্ষণ করছে সারে-সার পড়ে-থাকা মুণ্ড, তাদের লালার ক্ষরণে বাতাস বিষাক্ত সিক্ত। আরো পরে যে রাত্রি নামবে ও সে রাত্রি পেরিয়েও যে-সূর্যোদয়, তার ভেরীও সমানই নিস্বনিত, যেহেতু ইতিমধ্যে ধ্বংসের প্রান্তর রূপান্তরিত বসতির পত্তনে, রাস্তার দুধারে পোঁতা দেবদারুর চারায়, কোথাও ছোট বড় বাড়ীর সারিতে, আরো দূরে তোরণে, তোরণ ছাড়িয়ে পুরীতে, পুরীর ভিতরে মহলে, পরে গালিচা-পাতা দালানে নিঃশব্দ পা ফেলে-ফেলে অবশেষে ঐ তো ঝাড়লণ্ঠনের নিচে, যেখানে সিংহাসন ও যে-সিংহাসনে আসীন রাজ্যের অধীশ্বর, ঝকমকে মুকুট কিংখাব

ইত্যাদি, পাশে সান্ত্রীর চামর, চিত্রবৎ পারিষদবর্গ, অদূরের অবগুণ্ঠনের ওপারে চাঁপার কলির মতো আঙুল ছোঁয়-ছোঁয় বলে শায়িত বীণা।

এ-মুহূর্তে যদিও ধেই-ধেই করে নাচে আলো-ছায়া মেঘের ডম্বরুতে থেকে-থেকেই বুকে কম্পন, উল্টো-পাল্টা কথা, সঙ্গীতে কোলাহল, তবু দেখছি আরো দূর-দুরান্তে বিস্তৃত জনপদ, যেখানে কুয়াশা কেটে গেছে বা ঝড়ের পরে উত্থিত ধূলিকণাগুলি একে একে নেমে এসেছে আবার মুক্ত করতে মহুয়ার দূরাগত গন্ধের বহুক্ষণ অবরুদ্ধ পথটি, ঐক্য ও প্রাঞ্জলতা ফিরেছে ঘরে, যখন নিঁখুত শিল্প হয়ে বিরাজমান দেয়ালে দেয়ালে রক্ত, কোণে কোণের চোখের জলে মুক্তা, দুঃখ পরিণত চারিদিক নীল পাহাড়ে ঘেরা কাকচক্ষু সরোবরে, এমন কি বেশ দেখছি কারা কারা আসছে তখন ঘরে, উৎসুক সেই পর্যটকের দল, তাকিয়ে একবার এটায় একবার ওটায় কী বলছে না বলছে, কারুর কুঞ্চিত ভ্রূ কেউ ধিক্কারে মুখ বেঁকায় ও সেটা এমন জলজ্যান্ত দেখছি বলেই হাত আমার কেঁপে যায় এই যখন বল্লমও ছুঁড়ি নি এখনো, যদিও তা এক লহমারই জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি দৃঢ় যেহেতু বিঁধতে হবেই, যেহেতু জানি বিঁধতে পারবই, তাছাড়া হয় হোক কুঞ্চিত ভ্রূ একের, সঙ্গী অন্যের ঠোঁটে হয়তো আত্মীয়তার আবেশ ঘনাবে—হয়তো কেন, ঐ তো ঘনাচ্ছে।

অতএব তারাও রয়েছে এই ঘরে, কাছে দূরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি আরো কত-জনার, যারাও ঢুকতে চায়, হয়তো ঐ ১টিটা খুলছে চৌকাঠের ওপারে, তাদের অপেক্ষা দুয়েকজনের বেরিয়ে যাওয়ার যেহেতু ঘরে স্থান নেই তিলধারণের এবং এত ভিড়ে আমি নিজেও হারিয়ে রয়েছি কোথাও, সকলের মতো দর্শকই বনে গেছি, তারিফ করছি ভ্রূ কুঁচকাচ্ছি বা কিছু উৎকট মনে হল তো বিস্ময়ে হতবাক। ধ্বংস বা সৃষ্টির সবই যখন এভাবে তৈরী হয়ে রয়েছে, মা ৫যের সেই মিলন-উৎসবের দিনটিও এখুনি আলপনায় আঁকা, তখন কথাটা মনে জাগল বলেই বলি,

যে-পথে পা ফেলা হচ্ছে, এই ফেলছি বা এখনো ফেলি নি তবু ফেললাম বলে, এবং যে-একই পথ বেশ দেখছি এই মুহূর্তেই অতিক্রান্ত হয়ে রয়েছে তার মৃত্যুতে বা গন্তব্যের গম্বুজে ও কৃষ্ণকলির ঝাড়ে, তার চেতনা আমাকে, আমাদের সকলকে, চটিজুতোকে—বল্লমকে বিরাট পুরুষ করে রেখেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে কাঁপিয়ে, টাঙিয়ে আকাশ থেকে আকাশে, অতীতে-ভবিষ্যতে।

আলোক সরকার

অপরিণতি

অসহনীয় তার পরিণাম আর তার প্রস্তুতি
দশরকম রঙ নিয়ে হয়েছিল—
লালের সঙ্গে মিশিয়েছিল হলুদ গাঢ় ধূসরের ভিতর বাদামী।
এখন শুয়ে আছে কাদার ওপর কিছুটা তুবড়ে গেছে নাকচোখ
তাকে দেখে ঘৃণা করতে পারো অবজ্ঞায় ফিরিয়ে নিতে পারো মুখ।
প্রস্তুতির কথা ভাবার কি দরকার!
পরিণামটাই প্রশ্ন আর দেখো ওই তার পরিণাম
কাদায় লুটোচ্ছে নির্বোধ অসহায়তা দুহাত ছড়িয়ে আছে।
স্থবির একটা আলস্য!
মাথায় বেঁধেছিল কৃষ্ণচূড়া হাতে জরির কঙ্কণ
কঙ্কণ ভেঙেচুরে দশটুকরো কৃষ্ণচূড়া নেতিয়ে হয়েছে জড়সড়।
মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে তেমন দেমাক কোথায় আর—
অবজ্ঞায় ফিরিয়ে নাও মুখ।
দশরকম রঙ নিয়ে হয়েছিল কালোর সঙ্গে মিশিয়েছিল সবুজ
আর এখন আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে যেন ওই ডুব দিচ্ছে—
কালো প্রশ্নহীন দিঘি আর স্পর্শবর্ণহীন নিস্তব্ধতা।
শূন্যময় বর্ণ আর একটা অপ্রয়াস।
অন্যমন তাকিয়ে আছে না-থাকা ঠিক কোথায় তাকিয়ে আছে?
শূন্যময় অপ্রয়াস নেমে যাচ্ছে না-থাকা ভ'রে তুলছে চরাচর।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

রুগ্ন বন্ধুর জন্য

বন্ধু কতকাল থেকে রুগ্ন প'ড়ে আছে
আজকাল মনেও থাকে না।
তাকে বড়ো একা রেখে বুক ভ'রে সুস্থ সাবলীল
হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিই। সে যে দূরে বিষণ্ণ মলিন…
বিছানায় মিশে গেছে,
দুই চোখে গভীর পিপাসা—
মনেও পড়ে না।
বন্ধু কতকাল থেকে রুগ্ন, তার কাছে
অসম্ভব বেড়ে গেছে দেনা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের ঘূর্ণায় ঝরে গিয়েছিলুম

পথের ঘূর্ণায় ঝরে গিয়েছিলুম ঢেউয়ের বুদ্বুদ।
সাজ খুলে রেখে, ক্ষোভ-অবিশ্বাস সব খুলে রেখে,
পথের ঘূর্ণায় ঝরে গিয়েছিলুম ঢেউয়ের বুদ্বুদ।
ত্রস্ত তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে বিষাদবিভ্রান্ত লোকজন
ছিঁড়ে একা একা গিয়েছিলুম পথের আগে আগে—
ছবির ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে খুবলোনো ময়দানে
অকূল ছাতার মতো ঝাঁ ঝাঁ রোদ, মীনশৈবালের
ছায়া চুনে চুনে শান্ত অলঙ্কার হয়ে জমে আছে,
চুম্বকের চোরা তীক্ষ্ণ হাত হঠাৎ টানছে আমায়, বাসস্টপের
ঠিক এক হাত দূরে ঝরে গেলুম ঢেউয়ের বুদ্বুদ!

ভাদ্রের তাপের মতো গা জড়ানো বিষাদবিভ্রান্ত লোকজন,
একা একা কত দূর যেতে পারো ? পিচকাঁকর ছেড়ে নেমে এলে—
ঘাসকাঁটা মাড়িয়ে, আমায় মাড়িয়ে—হাঁটছ, আমি খুবলোনো ময়দানে
ঝাঁ ঝাঁ রোদ হয়ে পুড়ছি, মীনশৈবালের
ছায়া চুনে চুনে শাস্ত অলঙ্কার হয়ে জমে আছি।
ঐ যে মেয়ের কাঁধে ভর রেখে শ্লথ হেঁটে যাও
বেলুনের দীর্ঘ টান রুখে ঐ যে গাছের আবডালায় গিয়ে চুমু খাচ্ছ
এখুনি যে ডুবে যাবে আলোর ভিতর আলো হয়ে—
সারা গায়ের পরাগকেশর মুঠো মুঠো করে ডলছ, একবার নিচে চাও !

পথের ঘূর্ণায় ঝরে গিয়েছিলুম ঢেউয়ের বুদ্বুদ……

বটকৃষ্ণ দে

আমার মেয়ের জন্য

রোজ একটা পাখি দেখি
    মুখে ক'রে কী কী সব আনে !
এদিক ওদিক ফিরে দেখবার সময়টুকু নেই।
    হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঘর, বন্দী সে নিজের জালেই !

একদিন ঘুম ভেঙে শুনি,
    চারটে পাখী গল্প করে :
        তিনটে পাখী, চতুর্থ আমার মেয়ে।
আরো একদিন, সেই তিনটে পাখী,
    ঘর ছেড়ে আকাশে বানালো
        তাদের নতুন ঘর
আমার মেয়ের গল্প আজো চলে :
    'জানো বাবা, কী হল তারপর ?'

কবিতা সিংহ

তবু এই ভাঙাবাড়ি

এই ভাঙা বাড়িও একদিন সারিয়ে তুলবে নিজেকে
না
ভাঙা কোমরে নতুন গ্রীল্ পুড়িয়ে নেবে না সে
খসা জানালার কোকরে বসবে না ফ্রেঞ্চ-উইণ্ডো
খোল-নল্চে পাল্টে নেবে না শারীরিক স্যানিটারীর

কিন্তু সে গজিয়ে উঠবে

তার ইটগুলো ক্রমশ পরস্পরের থেকে আল্গা হয়ে যাবে
অথচ নিজেদের ভিতরে ভিতরে সংহত
অমন ইট আর কখনো তৈরী হবে না বলে
সেগুলি পালযুগের ভাঙামূর্ত্তির মত প্রত্নতাত্ত্বিক হয়ে যাবে !
ইটের আল্গা ফাঁকে ঢুকে পড়তে থাকবে শিকড়ের সোঁদাগন্ধ
শাদা আঙুল !
আঁকড়ে উঠে সূর্য আর্দ্রতা আর পার্থিব দিন থেকে
জীবন শুনবে মহানিম
ভিতরের জানালা অলিন্দ ঘুলঘুলি ও ফোকর থেকে
ক্রমাগত ঝরে পড়বে একাকী নিঃশ্বাস
মেঝের ফেটে-ওঠা চটায় ধুলোর আস্তর
বিস্মরণের গুঁড়ো।
ভিতের অভ্যন্তর থেকে শির্ শির্ দাঁত-ব্যথার মত
উঠে আসতে থাকবে পৃথিবীর ভাপ আর ধুইয়ে-ওঠা জল !

পৃথিবীর বুকের মাটি সরিয়ে সরিয়ে
ক্রমশ তলিয়ে যেতে যেতে

নিজেকে সৃষ্টি করতে থাকবে এই চুণ বালি মাটি পাথর
জন্মান্তরের জন্য জন্ম জন্মান্তরের জন্য
ক্রমশ প্রস্তুত হয়ে উঠতে থাকবে ভাঙাবাড়ি
তারপর এই ভাঙাবাড়ির সংকেত দুলে উঠবে কারো স্বপ্নের ভিতর
লণ্ঠন দোলাতে থাকবে বাড়িটা কাচের রঙে পড়বে ভূষো
পায়ে পায়ে এখানেই ফিরিয়ে আনবে তাকে
এখানেই !
এখানে তখন শুধু মাটি আর মাটি
মৃত্তিকা স্তূপের চতুর্দ্দিকে কেবল মহানিমের তিক্ত গন্ধ
বিকীর্ণ জ্যোৎস্নায় কুশ ঝোঁপের কাঁটায় কাঁটায় যখন
জন্মান্তর জলে উঠবে সাঙ্কেতিক
স্ফটিক ফাটাবে চতুর্দ্দিকে

সহসা তার মনে হবে এখানেই খনন কার্য !

কার জন্য এই অলিন্দে প্রদীপ জলত কোনোদিন ?
দীর্ঘ শিসের কালো দাগ
মেঝের বুক জুড়ে ম্যাপে আঁকা নদীরেখার ফাটাচিহ্ন
কত চুম্বন যেন ছড়িয়ে রয়েছে দেয়ালের ফাঙাসে
কত কোলে মাথা রাখা কত শুভ্র অমল
পায়ের পাতায় মুখ ঘষা
কত আনন্দে আনন্দে ধ্বনিত হওয়া
সমস্ত ভিতর

মানুষের সাধারণ সুখদুঃখ হাসিকান্নার সঙ্গে সে
মিলিয়ে দেবে একটি ব্যক্তিগত সময়কে

তারপর
পায়ে পায়ে ফিরে যাবে বুকভার

সাধারণ ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে ক্রমশ এক করে নেবে সে
এই ভাঙা বাড়ির পাথরে পাথরে আঁকা জলছাপ
এই স্তূপ ছেড়ে
এই বুক চাপা গলাচাপা ফুল ঝোপ ছেড়ে
গর্জনের বীজের ডানায় ফিনিক ফুটতে থাকা স্বপ্নকণা ছেড়ে
ত্রস্ত অতীতের এক ক্রমাগত জ্যোৎস্নার
ঝুলন্ত দুলন্ত নাইলন সরিয়ে সরিয়ে
সে ক্রমশ ফিরে আসবে তার উজ্জ্বল ডেরায়
জ্বালিয়ে দেবে উজ্জ্বল মারকারি
গ্যাস্‌রিঙে তখন তার জন্য কফি চড়েছে

প্যাডের কাগজ মেলে কলমের ঢাকনি খুলে
জোড়া ভুরু কুঞ্চিত করে সে ভাববে কিছুক্ষণ
কোনো মুখ মনে পড়বে না তার
কোনো ভঙ্গী? না!
কোনো সঙ্গ বন্ধুতা কোনো বেড়ানো অশ্রু রক্তের
ত্যাগ ও স্বার্থপরতার
কোনো দুজনের কেবলই দুজনের পরস্পরকে সভয়ে জড়িয়ে
অন্য কোনো সময়ের অরণ্যের নিয়মকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকার
কোনো স্মৃতি না স্মৃতি না

তবু এই ভাঙা বাড়ি ক্রমশ সারিয়ে তুলবে নিজেকে
গজিয়ে উঠতে থাকবে
জানালায় বসাবে না নতুন পাল্লা
কোমরে ছড়াবে না গ্রীল
দেওয়ালে চুণকাম্‌

বিক্রমাদিত্যের লুপ্ত সিংহাসনের মত
সেই সুন্দর পুরুষটির জন্য

সেই সুন্দর পুরুষটিকে কোনোদিন কোনোদিন ফিরে পাবে না জেনেও
ভাঙা বাড়িটা
ক্রমাগত
ক্রমাগত
পৃথিবীর ভিতর ভিতর নেমে যেতে থাকবে
নেমে যেতে থাকবে।

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

রঙ বদলাচ্ছেন

যত ভালোবেসেই ডাক না তাকে
সাড়া দেবে না।
সূর্য-বিনষ্ট কিরণজাল
আবিষ্ট করে না।

সারা জীবনের নিশিপালনের
অহংশুদ্ধি,
তিনি অদৃশ্য রবেন
অথচ সব কিছুর স্বভাবে আছেন
শুধু থেকে থেকে রঙ বদলাচ্ছেন
আমার তোমার আর
সকলের।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নীচু হও

নীচু হও আরো নীচু হও
লীন হয়ে স্পর্শ কর ঠোঁট,
যেখানে জমেছে নুন, হিম,
ভিটামিন-বিহীন নীলিমা।

সেই ঠোঁট, অর্থহীন ঠোঁট
স্ফুরিত হয় নি কোনোদিন
অভিমানে, ক্রোধে, অনুরাগে,
মাছির প্রথায় প্রেম এসে
বসে নি সে বাসনার কষে,
দেখে গেছে বারবার তাকে
ক্ষুধাতীক্ষ্ণ স্বপ্নহীন দাঁত।

নীচু হও খুব নীচু হও,
ও ঠোঁটের লবণরেখাকে
খুব সাবধানে স্পর্শ করো—
বরফে বারুদে জমে আছে।

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

সেই তুমি

এত ধৃষ্ট ছিলো না তো
সরলতা সহজের কিংখাবে জড়ানো
নগ দাঁত জিহ্বার সরসতা
এহেন অমোঘ মৃত্যু লুকায়িত রক্তের সংরাগে
কথার মোড়কে জাড্য ব্রীড়া-অবনতা
সে কি দক্ষিণের অপার মৌসুমী
সম্ভাব্য সজল সুপ্ত বীজের গভীরে
ভিন্নতর জন্মের যন্ত্রণা—

সে কি তুমি !

বাসুদেব দেব

প্রতিদিনই এই সব

এ রকমই কথা ছিলো
তুমি হবে শাশ্বত নীলিমা
আমি হবো মাটির সবুজ
সমুদ্র সৈকতে আমাদের শিশুরা জোৎস্নায়
সারারাত কেবল বেড়াবে

মাথা নিচু করে রোজ যাই মিনিবাসে
কাটাকুটি মুশাবিদা করি
উনুনের আঁচে তুমি অন্য কার ঘরে
মাখনের মত গলে যাও

প্রতিদিনই এই সব টেলিফোনে দুপুর বেলায়
তোমাকে একাকী যদি পাই পাই না বলেই
তাস খেলি সিনেমায় যাই

শংকর দে

চিরস্মরণীয়াসু

তাঁর সঙ্গে, কী ভাবে দেখা
হয়েছিল, ভুলে গিয়ে আজো
একা একা পথে ভিজে দেখা
শূন্য পাতা, শাদা হয়ে কালো
চোখ দিয়ে কী ভাবে যে আলো
তাঁর ছায়া, পড়েছিল মনে।

রবীন সুর

রাজকন্যা

'বাড়ি নেই'—শুনে অন্ধি পোকাগুলি মগজে আমার
ক্রমশ প্রবলভাবে সীমান্ত সাজায় সমাবেশে।
প্রতিটি সশস্ত্র পোকা গেরিলার মতন র্তৎপর
সামরিক পদক্ষেপে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার
গোপন সুযোগ খোঁজে। ভয়ানক শূন্যতা বোধের
বিস্তীর্ণ আকাশখানি দৃশ্যাতীত জেট-এর তাণ্ডবে
ধূমল সন্দেহ বাষ্পে নক্ষত্রের উজ্জ্বল যৌতুক
সহসা হারিয়ে ফেলে। চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার।

অথচ তখন কেউ একবারও বলে নি আমায়
কয়েকটি প্রদীপ হাতে রাজকন্যা লঘু পদক্ষেপে
দক্ষিণ দালান ঘুরে সাবধানী হাতের তালুতে
চোদ্দটি স্বপ্নের শিখা বাতায়ন সিঁড়ি ও খিলান
নিঃশব্দে পেরিয়ে গেছে অন্তরালে রজনীগন্ধার
শ্বেতাভ সুন্দর মূর্তি দীপান্বিতা রাত্রির ভিতর।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নের জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দেয়

সামান্য কুয়াশায় ভারি হয়ে ওঠে নিষ্ফল অভিমান
মধ্যরাত্রে স্বপ্নের জাহাজ প্রতিদিন সমুদ্র পাড়ি দেয় ;
জাহাজডুবির গল্প মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে লোকালয়ে
ভ্রমণবিলাসী মানুষও ফিরে আসে ঘরোয়া অভ্যাসে
পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দীর্ঘদিন ধরে জমে প্রাচীন ক্ষোভ
ভূমিকম্প হলে আন্দোলিত বৃক্ষশির মাথা-উঁচু ঘর-বাড়ি—
অবলীলায় ভেঙে ভেঙে পড়ে দেউরির ইঁট, বালি এবং পাথর
এই ভাঙাচোরা দৃশ্যে চোখে পড়ে না নারী ও আগুন
দলা-পাকানো স্মৃতি চেয়ে দেখে আতঙ্কিত আঁধার
অসহায়তায় ক্ষয়-ক্ষতির কথা গৃহস্থের মনে আসে না
মাটিকে ছুঁয়ে সময় ঘটনার নীরব সাক্ষী থেকে যায়
ভাঙা-গড়ায় জড়িয়ে আছে প্রকৃতির আজীবন বিধান
প্রজন্মের কাছে মাথা নীচু করে থাকে সম্ভাবিত দিন।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

কোনো কোনো দুঃখ

কোনো কোনো দুঃখ মোটেই দীনদুঃখী নয়
কেউ কেউ দারুন সম্ভ্রান্ত
আগুনের বাসিন্দার মতো তেজী অহংকারে
ঐশ্বর্যের হাতছানি ছুঁড়ে ফেলে পথের ধুলায়
দুপায়ে মাড়িয়ে যায় বাবুতীয় সুখের ইশারা।

কোনো কোনো দুঃখ আদপেই দীনদুঃখী নয়
কেউ কেউ অদ্ভুত প্রণয়
তাপস যুবার মতো লক্ষ্যভেদী নির্মল সাহসে
বুক পেতে গ্রহণীয় যাবতীয় নির্মম প্রহার
ধ্যানের আসনে চড়ে
দিবানিশি খুঁজে ফেরে নিজ নিজ সংকল্প স্বদেশ।

শিখা সামন্ত

ডাক

এমন অদ্ভুত সুরে ডাকো, চম্‌কে উঠি
অসময়ে যেন বলির বাজনা বাজে
এমন গতিময় হাটো, হোঁচট লাগে, রক্তাক্ত হই
এমন অপ্রকৃতিস্থ হাসো, অস্থির নাড়ীতে লাগে টান্
এমনই গোপন সুরে বাজো, স্রোতের ভেতর স্রোত টান্

এমন ঠা ঠা দুপুরে, মাথায় সূর্যের চোখ জ্বলে,
সেভাবে ওই আগুন, দুঃসাহসিক পৌরুষ তোমার?
এমন ডুবুরি তুমি, জলের অতলে হাত খোঁজো
সাঁতার না জানি, ক্রমশ ডুবি

এমন অদ্ভুত সুরে ডাকো, চম্‌কে উঠি
ঝড়ের গতিতে বাঁশি বাজে।

উত্তম দাশ

বকখালি

উর্ধ্ববাহু ঝাউয়ের ডানায়
নীলরোদ রেখেছে বিস্তার
ধূসর-রঙের নগ্ন
বারেবারে মুড়ে দেয় মসৃণ চাদর।

নিয়মিত সমুদ্রের শ্রম
তিরতিরে পাখিরা খুঁটে খায়
ঢেউভাঙ্গা বালিহাঁস বুকে,
এ-যেন গর্বের বুক
নওল কিশোরী কাকে
শরীরের উষ্ণতা দেখায়।

সামসুল হক

খেলা

সামনে সামনে উড়ছিলো ঝ'ড়ো পাখি
একটা একটা পালক কুড়োয় সে
এই খেলা তবে শিখিয়েছে বাল্মীকি

সামনে সামনে উড়ছিলো ঝ'ড়ো পাখি
একটা একটা পালক কুড়িয়ে সে
কটির পোশাক মাথার মুকুট বানায়
ভিখিরি-বালক শিখিয়েছিলো কে খেলা

গ্রীবা ফিরিয়ে সে হঠাৎ দাঁড়ায় কেন
পিছনে তখনো উড়ে যায় ঝ'ড়ো পাখি
নিষাদ কি তাকে এই খেলা শিখিয়েছে
আদিম শিল্পে হঠাৎ দাঁড়ায় কেন
আর ছুটে যায় স্বর্গ কাঁপিয়ে সে
এই খেলা তাকে শিখিয়েছে ঝ'ড়ো পাখি

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

শস্ত

শস্তের ভিতর-ঘরে অখণ্ডমণ্ডলাকার ভ্রূণ
পাথরের কঠিন স্তব্ধতা
তাই দেখে মানুষের ঘুম ভাঙে
পোষাক পাল্টিয়ে নেয় সংসারী পুরুষ
লোভ, শুধু লোভের যন্ত্রণা পুষে শিকড়ে বাকড়ে।
শস্যের যৌবন নিয়ে পৃথিবীর কঠিন সংগ্রাম
পরিপূর্ণ করে তোলে জীবনের ঝুলি ;
রঙ তুলি হাতে নেয় সৌখিন শিল্পীরা ;
প্রেমহীনতার মধ্যে একটি জলন্ত চিত্র মূর্তি হয়।
শস্তের সম্পদ ঘিরে ছুটে যায় অকালে মৌসুমী।

মঞ্জুভাষ মিত্র

কুসুমের মৃত্যু

বনের মধ্যে দেবতার মত বীণা বাজিয়ে যেতে যেতে
নানারন্ধ্র কুড়িয়ে নিল চাঁপাফুলের ঘ্রাণবান সৌন্দর্য
দুঃখ দিয়ে তৈরী এই বীণা কোনো মৃতকে
জীবিতের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তৈরী হয় নি
এক জীবিতকে মৃতের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে
অতএব তার জন্য জয়ধ্বনি করো।

বর্ষচক্র ঘুরে গেল
বনে বনে ঘনিয়ে এল মৃত্যু
নগ্নরমনীর নিজস্ব কুসুমের মত আবার কি তারা
উঠে আসবে কোনো গন্ধময় পুনরভ্যুত্থানে ?
পাগল করে দেবে পুরুষের নাভিফুলকে ?
বীণা বাজে : দুঃখ দিয়ে তৈরী এই বীণার ধ্বনি
শ্রবণ করে দিব্যরমনীরা
মত্ত আঙুলে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দাও গায়ককে
অবসাদ, ঝর্ণার জলে
ওই দেখ ছুটে এল বাতাসবাহিনী পালে পালে কুকুরের মত
নত হয়ে কুড়িয়ে নেবে মাংসখণ্ডের ঘ্রাণবান সৌন্দর্য...

পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার ঝুমুর গান

পশ্চিম সীমান্ত-বাংলা এক কথায় রাঢ় অঞ্চল অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলা লোক-সংস্কৃতির সুবর্ণ খনি। ময়ূরাক্ষী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, শিলাবতী, কংসাবতীর তীরে তীরে শাল মহুয়া করমের বনে বনে শুশুনিয়া, বাগমুণ্ডি, অযোধ্যা, বানশা, কঁচ, চাণ্ডিল পাহাড়ের আনাচে-কানাচে আদিবাসীদের কুটিরে কুটিরে লোকসংস্কৃতির ধারা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ছড়ায়, গানে, রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, ধাঁধাঁ, প্রবাদে পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার এইসব অঞ্চলগুলি ভরপুর। কারণ এই অঞ্চলের মিশ্র প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ, আদিবাসীদের মধ্যে মিশ্রণ, বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সীমান্ত সূত্রে যোগসাধন এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

মেদিনীপুর সীমান্ত-বাংলার একটি অন্যতম বৃহৎ অঞ্চল। এর প্রাকৃতিক পরিবেশ একদিকে পার্বত্যময় কঙ্কর-পূর্ণ বিশাল ভূভাগ ; গড়বেতা, শালবনী, গদাপিয়াশাল, ঝাড়গ্রাম। অন্যদিকে কিছুটা অংশ নদী-বাহিত পলিমাটি দ্বারা পরিসিক্ত। সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা। কিন্তু এই অঞ্চলের চাইতে পশ্চিম-দিকের শিলাময় প্রান্তরে লোকসাহিত্যের নানা উপকরণ পাওয়া গেছে ; ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্তে আদিবাসী সমাজের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে উড়িষ্যার সংস্কৃতির সংমিশ্রণ অনুভব করা যায় এবং উত্তর-পশ্চিম অংশে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে এর সংমিশ্রণও উল্লেখযোগ্য। নানাদিক হতে উপকরণ সংগ্রহ করে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন একটা বিশেষ রূপ লাভ করেছে। কারণ এই সব অঞ্চল দুর্গম অরণ্যাকীর্ণ, বহির্জগতের প্রভাবমুক্ত।

মেদিনীপুরের পশ্চিমে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বিহারের সিংভূম, উত্তরদিকে বাঁকুড়া-হুগলী, পূর্বদিকে ২৪ পরগণা, দক্ষিণে উড়িষ্যার বালেশ্বর ও বঙ্গোপসাগর। সুতরাং মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশেই লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

বিহার ও উড়িষ্যার প্রতিবেশী রাজ্যের প্রভাব একান্তভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বাঁকুড়া জেলার একদিকে মেদিনীপুর অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলা, বিহারের সীমান্তও এসে মিশেছে এ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে। পুরুলিয়া পূর্বে ছিল বিহারের অন্তর্গত, বর্তমানে পশ্চিমবাংলায়।

এই রাঢ় অঞ্চলে আদিম জাতির বাস। এই অঞ্চলে মৎস্যজীবী ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম্ প্রভৃতি এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা ভূমিজ, মাল, পাহাড়ী প্রভৃতি আদিবাসীদের-ই বাস। প্রেম-সঙ্গীতেই ঝুমুর গান। নৃত্য-সম্বলিত ঝুমুর গান। শাল, পিয়াল, করমের বনে মহুয়ায় গন্ধে মাদলের তালে তালে ও বাঁশীর সুরে সুরে সারিবদ্ধভাবে ঝুমুর নাচ ও গান একটি সহজ সরল আদিবাসী জীবনেরই প্রতীক বলেই পরিচিত। আদিবাসীদের এই ঝুমুর গান প্রধানত তিনটি পদ দ্বারা গঠিত। প্রথম পদটিতে সুর স্বাভাবিক-ভাবে অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় পদটিতে সামান্য একটু চড়া হয়, পরে তৃতীয় পদে তা খাদের দিকে নেমে আসে। যেমন

চেতারাচ নাতারাচ আঁকু মন রূপ কোয়ালাং
তুমার মামারে চাড়ি নিয়া মমরে তুলাং
হাকু মমলাং তুলা হাটিং কুয়ালাং॥

(পুরুলিয়া)

ক্রমে বাংলা ভাষার সান্নিধ্যে এসে আদিবাসীর ঝুমুর বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভাষার পরিবর্তন হলেও সুর ও অন্যান্য আঙ্গিকের দিক থেকে তার কোন পরিবর্তন হয় নি :

দুপহর বেলা হোল
সরবালি তাতা হোল
আমি লক্ষণ চলিতে না লারি॥
পথে আছে কদম গাছ
ডালি লক্ষণ ভাঙ্গি দেল
আমি লক্ষণ ধীরে চলিব॥

(পুরুলিয়া)

এই বাংলা ও সাঁওতালী মিশ্র ভাষায় রচিত সঙ্গীত এই সব অঞ্চলে অজস্র

লেখা হয়েছে। কিন্তু তখনও তা নিতান্তই সাঁওতাল সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা ভাষার প্রভাব যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখনই তা বাঙালী সমাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। সাঁওতালদের ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ হওয়াতে এই ঝুমুর গান একটি নতুন রূপে রূপায়িত হয়েছে। অবশ্য সুরের দিক হতে তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বহাল রেখেই চলেছে। এই ঝুমুর গানের সুর পঞ্চস্বর-যুক্ত। বিষয়বস্তুতে লৌকিক প্রেম এবং প্রকৃতির বর্ণনাই প্রধান। আদিবাসী ঝুমুর গানে আধ্যাত্মিক চিন্তা অথবা পারত্রিক কল্যাণে স্বপ্নের কোন স্থান নেই। এই ঝুমুর গানগুলি সাঁওতালী ভাষা অথবা অন্য যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন তা প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তব ভাবনায় সরস। কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রভাব যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই বাইরের চিত্ররূপ এদের মধ্যে প্রবেশ করল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তারপর থেকেই এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ফলস্বরূপ, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচনার অনুকরণে এক ধরণের লৌকিক পদাবলীর পরিচয় মেলে, তাকেও সাধারণ ভাবে ঝুমুর গান বলা হয়ে থাকে। যদিও আদিবাসী এক ধরণের সঙ্গীতের নামই ঝুমুর, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ের লৌকিক পদাবলীর সঙ্গে আদিবাসী ঝুমুরের অন্তর ও বহির্মুখী নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তা ঝুমুর বলেই পরিচিতি লাভ করল। ক্রমে দেখা গেল এই সব ঝুমুর গানে ভাঙা কীর্তনের সুর ব্যবহৃত হতে থাকল। এখানে একটি ঝুমুর গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন

মজিতে উচিত ছিলো,
অগাগোড়া ভেবে।
তার বারণ কথা না শুনিলে,
প্রাণেরি গরবে গো
কাঁদলে কি হবে।
এ রোগ ঔষুধে না যাবে গো॥
অনেকের ধন তুমি
অনেকে ভজিতে

তবে কেন অবলায় এত দুঃখ পাবে
 কাঁদলে কি হবে।
এ রোগ ঔষুধে না যাবে গো॥
বুকেতে লুকায়ে দুঃখ
 মুখেতে হাসিতে।
উদয় বলে গোপন প্রেম
 সেই দাগা দিবে গো,
 কাঁদলে কি হবে॥

(পুরুলিয়া)

আদিবাসী ঝুমুর গান সমবেত ভাবে নৃত্যের মধ্য দিয়ে গাওয়া হয় মাদল ও ও বাঁশীর সুরে, কিন্তু উপরি-উক্ত গানটি সমবেত ঝুমুর গান নয়, এটি একটি বিরহের গান। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলে আদিবাসী ঝুমুর গানের আঙ্গিকে যে ভাঙ্গা কীর্তনের সুরের প্রভাব পাওয়া যায় তা প্রধানত সপ্ত সুরেই গাওয়া হয়ে থাকে। এই ধরণের ঝুমুর গানকে বাংলা দেশের উচ্চ পর্যায়ে ভাটিয়ালি গানের সমকক্ষ বলা চলে। ভাটিয়ালি গানে যেমন একগুচ্ছ কথা বলার পর একটি সুরে তার স্থিতি এবং পরক্ষণেই নিচগ্রামে চলে আসার যে রীতি তা ঝুমুর গানেও শোনা যায়। হয়ত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলে অথবা বাণিজ্যিক লেনদেনের ফলে এই ভাটিয়ালির গায়কী ঢঙ্ কিছুটা ঝুমুর গানের মধ্যে এসে মিশে গেছে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর অনুকরণে এই ঝুমুর গানগুলিতে নিজ নিজ নাম ভনিতা রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ভনিতার ব্যবহার অবান্তর, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এর দ্বারা কোন সঙ্গীতের সাম্প্রদায়িক অথবা গোষ্ঠীগত পরিচয় বোঝা যায় না। যে গীতরীতি এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর গীতরীতি নয়, নিতান্তই এই অঞ্চলের গীতরীতি। রাধাকৃষ্ণের নাম যুক্ত আছে বলেই একে বৈষ্ণব পদাবলী বলে উল্লেখ করা যায় না। এ গুলিকে বলা যেতে পারে লৌকিক পদাবলী। অবশ্য বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর প্রভাব এই গানগুলিতে শুধুমাত্র বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, তা অন্তরঙ্গকে স্পর্শ করতে পারল না। সেজন্যই বলা যায় এই ঝুমুর গানগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ উত্তরাধিকার নয়, কারণ উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ ভাবে হতে গেলে এর ভাব

ও রূপ উভয়েরই উত্তরাধিকারের কথা আসে; কিন্তু এখানে এই ঝুমুর গানে ভাবের দিক থেকে কোন্ উত্তরাধিকার স্থাপিত হতে পারে নি, এমন কি রূপ-আঙ্গিকের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলীতে যে ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তাও এতে নেই, এমন কি সহজ বাংলা ভাষাও নেই, পরিবর্তে আছে অলঙ্কার-সমৃদ্ধ বাংলা গীতিভাষার একটি রূপ। অনেক ঝুমুর গানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক পদ আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন

দিবা অবসানে নিকুঞ্জ কাননে
কে বাজায় মোহন বাঁশী রে।
রাধা নাম ধরে ডাকে উচ্চস্বরে
অতুল প্রেম প্রকাশিরে॥
কাননে বাজত বাঁশী
বাঁশী ব্রজবধু কুল নাশি রে।
গৃহে ননদিনী যেন ভুজঙ্গিনী
শাশুড়ী গরল ফাঁসিরে।
হেন লয় মনে গেল কুঞ্জবনে
সাধে পড়ে প্রেমের ফাঁসিরে।

(পুরুলিয়া)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে যেভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ অবলম্বন করে পশ্চিম ও পূর্ববাংলার নাগরিক সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিওয়ালার গান প্রচার লাভ করেছিল সেই সময় থেকেই একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে একই ভঙ্গিতে বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ঝুমুর গান শোনা যায়। অবশ্য একথা ঠিক যে কবিওয়ালার গান বিশেষ এক একটি ব্যবসায়ী কবিওয়ালার গানের সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং শুধুমাত্র তাদের দ্বারাই প্রচারিত হয়। এগুলি কখনই লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে নেমে আসতে পারে নি। কিন্তু তার পরিবর্তে ঝুমুর গানগুলি, যে ভাবেই রচিত হোক, নিরক্ষর সমাজের মধ্যে তা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে লোকসঙ্গীতের স্তরে এসে নেমেছে।

মধ্যযুগে এই অঞ্চলে আকস্মিক ভাবে আর্যেতর সমাজের ওপর বৈষ্ণব ধর্মের

প্রভাব এসে পড়েছে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সুতরাং তাঁরা এই অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করতে লাগলেন। মন্দিরে যে সব লীলা কীর্তন হোত স্থানীয় লোকসঙ্গীতের ওপর তার প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে পড়ল। তার ফলেই রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ঝুমুর গানের প্রেরণা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করেছিল।

রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়াও নানা পৌরাণিক কাহিনী নিয়েও ঝুমুর গান শোনা যায়, যেমন, রাসলীলা ঝুমুর। মহাভারতের যে সমস্ত অংশ কৃষ্ণোপাখ্যানে প্রাধান্য লাভ করেছে প্রধানত সেই অংশ ঝুমুর গানের বিষয়বস্তু।

তাছাড়া কতকগুলি ঝুমুর আছে যার নৃত্যের সঙ্গে যোগ আছে এবং নৃত্যের নামানুসারেই সেই সব ঝুমুরের নাম শোনা যায়, যেমন—দাঁড়শালিয়া ঝুমুর। এক ধরণের আদিবাসীদের নৃত্য, ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন জাতিও তা গ্রহণ করেছে। করম বা অন্যান্য উৎসবে এই নৃত্য দেখা যায়, অবশ্য বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই নৃত্যের কোন সম্পর্ক নেই। মাদল বা ধামসার সঙ্গে অলস মুহূর্তে এই নাচ ও গান হয়ে থাকে। দাঁড়শালিয়া ঝুমুর পুরুষদেরই নাচ। এই গানগুলি আদিবাসীদের ঝুমুর গানের মতই সংক্ষিপ্ত। যেমন

মাঝকুলিয়া কড়া চট ভাই
একা যাইও না।
হাতে পুঁটি কানে কলম (ছোট ভাই)
একা যাইও না॥

(পুরুলিয়া)

কোন কোন ঝুমুর গানে আবার কৃষ্ণলীলার প্রভাব অনুভব করা যায়:

আইল বসন্ত কোথায় প্রাণকান্ত
অভাগিনী নিতান্ত ভাবিয়া,
প্রেমেরই অঙ্কুর হতেছিল,
মন কেন বিধি দিলে ভাঙ্গিয়া॥

(পুরুলিয়া)

বাংলার সুপরিচিত মুখোস-নৃত্য ছো-নাচ (ছৌ?)। এর সঙ্গে ঝুমুর গান

গাওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য ছো-নাচের সঙ্গে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে সঙ্গীতের বিশেষ একটা অবকাশ থাকে না, সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গীতাংশ পরিত্যক্ত হয়, ছো-নাচের ঝুমুর নাচ ও গানে নারীর কোন স্থান নেই। ছো-নাচের অনুষ্ঠানে সাধারণত চার পাঁচটি ধামসা এবং তার সঙ্গে শানাই বাজানোর রীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই গণেশ বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। যেমন

সিন্দুর ভূষিত অঙ্গ মূষিক বাহন
প্রথমে বন্দনা করি গণেশ চরণ।
নম নারায়ণ নম নম গণেশ দেব হরগৌরীর নন্দন॥

(পুরুলিয়া)

এই পশ্চিম সীমান্ত-বাংলায় এক ধরনের নৃত্যগীত ব্যবসায়িনীদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় নাচ্‌নী বা খেম্‌টি। নাচ্‌নী বা খেম্‌টিরা নাচের সময় নিজেরা অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষক রসিকরা যে গান গেয়ে থাকে তাকে বলা হয় নাচ্‌নী নাচের ঝুমুর গান বা খেম্‌টি নাচের ঝুমুর গান। নাচ্‌নী নাচের মধ্যে অশালীনতার পরিচয় যদিও বা মেলে, কিন্তু গানগুলির বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। সেই কারণে প্রেমসঙ্গীত হিসাবে এই গানগুলির যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। যেমন

ও সখি পাশরা তো নাহি যায়
পাশ্‌রি মনে করি
পাশরিতে পারি॥
যমুনা পুলিনে কদম্ব হেলানে
আঁখি ঠারি ঠারি চায়।
ও সখি পাশরা তো নাহি যায়॥
চরণে নূপুর বাজে সুমধুর।
ঠম্‌কি ঠম্‌কি চলি যায়।
ও সখি পাশরা তো নাহি যায়॥

(পুরুলিয়া)

বর্তমানে এই সব খেম্‌টি গানে রাধাকৃষ্ণ-বর্জিত হয়ে আধুনিক বিষয়বস্তু

মূল্য পেয়েছে এবং সুর ও বিষয়বস্তুর ভাব গভীরতার দিক থেকে অনেকটাই চটুল হয়ে পড়েছে। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন

আনার কলি শাড়ি লিব
আর বেনারসী শায়া লিব গো
কাল রংগের জ্যাকেট লিব
আমি অন্য রং লিব না
বরং এ কুলেতে রব না।
কানে লিব কান পাশা
গলে লিব চন্দ্রহার গো
উল্টো করে বাঁধব ঝুঁটি
আমায় কেউ করো না মানা
বরং এ কুলেতে রব না॥

(পুরুলিয়া)

এ অঞ্চলে আর এক ধরনের ঝুমুর নাচ ও গানের প্রচলন আছে তাকে বলা হয় পাতা নাচের ঝুমুর। এই নাচ গানে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে এককালে আদিবাসী সমাজের সখা বা সখীত্ব পাতানো হোত অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন করা হোত। 'করম' উৎসবে পাতাশুদ্ধ একটি গাছের ডালকে কেন্দ্র করে নাচ গান করা হোত। সেই জন্যই এই গানের নাম পাতা নাচের ঝুমুর গান। অবশ্য এই করম উৎসবেই যে পাতা নাচের ঝুমুর গান হোত তা নয়, অন্যান্য উৎসবেও এই পাতা নাচের ঝুমুর নাচ গান করার প্রচলন দেখা যায়। একে মাদল নাচের গান বা পাতানাচাড়ী বলা হয়ে থাকে। যেমন

কারা ধরার শুঁয়া পোকা।
ওইটাই বটে ছেইলার কাকা।
ওইটাই বটে আমাদেরই দাদা।

(মেদিনীপুর)

সারা ভাদ্র মাস জুড়ে এই সব অঞ্চলে আর এক ধরনের ঝুমুর গান শোনা যায়, তা হোল ভাদুরিয়া ঝুমুর গান। বিশেষ প্রকৃতির নৃত্যের সঙ্গে এই

গানগুলির সম্পর্ক আছে। বর্তমানে প্রকৃতি-বর্ণনা ছাড়াও ভাদুরিয়া ঝুমুর গান শোনা যায়; কিন্তু এককালে বর্ষা প্রকৃতির রূপ-বর্ণনাই ভাদুরিয়া ঝুমুর গানের মূল এবং প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। যেমন

ভাদর মাসে পিয়া পর দেশে
বলে দিও হে যেন নাগর আসে।
না দেখি হাটে, না দেখি বাটে
গুণমণিরে মন ভাঙ্গিল কিসে॥

(পুরুলিয়া)

আর এক ধরনের ঝুমুর গানের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হোল ঠাট ঝুমুর। বর্তমানের বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকাবাঁকা কথার মধ্যে দিয়ে গান গাওয়া। আমরা চল্‌তি কথায় যাকে ঠুকে ঠুকে কথা বলা বলি সেই ধরনের কথাই এই ঠাট ঝুমুরের বিষয়বস্তু। যেমন

বাজে বহালে বাঁশি
আর বিটি ছেইলায়
বাজায় বাঁশি
বিটি ছেইলার কুল রাখা
হোল দায়
পাছে বাসি ফুল ফুটি যায়॥
আরে কাটে ঘুঘিয়ারে
মাছ পড়ে টেংগরা
মাছ দেখে নাচে ছোট দেওয়া
বাসি ফুলে বসিল ভোমরা॥

(পুরুলিয়া)

ভরা বর্ষায় পশ্চিম সীমান্ত-বাংলায় সারা ভাদ্র মাস ধরে শস্যোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাকে বলে করম উৎসব। এই সময় আউশ ধানের নবান্ন এবং আমন ধানের রোপন উৎসব হয়, তখনই করম উৎসবের সময়। এই উৎসবে পৃথিবী ও সূর্যের বিবাহ দেওয়া হয়। আদিবাসীদের কথায় এরাই করম রাজা ও রাণী। করম বা পাহাড়ী কদম গাছের একটি পাতাশুদ্ধ ডাল মাটিতে রোপণ

করে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় এই ডালটিকে ঘিরে ঘিরে নাচ হয় তাকে বলা হয় করমের ঝুমুর। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে এই করম অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অংশ নেয়। অন্যান্য ঝুমুর গানের মত করমের ঝুমুর গানেও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই শোনা যায়। যেমন

আইল ভাদর মাস
কি আর কর শ্বশুর কাজ
শ্বশুর ঘরে আর না রব।
সখি গো করম পরবে আজ যাব॥
করমে একাদশী
সবে মিলি সঙ্গী সাথী
ঘুরি ঘুরি হাওয়া নাচব
সখি গো করম পরবে আজ যাব॥
কতই আর দাম
পুরাব মনসকাম
বাপের ঘরে করম মানব
সখি গো করম পরবে আজ যাব॥

(পুরুলিয়া)

এই অঞ্চলের আদিবাসী ঝুমুর ও বাংলা ঝুমুর গানে এত বৈচিত্র্য আছে যে তার সংখ্যা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে একথা বলা যায় ঝুমুর গান রাঢ় অঞ্চলের সাধারণ লোকের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণস্বরূপ। [গানগুলি সবই লেখিকার নিজস্ব সংগ্রহ]

গৌরী ভট্টাচার্য

বৈষ্ণব কাব্যালোকে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত

সভ্যতার উষাভাগ। পত্রপুষ্পে জাগলো শিহরণ। তৃণভূমি কম্পিত হলো। আরম্ভ হলো সভ্যতার পদসঞ্চারণ। শ্যামগানে মুখরিত হলো বনভূমি। বিরহ বেদনা প্রেম ভালবাসা আর বঞ্চনা দেখা দিলো মানবমনের স্তরে স্তরে। মানবমনের মাধুরী দিয়ে গড়ে উঠলো সমাজ সংসার। মানব জীবনের মূল্যায়ন আরম্ভ হলো। আপন শক্তিকে হারিয়ে ফেললো অদৃশ্য শক্তির কাছে। ধীর পদক্ষেপে মানব জীবনের মূল্যায়ন করে চললো সাধু সজ্জনরা। জিজ্ঞাসা আর উত্তর—সমস্যা ও সমাধান করে চললো শত শতাব্দীর ইতিহাস।

ঐ একই ধাচে কোচবিহারের সীমারেখার মধ্যেও মানবমনের মূল্যায়ন চলে। ভাব থেকে আসে ভাষা। সুরের স্বরলিপি দিয়ে মনের ভাষা সঙ্গীতে ভরপুর হয় মাটীর পৃথিবী। কোচবিহারের অব্যক্ত ভাষা দিয়ে গড়ে উঠলো সঙ্গীত আসর। সবাই যাকে বলে ভাওয়াইয়া। মানুষের ভাষা পৃথক কিন্তু ভাব অখণ্ড। বেদনার সুর, বিরহের আকুতি, প্রেমের নূপুরধ্বনি ভৌগোলিক সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে মানুষের দোরে খঞ্জরী বাজিয়ে চলে। মনে হয়, এ যেন কবিতার ছন্দ।

"ভাওয়াইয়া" শব্দটি কোত্থেকে এলো, এটা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়েছে অনেক কিন্তু কোন উত্তর সঠিক ভাবে পাওয়া যায় নি। 'ভাব' শব্দের সাথে "যাইয়া" যোগ দিল দাঁড়ায় "ভাবায়াইয়া"। 'খাও' থেকে তেমন "খাওয়াইয়া"। ঠিক এমনি ধারায় "ভাও" শব্দের সাথে যাইয়া যোগ দিয়ে দাঁড়িয়েছে—"ভাওয়াইয়া।" এখন প্রশ্ন আসবে "ভাও" শব্দের অর্থ কি? কোচবিহারে "ভাও" শব্দের অর্থ মূল্য / দাম (value)। কোচবিহারে "ভাও" কথাটি প্রচলিত। মানব মনভূমির মূল্যায়নই ভাওয়াইয়া শব্দের বিশেষত্ব। সমাজ মনের সুখ দুঃখ, প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-মিলন, বিচ্ছেদ-বেদনার ভাষা দিয়ে স্বরলিপিতে উঠলো সুরের মূর্চ্ছনা; যা প্রচলিত হলো "ভাওয়াইয়া" নামে। এই গান বৈষ্ণব কাব্যের ভাবরসে আপ্লুত। যেখানে রস, সেখানে কাব্য। যেখানে রস নেই সেখানে কাব্য নেই। দুঃখ অভিব্যক্তিতেও আনন্দ আছে। জীবন একপেশে নয়। সুখ ও দুঃখ নিয়েই কবিতা। সমালোচকরা তাই বলেছেন, Poetry is the criticism of life—জীবনের অভিব্যক্তি। জীবনসাধনা।

এই "ভাওয়াইয়া" গানের মধ্যে লুকানো আছে তৃণভূমির কথা, হলকর্ষণের প্রথা, প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ বঞ্চনার রূপ ও অলঙ্কারাদির কথা। এই বিষয়-বস্তু দিয়েই আমরা ধরে নিতে পারি দেশের আর্থিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা তখন কেমন ছিল।

সময়ের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং অলঙ্কারের ডিজাইন রুচির উপর নির্ভর করে। এই ডিজাইনের মধ্যেই লুকানো থাকে একটা শতাব্দীর কথা এবং সেটা কোন্ শতাব্দীর ডিজাইন তা আমরা ধরে নিতে পারি। দোতারা যন্ত্রের মাধ্যমেই ভাওয়াইয়া সঙ্গীত জমে ভাল। দোতারা তারের যন্ত্র। তারযন্ত্র মানবমনকে উদাস করে। এতে আছে ঘর-ছাড়ার ডাক—ঘর-করার নয়। তাইতো শুনতে পাই—"কাঁঠলে খুঁটার দোতরা তুঁই করলু মোরে জনমের বাউদিয়া।" "বাউদিয়া" অর্থ উদাস। এতে রয়েছে ঘর-ছাড়ার ডাক, ঘর-করার নয়।

তাই দোতারা-বাদক সুরের মূর্চ্ছনা তুলেছে মানবমনের মাধুরী দিয়ে :

"আমি কি আর ঘরে রব। কারবা
আশায় আমি রাখিব রে প্রাণ।"

এবার দেখুন, বৈষ্ণব কবির সাথে কেমন মিল আছে ওর ভাবে :

"পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেল।"

কিম্বা

"কালার লাগিয়া হম হব বনবাসী।"

ভাওয়াইয়া গানের গায়ক এখানে সাধিকা। তিনি মন বাঁধতে পারছেন না কিছুতেই। মন অধীর। ঘর-বাঁধার আশা নেই, আছে শুধু ঘর-ছাড়ার উন্মাদনা। কিন্তু ঘর ছেড়েও লাভ নেই, কারণ—"প্রাণ বন্ধুয়া মোর নাই এদেশে, কে শুনাবে মোহন বাঁশির গান।" তাই মন চঞ্চল, হৃদয় উত্তাল। "যেন চন্দের রসের লাগিয়া চকোর থাকেরে ধ্যানে।"

দোতারা-বাদক আবার সুর তুলেছেন—"যদি দোতরা রাখিস মান সোনা দিয়া তোর বাধিস কান।" কিসের মান দোতারা রাখবে? বাউদিয়া মনে প্রাণে উদাস। মনের দেয়ালে সে লাগিয়েছে ছাই। মনকে করেছে মোহমুক্ত, লোভকে করেছে সে জয়—কিন্তু মানবিকতার সকল মাধুরী দিয়ে সে হতে পারত রাজ

রাজেশ্বর।' মনকে করতে চায় অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নয়। বাউদিয়া জানে মন মন্দিরে যিনি আছেন তিনিই এই বিশাল জগতের কর্তা। এই মণিমঞ্জুষাই তার ধ্যান। এই মণিমঞ্জুষা প্রাপ্তিতেই সে দোতারার কান সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবে। সোনা মূল্যবান বস্তু, তাই সোনার কথাই তার মনে হয়েছে। সহজ ভাষায় সরল করে বলাই তার আনন্দ। এ যেন আনন্দ প্রাপ্তির নূপুর-নিক্বন।

আবার আসুন, ভাওয়াইয়া গানের আর এক জায়গায়:

"আরে ও মোর শ্যামকালা কার আগে
কব দুঃখের কথা।
আর,—শ্যামকালা মোর দূর দেশে
সদায় মন মোর ঝুরি থাকেরে।
বালিস ভেজে মোর দুই নয়নের জলেরে।"

আমাদের শ্যামকালা কিন্তু ব্রজের রাখাল। তাঁকে না দেখে প্রেমিকার দুঃখের সীমা নেই। এই সঙ্গীতে সে প্রকাশ করছে বিষন্ন শূন্যতা, উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা, কত ক্রন্দন, কত আর্তি ঠিক যেন বৈষ্ণব কবিদের মত। ভাষা কিম্বা প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে সঠিক না হলেও ভাবের দিক থেকে অনেকটা সমীপবর্ত্তী। এবার দেখুন, কবি জ্ঞানদাস বলেছেন, "কানু রহল পরদেশে। নিকরুণ কান্ত না আব।"

পরের পংক্তিতে ভাওয়াইর গায়ক বলেছেন "বালিস ভেজে মোর দুই নয়নের জলেরে।" বালিস কথাটা এখানে সহজ লভ্য বিষয় মাত্র। নয়নের জলেই এখানে প্রধান। এখন দেখুন, "নয়নের জলে বহয়ে নদী"। এবার আমরা পরের পংক্তিতে আসছি

"আর,—যদি চাইটা মুঞই খাবার বৈসং
গরুর গাড়ীতে কালার গান শোনং রে,
ছারং ভাত মুই মোচং চউকের জলরে।"

প্রথমেই বলেছি ভাষার দিক থেকে এক নাহলেও, ভাবের আবেশে এক বৈষ্ণব কবিদের সাথে। এবার দেখুন,

"গগনে চাহিতে সেথানে কালিয়া ভোজনে
কালিয়া কানু

ভ্রুযুগ মুদিলে সেখানে কালিয়া

কালিয়া হইল তনু।"

ভাওয়াইয়া গানের সুর উঠেছে দোতারায় পাঠক মনের আঙিনায়!

"আর,—নিদ্ গেইলে মুই সপন পাং

খাবার বসলে বিষোম খাঙ্ রে

তোর কালার কথা উঠে মনেরে।"

এখানেও দেখছি, বৈষ্ণব কবিদের ভাবের সাথে কি সুন্দর মিল রয়েছে, "দিবানিশি দিশিনিশি কালা পড়ে মনে।" ভাওয়াইয়া গানের স্রষ্টা বলতে চেয়েছেন ঘুম এলেই স্বপন আসে। আবার খেতে বসলেই কালীর কথা মনে আসে ও খেতে বাধা আসে। আসল কথা কালার কথা সব সময়ই মনে হয়। শেষের পংক্তিতে গায়ক বলেছেন,—"বুঝাইতে না বুঝে দোহারে।" আবার বৈষ্ণব কাব্যের ধারাতে দেখুন, "কি কহি কি শুনি কুছ বুঝই না পারি।" এমনি "কি কহি কি শুনি কুছ বুঝই না পারি"। এমনি ভাবে ভাওয়াইয়া গানের সাথে বিশ্বের অনেক কাব্যের সাথে ওর মিল আছে। কবিমন সর্বক্ষেত্রে এক। গানের বাসরে আবার উঠেছে দোতরার সুর:

"(সখী) মরণযমুনায় কেন ঝাপ দিলাম ২

একুল ওকুল দুকুল হারাইলাম ২

(সখীরে) ওরে প্রেমযমুনা আমার বৈরী হৈল,

কানে কানে কত কথা কৈল।"

আমাদের গায়ক প্রেমরূপ যমুনা কিন্তু পবিত্র প্রেম। কূল হারিয়ে অ-কূলে পরেছে, তাতে একুল, ওকুল দুকুলেই গত হয়েছে, কারণ প্রেমরূপে যমুনা সাধিকার বৈরী হয়েছে। এ প্রেম বিরহে আবেশ আছে। এ যে রাধা-প্রেম এতে জ্বালা নেই, জ্বালা হবার প্রলেপ আছে।

এমনি করে গৌড়ীয় সাংস্কৃতিক জীবনধারা কুচবিহারেও এলো ভাওয়াইয়া গানের হাটে।

এবার খঞ্জরীর তালে দেওয়ার টান দিয়েছে ভাওয়াইয়া গায়ক,—

"আরে ও বাবা নিমাই চনরে

জননীকে ছাড়িয়ারে বাবা না যান সৈন্ন্যাসেরে॥

ভাগবত পড়োরে বাবা পণ্ডিত তুই বড়
(ওরে) সংসারকে বুঝাইতে পার মাকে কেন ছাড়রে,
নিমের তলে থাকোরে নিমাই নিমের ছের পাতারে।
নিমের তলে থাকোরে নিমাই নিমের ছের কুড়ি।
ওরে কে তোরে হরিয়া নিল সোনা মুকের হাসিরে।
মা হেন জননীরে বাবা মা হেন জননী,
(ওরে) ছাড়িয়া যে যায় নাই যাও তোর
কোরাকের ননীরে।"

ভাওয়াইয়া গানের গায়ক কিন্তু সাধক। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সন্ন্যাসী হলেও মাকে ছাড়তে পারবেন না। তিনি যে লালায়িত বাৎসল্য প্রেমে। তাইতো তিনি দামোদর পণ্ডিতকে একান্তে ডেকে আদেশ দিয়েছিলেন,

তোমা সব নিরপেক্ষ নাহি মোর গান।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয়।
মাতার গেহে রহ, চাহ মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বাচ্ছন্দ চরণে।

এবার আর একটি ভাওয়াইয়া গানের প্রতি দৃষ্ট দিই :

"তুই মোর নিদয়ার কালিয়ারে
ও মোর কালিয়া দয়া নাই মোর প্রাণেরে॥
আজিনা সামটিয়া ঘরো না লেপিয়া, ঘরো না মুচি মুরে,
ও মোর কালিয়া বেড়াইয়া নাই মোর ঘরেরে॥
ছ্যাকা না পারিয়া কাপড় ধুইয়া কাপড় শুকামুরে
... ...
ভাতো না চড়িয়া ভাতো না রান্দিয়া ভাতো না বারিমুরে।
ও মোর কালিয়া খাওয়াইয়া নাই মোর ঘরেরে
সুপারি কাটিয়া পানো না সাজিয়া খিনি না বানামুরে।

ও মোর কালিয়া কার মুকোত দিম তুলিয়ারে।

বিছানা ঝাড়িয়া বিচানা পারিয়া মুশারি টাঙ্গাছুরে।

ও মোর কালিষা শোয়াইয়া নাই মোর ঘরেরে।"

ভাওয়াইয়া গানের সাধিকা নিজেই কান্তা। তাই তিনি কান্তাকে সহজ ভাষায় প্রেম ভালবাসা নিবেদন করেছেন। কৃচ্ছ্র সাধনের তত্ত্ব, জটিল পথ আমাদের সাধিকার নয়। প্রতিদিনের সংসারযাত্রায় প্রীতি মাতায় সন্তানে, বন্ধুতে বন্ধুতে, পতি পত্নীতে যে বিচিত্র আস্বাদ আমরা পাই, তারই সরলীকরণ এই গানের ছন্দে ছন্দে। সাধিকা কুঞ্জ সাজিয়েছেন। পাট পাট করে বিছানা পেতেছেন, পান সাজিয়েছেন, আঙ্গিনা ঝকঝকে তকতকে করবেন শুধু কালিয়ার জন্য। কিন্তু কান্ত নেই। এখানেও বিরহ।

এবার পদাবলী সাহিত্যের রূপ পাঠকের জন্য পরিবেশন করলেন। যার সাথে ভাওয়াইয়া গানের মিল রয়েছে ভাবে ও রসে:

"শূন্য ভেল মন্দির, শূন্য ভেল নগরী।

শূন্য ভেল দশ দিশ শূন্য ভেল নগরী।"

ভাওয়াইয়া গানের ভাব ও রস। পদাবলী সাহিত্য ও কাব্য ভক্তিরসে মেখে নিয়েছে:

"না যাব না যাব ও প্রাণ সইলো

ঐ না যমুনার জলে।

কোন্ ঘাটে ভরিব আমি জল (২)

ঐ ঘাটে কানাইয়া সই, না যাব যমুনার জলে॥

পদের উপরে পদ হেন থুইয়া (২)—

বাঁশীতে দেয় সখী টানলো, না যাব যমুনার জলে॥

নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী (২)"।

এবার দেখুন, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব, ভাষা ও ভক্তিরসের মধুমঞ্জরী:

"আর না যাইব সই যমুনার জলে

আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে।

নিলাজ পরাণে মোর বহে কি লাগিয়া

জ্ঞানদাস কহে মোর কাটি যায় হিয়া॥"

আবার দেখুন,

"কালা বাঁশিতে ভয়েয়া গান,
ওদিয়া ওদিয়া চলিয়া যানরে।"

এখানেও বৈষ্ণব পদাবলী সুরে বিলয় হয়েছে একই ভাব ও রস :

"আমার বধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া॥"

ভাওয়াইয়ার গায়ক হাতে ঝুমুর ও পায়ের ঝুমুর বেঁধে দোতারায় টান দিলো,

বাঁশী বাজিল (২) প্রাণ সজনী কদমতলায়।
ওকি রাধা বলি বাঁশী বাজিল (২)
ঐ না বাঁশের বাঁশী কিবা তার গুণ,
বাঁশী কলঙ্কিনী করলো মোরেরে
বাঁশী মোক কালু খুন॥
সামান্য বাঁশের বাঁশী, কি যে মন্ত্র জানে
বাঁশী ঘরে রইতে দিল নারে।
মোর পরাণ ধরি টানে॥
একে তো বাঁশের বাঁশী সাতখানি মোর
ওরে কেমনে জানিল বাঁশিরে
ওরে রাধা নামটি মোর॥
একেতো বাঁশের বাঁশী বিন্দু গোটা গোটা
হাতে টিকে মুকের কোকরে
ও বাঁশি দিল দারুণ জ্বালা॥"

কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বৈষ্ণব প্রেম-ধর্মের দার্শনিকতত্ত্ব। এর মধ্যেও রয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-বৈচিত্র্যের প্রভাব। তিনি ছিলেন গৌরকান্তি সোনার চাঁদ নিমাই। মাটির পৃথিবীর বুকে এসেছিলেন নিষ্কলঙ্ক চাঁদ হয়ে। তিনি অমিয় খণ্ড। তাই, গোটা দেশকে ধুয়ে মুছে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সাহিত্য কাব্য দর্শনে। জীবপ্রেম বিলাতে এসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এ ঘর থেকে অন্য ঘরে 'মানব সৌন্দর্য্য বোধ' ফুটিয়েছিলেন। সুতরাং কোচবিহারও মাধুর্যবোধ থেকে বাদ পরে নি। পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব কোচবিহারেও এসেছে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে। ভাওয়াইয়া তাই আনন্দ

গীতিকা। জীবন বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্ন যে নয় তারই অভিব্যক্তি পদাবলীর কাব্য থেকে ধরা পড়েছে।

"বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করায়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে
হারে সখী কি দারুণ বাঁশী
যাচিয়া যৌবন দিয়া হ'নু শ্যামের দাসী॥" : চণ্ডীদাস

কিম্বা

"কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী।
হাঁরে সখী, কি দারুণ বাঁশী।
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
স্বভাব সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল।

* * *

এবার ভাওয়াইয়া আমাদের নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে। জীবন খণ্ডিত নয়। বহুমুখী গুণের সমাহারেই জীবন। সুতরাং সবকে নিয়েই জীবন সঙ্গীত। ভাওয়াইয়া গানের অন্য আঙ্গিনায় এবার আমরা পদসঞ্চারণা করছি। দেখুন প্রেমিকা তার প্রেমাস্পদকে গালমন্দ দিচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায়। কারণ প্রেমাস্পদকে একরকম তীব্র ভাষায় আঘাত নাও করতে পারতো। প্রেম যে সব সময় সব কালেই ছলাকলায় হয় তারই পরিচ্ছন্ন রূপ এই গানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অতি আধুনিক কালের তথাকথিত প্রেমিকরাই যে ঠগ হয় সেটা কিন্তু ঠিক নয়। ঠগরা একালেও আছে ওকালেও ছিল। মনের কার্যকলাপের দিক থেকে ওটা যেমন ছিল, আজও আছে। মনের ওটা ছন্দ। যদিও ওটা মলিনতা তবু ওটাকে বাদ দিয়ে যেন আসে না। এবার গান পরিবেশন কচ্ছি, 'নাক ডাংরার ব্যাটাঠা, চউক ডাংরার নাতিটা। মোক ভোলালু সতের থাক দিয়ারে। সতের থাক দিয়া।' 'ইমিটেশন' কিম্বা নকলিয়াল সব কালে সব সময়েই চলে। এটা কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি। নকলিয়াল

চালিয়ে তুলিয়েছিল প্রেমিক তার প্রেমিকাকে, তাই এই গালমন্দ "নাক ভাংরার ব্যাটাটা।"

এবার দেখুন, "মহিষাল বনধুরে" গানের মধ্যে না করেও আমরা বলতে পারি কোচবিহার কিম্বা কোচবিহারের সংলগ্ন সমস্ত অঞ্চল প্রকৃতিগতভাবে জলাভূমি ও বনভূমি ছিল একসময়। সুতরাং জলাভূমি বিধায় মহিষের মত বলশালী জন্তু দিয়ে চাষ-আবাদ হতো। আর যারা এই মোষ কিম্বা বলদ কেনার ক্ষমতা রাখতো, তারা নিঃসন্দেহে ধনবান। ধনবান ব্যক্তি মাত্রই নারীজীবনের ইপ্সিত। তাই তাকে সামনে রেখে এই গীতকাহিনী কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে আমরা দেখতে পারি, কবি চলমান মেঘকে বলছেন প্রেয়সীর কাছে তার খবর পৌছে দিতে। এখানে দেখছি,—"চকোয়া পক্ষী" নিজেই বগিকে খবর দিচ্ছে, 'তোমার বগা বন্দি হইতে ধল্লা নদীর পারে।' এর খবর শুনে, 'বগি তুই পাখা মেলিল। ধল্লা নদীর পারে গিয়া দরশন দিল।' এবং

"বগাক দেখিয়া বগি কান্দেরে
বগিক দেখিয়া বগা কান্দেরে।"

এই শেষের পংক্তিটি সত্যই উপভোগ্য। বৈষ্ণব কাব্যধারার সাথে এক অপূর্ব্ব মিল। দুঃখ ও বেদনা বিরহ ও ব্যথা সর্বকালে সর্ব সময়েই এক। এখন দেখুন, বৈষ্ণব কবি কি বলেছেন

"দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

রবি বক্সী

ছবির জগৎ এবং কবিতা

মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩ সংখ্যা উত্তরসূরিতে 'কবিতার ভাবনা'য় শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য আমার মৌখিক উক্তি 'ছবির তো বটেই, গানের জগৎ কবিতার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, বিষয় বস্তু আলাদা' প্রসঙ্গে তিনি কেন আমার সঙ্গে একমত নন, তা মুদ্রিতাক্ষরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উক্ত বক্তব্য হঠাৎ রায় দেওয়া নয় এবং আমার 'কলেজী শিক্ষা'র অর্বাচীন জ্ঞান-প্রসূত নয়। যেহেতু শ্রীভট্টাচার্য আমার উক্তিকে প্রসঙ্গ করেছেন, তাই আমার এখন ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

ঋক্‌বেদে আছে 'ধ্বনিম্ পশ্যৎ রঙ্গম্ শ্রুণ্যোতাম্' অর্থাৎ 'দর্শনযোগ্য ধ্বনি এবং শ্রবণযোগ্য রঙ'। এতে যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা ভূমানন্দ বা ভূমালাভ। এটি জাগতিক মায়ার অতীত, সমস্ত ঐহিকতার অতীত, সর্বাতীত চরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত এমন এক তূরীয় দশা, যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তির (Function of sensory organs) স্ব স্ব পরস্পর স্বতন্ত্র ধর্মের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং একটি মাত্র অখণ্ড বোধ কার্যকর হয়। তখন কান চোখ নাক প্রভৃতি আলাদা ভাবে কাজ করে না। এটি পরম, সর্বাতীত, ইন্দ্রিয়জয়ী চূড়ান্ত দশা। মর্ত্যসীমা এই দশায় অতিক্রম করা যায়। তখন সূর্যোদয়ের বর্ণ বিকম্পন শ্রুতিযোগ্য এবং অক্ষর উচ্চারণে প্রতিমা নির্মাণ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। সেই শক্তির অধিকারীকে বলা হতো মন্ত্রদ্রষ্টা। সেই অমৃতাস্বাদ নিছক ছবি ও কবিতার মত জাগতিক ব্যাপার থেকে বহু দূরের ব্যাপার। আমরা যাঁরা ছবি আঁকি, কবিতা লিখি, বহু কলা-কৌশল আমাদের বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। আমরা মায়ার জালে ধরা পড়ে আছি।

পূর্ব ও পশ্চিমের নন্দনতত্ত্ববেত্তারা সেই সব কলাকৌশলের আলোচনার প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে এলোমেলো আনাগোনা করে কিছু জট পাকিয়ে গেছেন। এইসব বুদ্ধ্যাজীবদের সংহিতা আমাদের বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বহু ক্ষেত্রে আমরা তার অপব্যাখ্যা করে থাকি। যেমন, লিন-যু তাং বলেছিলেন, ছবি ও কবিতার উৎস এক। যদিও কথাটি সীমিত-অর্থে ব্যবহৃত

হয়, আসলে এর পরিধি বৃহত্তর। এটা সর্বমান্য, কবিতা ছবি এবং তাবৎ শিল্পের উৎস এক, অর্থাৎ মানুষের মনে, কিন্তু উৎস থেকে তারা স্বতন্ত্র খাতে বয়ে যায়; তাদের জগৎ, প্রকাশ ও অভিব্যক্তি পৃথক।

শিল্পে শিল্পে নৈকট্য সম্পর্কে চিন্তন দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। ছবি ও কবিতার নৈকট্য নিয়ে ইয়োরোপ বহু গবেষণা করছে। লোরাঁ ও সালভাতোর রোসার নিসর্গ-চিত্রের প্রভাব অষ্টাদশ শতকের নিসর্গ-কবিতায় প্রতিপন্নের চেষ্টা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, কবিতা কোথাও ছবি হয়ে গেছে কিনা, এমন প্রশ্নও উঠেছে কিন্তু নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেন নি যে, কোন্ বোধের ক্রিয়ায় কবিতা একেবারে রৈখিক-ছবিই হয়ে গেছে। স্যার সিড্‌নি কলভিন বলছেন, কীট্‌সের 'ওড অন এ গ্রিসিয়ান আর্ণ' লোরাঁর আঁকা ছবির একটি পাত্র দেখে লেখা। কীট্‌সের কবিতা এত স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, তা পড়লে আমাদের কল্পনায় একটি প্রতিরূপ আপনিই গড়ে ওঠে, লোরাঁর ছবির সঙ্গে তা মেলাবার প্রয়োজন ঘটে না। ছবি থেকে কবিতা ও কবিতা থেকে ছবি বহু হয়েছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নপূর্ণা যার ঘরে' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রেক্ষায় পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে নন্দলাল বসুর আঁকা একটি বিখ্যাত ছবি আছে। কিন্তু, সে ছবিতে ভারতচন্দ্রকে নয়, নন্দলালকেই আমরা পাই, নন্দলালের ব্যাখ্যা ভারতচন্দ্র থেকে সেখানে পৃথক। কবিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছবি থেকে যদি আবার কবিতা লেখা হয়, তখন সেই কবিতা একেবারে স্বতন্ত্র হবে। তেমনি, একই ছবির অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন কবি বিভিন্ন কবিতা লিখবেন। অনুপ্রেরণার ফলে কবিতা ছবিতে বা ছবি কবিতায় ফিরে যায় না। আলব্যের তিবোদে জানিয়েছেন, মালার্মের 'লা প্রে মিদি দুন ফন' লণ্ডনের চিত্রশালায় রক্ষিত বুশের-এর আঁকা একটি ছবির প্রেরণায় লেখা। মালার্মের কবিতায় বুশেরের ছবির জগৎ ধরা পড়ে নি। বুশেরের ছবি মালার্মের কবিতার সূত্রবিন্দু মাত্র, কবিতাটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। রেনে ওয়েলেক ও অস্টিন ওয়ারেন তাঁদের 'থিয়োরি অফ লিটরেচারে' বলেছেন, ছবি কবিদের বহু ক্ষেত্রে প্রেরণার কারণ হয়েছে, তার ফলে কবিতা ছবি হয় নি। ছবি দৃষ্টিগ্রাহ্য, কবিতা শব্দসঙ্কেত নির্ভর, গান শ্রুতিবাহিত। ফলে, সেভাবেই এগুলো গড়ে উঠেছে এবং এদের আবেদনও সেইভাবেই আলাদা হতে বাধ্য। মাইকেল এঞ্জেলোর সনেটে তাঁর

ভাস্কর্য সুলভ দার্ঢ্য নেই, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তাঁর কবিতা-সুলভ সুকুমার রমণীয়তা নেই। বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমের বিশেষ গুণ ও স্বতন্ত্র প্রকাশ ক্ষমতার জন্যেই একাধিক শিল্পী একাধিক শিল্পের মাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন। সব মাধ্যমে সব কিছু একই ভাবে বলা বা অনুভব করানো যায় না। ক্যাটাস্ট্রফিজম্ অনুসারে জীব-বিজ্ঞানে 'বকচ্ছপ' সম্ভাব্যতার সীমা স্পর্শ করে, কিন্তু শব্দ দিয়ে দেখানো-র ফলে এর ছবি শব্দ-নির্ভর, যা রবীন্দ্রনাথের আঁকা পশুপাখি নয়। অনেক লেখক শব্দ-প্রতিমাকে চাক্ষুষ করাবার জন্যে স্ব-সৃষ্ট চরিত্রের ছবি আঁকেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা সমান সার্থক হয় না। থ্যাকারের বেকি শার্প আমাদের কল্পনায় যে-ভাবে সৃষ্টি হয়, তাঁরই আঁকা ছবি তার সঙ্গে মেলে না।

রসেটি, ব্লেক ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ও কবিতা চরিত্রগত ভাবে আলাদা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার জগৎ ছবিতে আসে নি ; তাঁর ছবির জগৎ স্বনির্ভর। কবি শব্দ থেকে শব্দাতীত অনুভূতিতে যেতে পারেন ; আঁকিয়ে রূপ থেকে উজিয়ে মূলে যান, তাঁর প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ এবং প্রণিতি। কবি মনশ্চক্ষু দিয়ে অনেক কিছু দেখতে পারেন, কিন্তু ছবি আঁকেন যিনি, তাঁকে in terms of concrete material আঁকতে এবং দেখাতে হবেই। এই concrete medium এর নিজস্ব ইতিহাস আছে, যা অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের ইতিহাস থেকে আলাদা। ভাষা সৃষ্টির আগে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত মানের স্থাপত্য শিল্পের পরিচায়ক গ্রেট ইংলিশ ক্যাথিড্রাল যখন নির্মিত হচ্ছিল, সে সময় ইংরেজি সাহিত্যের নিজস্ব বিশেষ রূপ দানা বেঁধে ওঠে নি।

উনবিংশ শতক পর্যন্ত ছবির ধ্যান ধারণা অন্য রকম ছিলো। চূড়ান্ত কারিগরী দক্ষতাকে শিল্পের পরাকাষ্ঠা মনে করা হতো। আঁগ্রে, ডেভিড প্রভৃতির সময় দর্পণ-সদৃশ নাটকীয়তার শেষ পর্যায় দেখা গেছে। উনবিংশ শতক পর্যন্ত ছবির বর্ণনা-ধর্মিতা থেকে বর্ণনাধর্মী বহু কবিতা লেখা হয়েছে। শার্ল বোদল্যের হেন কবি মনে করতেন, বর্ণনাতেই ছবির সার্থকতা। ১৮৪৫ এ সালোঁর ইম্প্রেশানিস্টদের প্রদর্শনী দেখে তিনি লিখেছিলেন 'যথার্থ আঁকিয়ে তিনিই, যিনি আমাদের প্রাত্যহিক মুহূর্তের মহানতাকে কি ভাবে মূর্ত করতে হয় জানেন এবং অঙ্কন ও রঙের সাহায্যে আমাদের দেখান আমরা টাই ও চক্‌চকে জুতো পরে কত মহান ও কাব্যিক বনে যাই।' দেগা কথা-প্রসঙ্গে জর্জ মুর-কে বলেছিলেন, 'কদিন আগে

আঁগ্রের আঁকা একটি মেয়ের হাতের ছবি কিনলুম। দেখুন দিকি নখগুলো! সত্যি, প্রতিভার স্বাক্ষর একেই বলে। যে মানুষ এত সৌন্দর্য একটি মেয়ের হাতে দেখেছে, সে সারাজীবন সব কিছু ফেলে ঐ আঙুলের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে।' বলা বাহুল্য, আঁগ্রে ছিলেন রোমান্টিক এবং ছবি আঁকতেন ফোটোগ্রাফির মত বর্ণনাময়। গত শতক পর্যন্ত, ছবির ধারণা কি ছিলো, তা উক্ত দুই বরেণ্য দিকপালের উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। বর্ণনাত্মক কবিতা থেকে আঁকা ছবিতে, কিংবা বর্ণনাত্মক ছবি থেকে আঁকা কবিতায় পরস্পরের সম্পূরক উপাদান পাওয়া গেছে, একথা তা' বলে বলা যায় না সুবেদী জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবে ছবিতে ও কবিতায় আসে। কবিতায় এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়টের উক্তি 'Such memories may have symbolic value, but of what, we can not tell, for they come to represent the depths of feeling into which we can not peer...we find in our memory just a few meagre arbitrarily chosen set of snapshots that we do not find there, the faded poor souveniers of passionate moments. এলিয়ট poetic imagery বা কাব্যিক প্রতিরূপ সমষ্টির সম্পর্কে এ কথা বলেছেন। Imagery imagery মাত্র, তা painting নয়। কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কবিতাকে যখন sculpturesque বা আকর্ষধর্মী বলা হয়, তখন গ্রীক ক্ল্যাসিক ভাস্কর্যের সার্বিক নির্মিতির গুণ সমূহ অর্থাৎ শ্বেতমর্মরের স্নিগ্ধতা, প্রশান্তি, শুভ্রতা, স্থৈর্য, স্পষ্টতা, পরিণাহের তীক্ষ্ণতা মনে রেখে metaphor বা উপমা অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কবিতার coolness বা স্নিগ্ধতা ও ভাস্কর্যের স্নিগ্ধতা একেবারে আলাদা ব্যাপার। ভাস্কর্যের স্নিগ্ধতা প্রত্যক্ষ-স্পর্শগুণ সম্পন্ন, হাত দিয়ে ছুঁয়ে বোঝার জিনিস, কবিতায় আন্তর উপলব্ধি দিয়ে তা বুঝতে হয়। কলিন্‌স্‌-এর Ode to an Evening কে sculptured poem বলা হয় যখন, তখন স্বাভাবিক ভাবে বুঝে নিতে হয়, তা আমাদের জানা প্রত্যক্ষ ভাস্কর্য নয়, ভাস্কর্যের তুলনা-মূলক গুণ-সম্পন্ন কবিতা। তথাপি, যেমন স্নিগ্ধতা, তেমনি ভাস্কর্যের প্রশান্তি, শুভ্রতা ইত্যাদি কবিতায় তদ্রূপ নয়। বাংলায় 'চিত্রধর্মী' 'কবিতায় ছবি আঁকা' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এগুলোও কাব্যিকে প্রতিরূপ সমষ্টি, উপমা প্রভৃতি অর্থে

আসে। 'পাখির নীড়ের মত চোখ' কোনো ছবিতে ধরা অসম্ভব, এটি নিতান্তই কবিতার ব্যাপার। সরাসরি রূপসৃষ্টি এক কথা, ধ্বনি সমষ্টি দিয়ে রূপ সৃষ্টি আরেক কথা। একটিতে রূপ প্রত্যক্ষ, অপরটিতে রূপ শ্রাবণ-প্রতিরূপ। শ্রাবণ-প্রতিরূপের ব্যাখ্যা পাঠকে পাঠকে বা শ্রোতায় শ্রোতায় সমরূপ না-ও হতে পারে, এটি পরীক্ষিত সত্য। একটি মনগড়া জন্তুর বর্ণনা দিয়ে এক ঘর ছাত্রকে সেই জন্তুটি আঁকতে বলে সমাযোজন (Communication) বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কারো ছবির সঙ্গে কারো ছবিরই মিল নেই। শ্রাবণ-প্রতিরূপের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হয়েছে। আবেদন, মাধ্যম ও সমাযোজন ক্ষমতা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কবিতার ক্ষেত্রে ভাস্কর্যধর্মী, চিত্রধর্মী, গীতধর্মী ইত্যাদি, ভিন্নতর সমগুণ সম্পন্নতার দ্যোতনা হিসেবে তুলনামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আঁকিয়ে কোনো বস্তুকে রূপ, অবয়ব-সংস্থান (Structural form), অবয়ব সংস্থানের বিতত্তি (tension), পরিপ্রেক্ষিত, পরিতল গ্রথন (Surface Texture), আশপাশের বস্তুপুঞ্জের পারম্পরিক রঙের সম্পর্ক সহ দেখেন। কবি একই বস্তুকে অন্যভাবে দেখবেন। বাস্তবিক অর্থে, কবিতা ছবিতে আত্মবিলুপ্ত হয় না, কিংবা ছবি কবিতায়। শেক্‌সপীয়রের লেখাকে যখন 'বারোক্' বলা হয় তখন তুলনামূলক ভাবে 'বারোক্' ছবি হেন জটিলতা (intricacy), গভীরতা (depth), রহস্যময়তা ইত্যাদি বোঝায়। 'মোনালিসা'-কে নিয়ে কত কথাই তো বলা হলো, কিন্তু কথা দিয়ে কি সেই হাসি দেখানো গেছে! মোনালিসা ছবি দেখে দর্শক আলোর উচ্চাবচ উদ্ভাসন, কোমল ত্বকের স্পার্শন অনুভব করেন, তাকে অন্য মাধ্যমের দ্বারা সম-অনুভবে পাওয়া যায় না।

ভৌতবিজ্ঞানের বর্ণতত্ত্ব ও বিশ্লেষণ আঁকিয়ের কাছে শেষ কথা নয়। যাত্রার প্রারম্ভ-বিন্দু আছে, প্রকৃতির রঙবাহার আঁকিয়ের কাছে সেই প্রারম্ভ-বিন্দু ; অন্তিম নয়। বর্ণতত্ত্বে পর্যায়বাচী রঙ Primary, Secondary, Tertiary ছাড়াও Neutral colour আছে, আঁকিয়েকে তা জানতে হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক রঙ (physical colour) আঁকিয়ের প্যালেটে নেই। আঁকিয়ের রঞ্জক্ অন্য রকম, বহু ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের বিরোধ আছে। তা ছাড়া আঁকিয়ের প্যালেট সীমিত। তাই আঁকিয়েকে প্রাকৃতিক রঙের বিবিধ প্রতিনিধিমূলক রঙ তৈরি করে নিতে হয় যাকে বলে কার্যকর রঙ (functional colour)। প্রাকৃতিক রঙের সঙ্গে

সঙ্গে আঁকিয়েকে কার্যকর রঙ শিখতে হয়। কোনো বস্তু দেখার সঙ্গে আঁকিয়ের মগজে প্রাকৃতিক রঙের প্রতিনিধিমূলক কার্যকর রঙের সূক্ষ্ম অনুভূতি কাজ করে। অন্যের কাছে যা কচি কলাপাতার সবুজ, আঁকিয়ের কাছে তা লেমন গ্রিণের সঙ্গে একটু হুকার্স গ্রিণ একটু কোবাল্ট ব্লু ইত্যাদি। সমতল পটে গভীরতা ও ব্যাপ্তি আনবার জন্যে আঁকিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করেন। এই বিভ্রম কেবল মাত্র বস্তু সংস্থাপন বা পরিপ্রেক্ষিত দ্বারাই নয়, রঙ দিয়েও করতে হয়। সে ক্ষেত্রে সরাসরি প্রাকৃতিক রঙ তাঁর কাজে আসে না। রঙের এই ব্যাপার আঁকিয়ের পক্ষে ব্যবহারিক ব্যাপার এবং তা দক্ষতা-সাপেক্ষ। তাঁর অনুভূতি কবির চেয়ে এ ক্ষেত্রে ভিন্নতর। যেমন 'Tyger ! Tyger ! Burning bright' এ-কোনো বিশেষ রঙের কথা না বলেও যে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল রঙ এবং প্রতিমা আমাদের ধারণায় জাগ্রত করা হলো, ছবিতে তাকে তেমনি ভাবে ধরা সম্ভব নয়। 'মেঘেরা চীনাংশুক পতাকা ওড়ায়' এমন এক গভীর ব্যঞ্জনাময় অনুভূতি, যা একান্তই কবিতার নিজস্ব। কাব্যালঙ্কার অনুসারে এই সমাসোক্তি কবির নিজস্ব প্রেক্ষা। এই প্রেক্ষা দর্শকের মধ্য সমাযোজিত হয় এবং একটি ছবি-ও জাগায় কিন্তু তা আঁকিয়ের ছবি নয়, কবিতার ছবি। প্রকৃতির যে রূপান্তর (Transfiguration of reality) কবিতায় পাই, ছবিতে সেই প্রকৃতির রূপান্তর (metamorphosis of nature) আলাদা। শিল্পী মানসে যা ধরা পড়ে, তাকে অভিব্যক্তির জন্ম প্রকরণের মাধ্যমে গ্রহণ করতেই হয়। প্রকরণই শিল্প নয়, কিন্তু প্রকরণের মাধ্যম ছাড়া শিল্পের প্রকাশ সম্ভব নয়। ছবিতে রঙ আসে সন্নিবিষ্ট বস্তু বা রূপপুঞ্জের পারস্পরিক সম্বন্ধ হিসেবে। লিওনার্দোর মোনালিসা ছবির আকাশে যে আভা যা কখনো সবুজ, কখনো হলদে-সবুজ তা আমাদের চোখে-দেখা যে-আকাশ তার সঙ্গে মেলে না। এই আকাশের রঙ দিয়ে আলাদা আকাশের ছবি আঁকলে তা অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু মোনালিসা ছবির রঙের পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে যে রঙের-বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তাতে ঐ রঙই স্বভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। বত্তিচেল্লির 'প্রাইমা ভেরা' ছবিতে কালো পাতা আঁকা হয়েছে। এখানেও গোটা ছবির রঙের পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলেই কালো পাতা স্বাভাবিক হতে পেরেছে। ছবিতে এই ভাবে রঙের অদল বদল ঘটে থাকে সুকুমার রায়ের 'লাল গানে নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধের' মত।

রঙের দুই উপান্তে এই দুটি মহাবলী নিরপেক্ষ রঙ। চীনা কালো কালিতে আঁকা এক রঙা (monochromatic) নিসর্গ চিত্রে ধূসর থেকে কালো পর্যন্ত বিভিন্ন বিভিন্ন পর্দা দিয়ে তাবৎ দৃষ্টমান রঙের আবহ আনা করছে। সব রঙকে মাত্র একটি রঙের অসংখ্য বিভাজিত পর্দায় অনুভব ও বিশ্লষণ করার ক্ষমতা আঁকিয়ে আঁকতে আঁকতেই পান এবং শিক্ষিত-দর্শক তা চাক্ষুষ দেখে অনুভব করেন। হালকাতম ধূসর থেকে গাঢ়তম কালোর মধ্যে চীনেকালির যে পাঁচশ'টি বিভিন্ন পর্যায় ক্রমিক পর্দা হয়, তার সূক্ষ্ম অনুভূতি শব্দের বিকল্পে পাওয়া যায় না। কবিতায় যে সব বিশেষণ রঙের রকম ফের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, ছবিতে সেই সব খাটে না। আগে বলা হয়েছে, কবিতায় যা 'কলাপাতার সবুজ', আঁকিয়ে সেই সবুজকে বিশেষণ দিয়ে দেখতে পারেন না, তাঁকে দেখতে হয় প্যালেটের সঙ্গে মিলিয়ে, তাঁর রঙ লেমন গ্রিণে সামান্য হুকার্স গ্রিণ ও কোবাল্ট ব্লু। আবার, রোদ, ছায়া, বৃষ্টি, আলোর তেজ অনুসারে তাঁর কলাপাতার রঙও পালটে যাবে। কোন্ রঙের মাত্রা কতটুকু, সেটি তিনি তাঁর নিজস্ব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়েই স্থির করে নেন।

সব রহস্যের চাবিকাঠি মানুষের হাতে নেই বলে আপনাকে জানার প্রবল তাগিদ তাকে নিরন্তর অন্বেষায় অক্লান্ত রেখেছে। ছবি, কবিতা, গান এসবের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্ম-উন্মোচন ঘটে। যুগে যুগে মানুষ এক-এক শিল্পের আপাত সীমা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে চলে এই যাত্রায়, পূর্ববর্তী যুগের যেখানে শেষ, পরবর্তী যুগ শুরু হয় সেখান থেকে। এই ভাবে ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত থাকে। একই জায়গায় পড়ে থাকা ঐতিহ্যের অনুসরণ নয়। মানুষ ছবিতে প্রকৃতিকে চূড়ান্তভাবে আয়ত্ত করার পর বিংশ শতকের সূচনা থেকে সেই সীমারেখাকে উত্তীর্ণ হয়ে আধুনিক-ভাবনে প্রবেশ করেছে। দর্পণ-সদৃশ প্রতিফলনের সীমা পেরিয়ে মানুষ এখন ছবিতে স্ব-সৃষ্ট অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব প্রকৃতি নির্মাণে নিয়োজিত। ক্ষেত্র বিশেষে প্রকৃতি তার ছবির উপাদান হলেও প্রকৃতির ভূমিকা সেখানে সূত্রবিন্দু মাত্র। দীর্ঘকাল গাছের ছবিতে গাছকে গাছরূপে আঁকতে আঁকতে পিয়েৎ মন্দ্রিয়ান কাণ্ডের উর্ধ্বগ লম্ব এবং ডালপালার পাতিত গতির ভিতর দিয়ে জাগতিক কর্মকাণ্ডের স্থিতি অক্ষরেখায় চলে এলেন। দৃষ্টরূপ থেকে তিনি এভাবে অ্যাবস্ট্রাকশনে বা সার রূপে চলে এলেন।

দৃষ্টরূপের সমষ্টি থেকে তাঁর ছবিতে এলো মূল একক বা basic unit. ফলে তাঁর ছবি হয়ে উঠলো representative of basic ideals. কবিতায় এভাবে শব্দকে pure form বা alphabet এ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কবিতায় শব্দকে যিনি alphabet করবেন, আমরা এখনো সেই কবির অপেক্ষায় আছি। এই শতকে ছবির ভাষণ বদলে গেছে। এ বিষয়ে একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি ও এ দেশের পুরোধা আধুনিক আঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় 'I am hopelessly entangled in the spell that lines have cast all around me, the muse of poetry has left these quarters for good...I have almost managed to forget that there was a time when I used to write poetry. It is the element of unpredictability in art which seems to fascinate me strongly. The subject matter of a poem can be tracked back to some dim thought in the mind...while painting, the process adopted by me is quite the reverse. First, there is the hint of a line, then the line becomes a form. The more pronounced the line becomes the clearer becomes the picture to my conception'. (এই উদ্ধৃতির শেষ পংক্তি check-up করা গেল না। সম্পাদকের হাতে মূল লেখাটি না থাকায়, শোভন সোম যেমন উদ্ধৃতি দিয়েছেন punctuation-সমেত, তেমনি ছাপা হল; পাঠক বুঝতে পারলে বুঝে নেবেন : সম্পাদক) কবিতা ও ছবি কিভাবে আসে, বিষয়বস্তু কি ভাবে তৈরি হয়, সে বিষয়ে তাঁর উক্তি অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। ছবি আঁকতে বসে তিনি স্পষ্টই কবিতাকে ভুলেছিলেন। দুই শিল্পের approach ই যে স্বতন্ত্র তার জন্যেই শুধু নয়, দুই শিল্পের জগৎও স্বতন্ত্র বলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'ছবি'র ছড়াছড়ি, কিন্তু সে সব যে কবিতার ছবি, তা তিনি জানতেন। Illustration এবং Painting যে এক ব্যাপার নয়, প্রথমটি নির্ভরশীল এবং দ্বিতীয়টি স্বনির্ভর একথা ভালো করে জানতেন বলেই, তাঁর সমকালীন, Bengal School এর আঁকিয়েদের মত তিনি কাব্য, পুরাণ, ঘটনা, ইতিহাসে ছবির উপাদান বা চরিত্র খোঁজেন নি। তাঁর প্রতিটি ছবির চরিত্র একান্তই তাঁরই নিজস্ব সৃষ্ট। এমনকি নিজের লেখার illustration

এর ক্ষেত্রেও দেখি তিনি উৎকৃষ্ট illustration করতে চেয়েছেন। জ্যাকসন পোলোকের ছবিতে তাঁর আন্তর বিক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায় অস্থির দ্রুততায় ছড়ানো ইতস্তত রঙের মধ্যে। একের পর এক রঙের অসংবদ্ধ বুননের ভিতর দিয়ে প্রতিটি রঙের সংবেদন একে অপরকে ছাপিয়ে বুননের ভিতর দিয়ে প্রতিটি রঙের সংবেদন একে অপরকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। এক প্রচণ্ড নিষ্ঠুর গতিশীলতা তার বিরাট বিরাট ছবিতে দর্শক চাক্ষুষ করেন। তাঁর ছবির বিষয় এমনই এক ব্যাপার যাকে নামকরণ দিয়ে দেখা যায় না। উপরন্তু, তাঁর ছবির প্রতিটি বিন্দুতেই ছবির এমনই এক নিরবচ্ছিন্ন একক রয়েছে যে, তাঁর ছবির যে কোনো জায়গা থেকে একটি ছোটো টুকরো কেটে নিলেও সেই টুকরোটি ছবিই থেকে যায়। মার্ক রোটুকো এবং জেস্‌পার জোন্‌সের ছবিতে জ্যামিতিক ক্ষেত্রের দৃশ্যমান সংবেদন কিংবা ক্লাইনের ছবিতে অসি-সদৃশ তুলিচালনার দ্রুতি ও আলোছায়ার খেলা নিতান্তই ছবির ব্যাপার। অন্য মাধ্যমে এই ধরণের অনুভূতি আসে না। ছবি ও কবিতা কি ভাবে আসে, তাদের বিষয়বস্তু কি ভাবে দানা বাঁধে, তা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট। মনে রাখতে হবে যে, এটি অভিজ্ঞতা-প্রসূত উক্তি; এটি দার্শনিক নন্দনতত্ত্ববেত্তার মতামত নয়। আঁকার আগে শাদা পট আঁকিয়ের কাছে এক সমস্যা বিশেষ, যার সমাধান আঁকতে আঁকতেই তিনি আকৃতি, রূপান্তরণ, গঠন, রেখা, রঙ, রেখা রূপের বিততি সৃষ্ট কম্পোজিশন দিয়ে করেন। সেখানে বস্তু-সাদৃশ্য রঙ-সাদৃশ্য ইত্যাদি অতি গৌণ ব্যাপার। আজকের আঁকিয়ে নিছক ফর্ম, নিছক রেখা বা নিছক রঙের বাঁধাধরাকে অতিক্রম করে গেছেন। রেখার টানে রেখা আসে, রঙের টানে রঙ, রূপের টানে রূপ; এই আত্ম-উন্মোচনে কোনো পূর্বনির্দিষ্ট শর্ত থাকে না, সেখানে কাজ করে এক গভীর সুমিতির বোধ। গাছের অমুক সবুজ, আকাশের অমুক নীল এগুলো পায়ের বেড়ি, কেননা বিচ্ছিন্ন কোনো রঙ রেখা বা রূপ নয়, সব রেখা, সব রঙ, সব রূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ ওতপ্রোত ক্রিয়াশীল। আপাত-দৃষ্ট-রূপের অন্তর্নিহিত গঠন খুঁজতে গিয়ে আঁকিয়ে চলে যান সার রূপে, যে-ভাবে প্রকৃতির আপাতদৃষ্ট রূপের ভিতর দিয়ে সেজাঁ পেয়েছিলেন অন্তর্নিহিত ত্রি-গঠন,—শঙ্কু, বর্তুল এবং স্তম্ভক যার থেকে Cubism এর সূত্রপাত। মন্দ্রিয়ানের কথা আগে বলা হয়েছে। এই ভাবে আঁকিয়ে কোথা থেকে যে

কোথায় যেতে পারেন, তার শেষ বলা যায় না। ছবির উপাদান উপাদানের বাহ্যরূপ পেরিয়ে অন্য উপাত্তে চলে যায়। কবিতায়ও এই ব্যাপার ঘটে, তবে অন্যভাবে।

ছবিতে আকৃতির অশেষ ভাঙচুর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঘটে থাকে। প্রতিটি আকৃতিকে ভেঙে সামগ্রিক আকৃতির বিশেষ রূপ পৌছোনো যায়। কবিতার ক্ষেত্রে যাকে Form বলি, তাও নানাভাবে ভাঙা হয়েছে, বাক্যের গঠনও নানাভাবে হয়েছে, কমল হীরের মত এক একটি শব্দকে বিশদ দ্যুতিও দেওয়া হয়েছে। তথাপি কবিতায় 'গাছ' কে গাছ-ই লিখতে হবে এবং একটি কবিতা থেকে অন্য কোনো সম্পূর্ণ কবিতা কেটে বার করা যাবে না। এটি কোনো অপগুণ নয়। এক একটি শিল্প নিজের জোরেই স্বতন্ত্র, স্ব-নির্ভর, অন্য শিল্পের আঙিনায় দখলদারিও করতে আসে না।

ক্রোচে স্বজ্ঞা (intution) কে শিল্পের চাবিকাঠি বলেছেন কিন্তু ক্রোচের আগে পরেও অনেক নন্দনতত্ত্ববেত্তা আছেন। পক্ষান্তরে টি. এস. এলিয়ট শিল্পের ব্যাপারে শিক্ষার কথা বলেছেন। মহৎ শিল্পে বোঝাবুঝির ব্যাপার আছে। মল্লার এবং নটমল্লার কি পার্থক্য, তা কেবলমাত্র স্বজ্ঞা দিয়ে বোঝা যায় না। মানুষ স্বজ্ঞার কারণেই শিল্প-প্রবণ হয়, কিন্তু শিক্ষা স্বজ্ঞাকে পরিশীলিত করে প্রজ্ঞাতে পরিণত করে। নিজের আন্দাজে কোনো শিল্প বুঝে নেওয়া যায় না, তাহলে ব্যাপারটা অন্ধের ছবি দেখার মত প্রহসন হবে। কবি, আঁকিয়ে, গাইয়ে হতে গেলে যেমন, তেমনি রসবোদ্ধা হতে গেলেও প্রথমে স্বজ্ঞা চাই, কিন্তু তার উপর সব ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষা অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, কোনো শিল্পে নিজেকে পূর্ণতর করার চেষ্টাই শিক্ষা। এই শিক্ষাই আলো-বাতাস-বিস্তার যার সাহায্যে মানুষ দক্ষতা ও বোধকে প্রসারিত করতে পারে। ছবির নিয়মে (discipline) এই তত্ত্ব কখনো উপেক্ষিত হয় নি।

শোভন সোম

[লেখকের বক্তব্য: শ্রীযুক্ত শোভন সোম আমার আলোচনাটির সূত্র ধরে যে ফিরতি আলোচনা করেছেন তা আবার প্রমাণিত করলো যে শিল্প-বিচারে তিনি সেই 'কলেজী শিক্ষারই' দ্বারস্থ হয়েছেন; তাঁর জ্ঞান নিশ্চয়ই

অর্বাচীনের নয়, কিন্তু তা যে তথাকথিত 'কলেজী শিক্ষা-প্রসূত' এই লেখা পড়ে এবম্বিধ ধারণা করা কি অন্যায় হবে। তাছাড়া, অধ্যাপক শোভনবাবু 'কলেজী-শিক্ষাকে' 'অর্বাচীন জ্ঞান' বিতরণের ক্ষেত্র মনে করেছেন, তাহলে শিক্ষকরা কি 'অর্বাচীন জ্ঞান'ই বিতরণ করছেন? এই ক'এক পৃষ্ঠা রচনার প্রচুর উদ্ধৃতি এবং অজস্র কবি, শিল্পী, সমালোচককে তিনি এনে অহেতুক ভীড় জমিয়েছেন, যে ভীড়ে শোভনবাবুর নিজস্ব বক্তব্যকে আর খুঁজে পাচ্ছেন না পাঠক। আলোচনাটি হয়ত ছাত্রদের পরীক্ষার সময় কাজে লাগবে, উদ্ধৃতিগুলির জন্য। শুধু তাই নয়, শিল্প-বিষয়ে তাঁর চিন্তা যে এত এলোমেলো, অগোছালো এবং পরমুখাপেক্ষী তা এই নিবন্ধটি পড়বার আগে আমাদের জানা ছিল না। আমার মূল বক্তব্য ছিল 'মহৎ শিল্প বোঝাবুঝির ব্যাপার ততটা নয়, যতটা intuitive...কবির কাছে কবিতার ছন্দের কান তৈরী হয়ে যায় আপনা থেকেই। শিল্পীর কাছে রঙের সামান্যতম পার্থক্যও সেই নিয়মেই ধরা পড়ে'—শোভনবাবুর পুরো আলোচনাটিতে কোথাও আমার এই বক্তব্য খণ্ডিত হয় নি। তবু, তাঁর শেষতম বক্তব্যটির 'পর তিনি জোর দিয়েছেন—বোধ হয় এখানেই তিনি আমার বক্তব্যের ব্যঞ্জনা কি হতে পারে তার একটু আভাস ধরতে পেরেছেন। শোভনবাবু বলছেন, 'নিজের আন্দাজে কোন শিল্প বুঝে নেওয়া যায় না।' তাহলে উনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে গাছের উঁচু ডালে বসে নীচু ডালটি নিজেই কেটে ফেলছেন। সবাই তো একথা জানেন, রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র 'নিজের আন্দাজেই' স্ব-সৃষ্ট শিল্প বুঝেছিলেন। কারো কাছে প্রত্যক্ষ হাত পাতেন নি। কোন প্রচলিত শিক্ষা বা ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হন নি। শোভনবাবু একটু জোরের সঙ্গেই আবার বলেছেন, 'মহৎ শিল্পে বোঝাবুঝির ব্যাপার অবশ্যই আছে'। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে 'বোঝাবুঝির' ব্যাপার কোথায় আছে? শিল্প-রচনায় তিনি বা কোন্ প্রচলিত শিক্ষা লাভ করেছিলেন? তাঁর ছবি যে সোজা গিয়ে আমাদের বুকে ধাক্কা মারে। এ ছবি বুঝতে হয় না ক্রোচে বা এলিয়ট পড়ে; সরাসরি রসিক দর্শকের মনের অন্দরমহলে ঢুকে যায়। এমনকি ষোড়শী বালিকারও শরীর, রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি দেখতে দেখতে, শিরশির করে ওঠে। একেই শিল্পশাস্ত্রে বলে, 'immediacy of appeal', মুহূর্তমধ্যে শিল্পের আবেদন পৌঁছে যায় দর্শকের কাছে, যেন বিদ্যুতের ত্বরিৎগতি; বলা বাহুল্য, এই জন্য

সব শিল্পীর ছবিতে বর্তায় না। আমি, আবার বলি, শিল্প ব্যাপারটিকে, তা কবিতাই হোক, ছবিই হোক, গানই হোক, 'বোঝাবুঝির ব্যাপার' মনেই করছি না। মহৎ শিল্প নিছক 'বোঝাবুঝির' থেকেও অনেক দূরের বিস্তার। উক্তি দিলে আমার লেখাও বহু পৃষ্ঠা গড়াবে এবং নিছক পণ্ডীতিপনা হবে—আমি তা থেকে বিরত থাকলুম এই কথা বলে যে প্রকৃত শিল্পী একটা 'বোধি' দ্বারা পরিচালিত হ'ন, আক্রান্ত হন, যে 'বোধি' intuition এর কাছাকাছি, এবং যা 'নিজের আত্মাকেই' তিনি ধারণা করে নেন। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে, অপূর্ববস্তুনির্মাণের কথা, বড় শিল্পীর কাছে intuition দ্বারা শুধু শিল্প বোঝা সম্ভব তো বটেই, এমনকি সম্ভব অপূর্ববস্তুকে নির্মাণ করাও, অপূর্ব-বস্তুর নির্মাণে স্রষ্টা এবং প্রজ্ঞার ধ্যান এক হয়ে যায়। অবন ঠাকুর 'নিজের আত্মাকেই' নিজের ছবির ধারণা করেছেন, 'কাটুম কুটুম' কল্পনা করেছেন, বড় বড় শিল্পীদের কাছে তাঁকে এজন্ত অন্তত হাত পাততে হয় নি, তথাকথিত 'পণ্ডিত' হতে হয় নি। প্রকৃত শিল্পী 'sets his own standard', সেখানেই তিনি স্রষ্টা, সকলের থেকে সেজন্তই পৃথক অবন ঠাকুর।

এবার সঙ্গীত বিষয়ে শোভনবাবুর একটি অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যের প্রতিবাদ না করে পারছি না। প্রথমত নিছক 'মল্লার' বলে কোন রাগ বর্তমান কালে আমাদের জানা নেই, হয়ত শোভনবাবু জানেন। মধ্যযুগে মল্লারিকা, মল্লারী, মল্লার ইত্যাদি ছিল। কিন্তু যুগ পরিবর্তনে, রস-বৈচিত্র্যের এবং সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে সেই সব নিছক 'মল্লার'-নামীয় রাগ বর্তমানে লুপ্ত। কেন লুপ্ত তা গবেষণার বিষয়। এখানে সে আলোচনা নিরর্থক। তাহলে কি শোভনবাবু 'শুদ্ধ মল্লার' বোঝাতে চেয়েছেন। তাহলে বলি, নিছক 'মল্লার'-এর মত নিছক 'কল্যাণ' বলেও কোন রাগ বর্তমানে নেই, রয়েছে অবশ্য 'শুদ্ধ কল্যাণ'। কিন্তু মজা এই, 'শুদ্ধ কল্যাণের' মত 'শুদ্ধ মল্লার' বলেও কিছু বর্তমানে প্রচলিত নেই। তাহলে উনি চতুর্দশ মল্লারের কোন্ মল্লারকে বোঝাতে চাইছেন? এই আমার প্রথম বক্তব্য। যদি ধরে নিই 'মল্লার' বলতে উনি 'মিঞা-কি-মল্লার' (বোধহয়?) বোঝাচ্ছেন, যা সবচেয়ে জনপ্রিয়, এবং রেডিও খুললেই শোনা যায়, তাহলে বলতে বাধ্য হবো যে, শোভনবাবু-কথিত 'মল্লার' অর্থাৎ 'মিঞা-কি-মল্লার' এবং 'নটমল্লার' এই দুটি রাগের স্বর-কাঠামোতে এবং ভাবরূপে এতই পার্থক্য,

বিশেষত, নটমল্লারের পূর্বঙ্গে নট রাগের প্রভাব, বিলাবল অঙ্গের শুদ্ধ গান্ধারযুক্ত, এবং মিঞা-কি-মল্লারের পূর্বাঙ্গে কাফি অঙ্গের, কোমল গান্ধারযুক্ত, প্রভাবের ফলে দুটি রাগে এত আকাশপাতাল প্রভেদ যে, যে-কোন রসিকের কানে তা মুহূর্তে ধরা পড়বে, এমন কি প্রয়োজন নেই বিশেষ intuition-এরও ; 'এক্সপেরিমেন্টাল সাইকলজি অব মিউজিক'ও সেকথাই প্রমাণ করছে হাল আমলে।

শোভনবাবু, বলেছেন : 'কবিতায় গাছকে গাছই লিখতে হবে'। সবাই জানেন, স্ব স্ব লক্ষণ অনুযায়ী, শব্দের দ্বিবিধ প্রয়োগ, অভিধা এবং ব্যঞ্জনা। অভিধা অনুযায়ী গাছের পরিবর্তে বৃক্ষ, তরু, দ্রুম, পাদপ, শাখী বিটপী, মহীরুহ (বিরাট গাছ হলে) প্রভৃতি শব্দগুলি যে কবিরা ব্যবহার করেন তা কি শোভন বাবুর অজ্ঞাত। ইংরেজীতে একেই আমরা বলে থাকি synonymous words, কোন্ ভাবনায় কবির কাছে কোন্ সমীপবর্তী শব্দটি বেশী কার্যকরী (effective) হবে লাবণ্যযোজনার জন্য এটিই কবির কাছে জরুরি ('লাবণ্যযোজনম্' শব্দটি অবশ্য কামসূত্রের টীকাকার যশোধর পণ্ডিত ব্যবহার করেছেন ; দ্র. 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' : অবনীন্দ্রনাথ-রচিত), 'গাছ' লেখবার কোন প্রয়োজনই নেই। অবার ব্যঞ্জনা লক্ষণ ধরলে গাছকে একজন কবি কী চোখে দেখছেন কী আন্তরভাবনায় মণ্ডিত করছেন সেই অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করবেন। বস্তুত প্রতীকীবাদের উৎস এখানেই। ধরা যাক, একটি গাছকে কবিরা কত বিভিন্ন ভাবে অনুভব করতে পারেন : প্রাচীনতা, স্তব্ধতা, নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, শৈশব, বার্দ্ধক্য, এমন কি ধ্যান এবং বিশুদ্ধতার প্রতীকেও আনতে পারেন। এই প্রসঙ্গে কবি অমিয় চক্রবর্তীর অতি পরিচিত 'গাছ' কবিতাটিই ধরা যাক্। এই কবিতাটির ২৪টি পংক্তিতে 'গাছ' শব্দটি একবারও টেনে আনতে হয় নি কবিকে, কারণ তিনি জানেন, কবিতা লেখা স্কুল কলেজের রচনা লেখা নয়। কবি বলছেন : 'বিশুদ্ধ তাকেই দেখো, মন', অর্থাৎ 'গাছ' শব্দটির পরিবর্তে 'বিশুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—এখানে গাছ শুদ্ধতার প্রতীক। পরে আবার বলেছেন : 'সর্বহীন / আছে তবু সর্বমাঝে, চেতনায় হয়েছে সে লীন'। এখানে গাছকে পরম অস্তিত্বের সঙ্গে চেতনায় একাত্ম করে বিধৃত করেছেন, গাছকে 'সর্বহীন' বলেছেন। এমন কি একটি নেতিবাচক ধারণাকে অস্তিবাচক ধারণায় কী অনায়াসে রূপান্তরিত করেছেন। এখানে 'গাছ' শব্দটি কোথায় ?

যে-সব কবির ক্ষমতা আছে, অনুভাবনার দীপ্তি আছে, এক সবুজের কত বিচিত্র রঙ, এর স্তরভেদ তাঁদের কাছে টানে সেই সকল কবিরাই, সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা সামান্যতম পার্থক্যতেই শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট-চিহ্নিত করতে জানেন। এই ইঙ্গিত দ্বারা ব্যঞ্জনার উপস্থাপনাই সকল শিল্পের প্রাণবস্তু, শিল্প-মাধ্যমে যতই পার্থক্য থাক। যাঁরা শিল্পদর্শন বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তাঁরা একথা সহজেই বুঝবেন। শিল্প-মাধ্যম নিয়ে কচকচি তাঁরাই করেন যাঁরা শিল্পের অন্তর্লীন রসবস্তুর সন্ধান জানেন না।

শেষ নিবেদনে জানাই, আমার বক্তব্য ছিল, 'ছবি ও গান দুটিই কাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে যেমন হতে পারে আরও হাজার রকমের ব্যাপার স্যাপার'। গোস্বামীবাবু যদি আমার এই অতি সাধারণ বক্তব্যটি বুঝতে না পেরে থাকেন, তাঁকে অনুরোধ করবো Ian Jack প্রণীত 'Keats and the Mirror of Art' বইটি পড়ে দেখতে। দীর্ঘ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে জ্যাক সাহেব প্রমাণ করেছেন, কীটসের প্রথম শ্রেণীর বহু কবিতার অন্তরালে রয়েছে, প্রত্যক্ষভাবে, ইউরোপের প্রধান প্রধান চিত্রশিল্পী এবং ভাস্করদের কাজকর্ম। অবশ্য জ্যাক সাহেবের প্রতিবেদন মানতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু, তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলি ঐতিহাসিক গবেষণা-প্রসূত, সেগুলি অস্বীকার করি কী করে? বৃটিশ মিউজিয়ামে শিল্পী হেডন এর সঙ্গে দিনের পর দিন কীটস্ গিয়েছেন 'Elgin Marbles' দেখতে। (Lord Elgin-এর নামানুসারেই Parthenon Marbles' এত স্মরণীয় হয়ে আছে)। কবি কীটস্ এর কাছে চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্য কত জরুরি ছিল তা কীটস্ এর জীবনী-পাঠে জানা যাবে। এবং গানও। সিডনী কলভিন জানিয়েছেন, 'Ode to Nightingale' কবিতাটি ফ্যানী ব্রনের সঙ্গীতের বিষাদময় রূপায়ন মাত্র, এবং প্রত্যক্ষ অনুভাবনা-সঞ্জাত। ইতি

অরুণ ভট্টাচার্য

ভিসেন্তি আলেইকজান্দ্রে

আমাদের কাছে এক অপরিচিত নাম মাত্র, অথচ ভিসেন্তি আলেইকজান্দ্রে একজন স্প্যানীশ কবি। একটি বিশিষ্ট জেনারেশনের উল্লেখযোগ্য কবি। ১৯৭৭ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত কবি আলেইকজান্দ্রে। তাঁর কবিতা এখনো মূল থেকে অনূদিত হয় নি। সুতরাং তিনি বিদেশী কাব্যানুরাগীদের কাছে নিতান্ত এক আগন্তুক মাত্র। কিন্তু তবুও যাঁরা তাঁর কাব্যের রস উপলব্ধি করেছেন তাঁরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছেন।

১৮৯৮ সালের স্পেনের স্যাভাইলের এক স্বচ্ছল পরিবারে ভিসেন্তি আলেইকজান্দ্রে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি রুগ্ন, যার ফলে প্রচলিত জীবনচর্যার অন্তর্গত কোন নিয়মের মধ্যে তিনি বাধা পড়েন নি। তাঁর জীবনে কোন বৃত্তিকেই পাকাপাকি গ্রহণ করেন নি। তিনি মুক্ত। বুঝি বা বিষণ্ণ।

একদা স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রতি আলেইকজান্দ্রের সহানুভূতি ছিল বলেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। তখন থেকেই তাঁর মনে একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে মানুষের অবস্থা বিশেষ এক পরিমণ্ডল রচনা করে। তিনি রচনা করেন 'সোমব্রা দেল প্যারাইসো' কাব্যগ্রন্থ। এই রচনায় তিনি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে বিশদ ভাবে সনাক্ত করেছেন। এখানে বিশ্বের মানুষ নির্বাসিত। সে অবশ্য আদি যুগের জন্য শোকাকুল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ; এস্পাদাস কোমোলাবিওস (১৯৩২), লা দেস্ত্রাকচন ও এল আমোর (১৯৩৫), এল মান্দোসোলাস (১৯৫০) পোয়েজিয়াস কম্পলিতস (১৯৬০), ভেজেনসিয়াস (১৯৬১)।

আলেইকজান্দ্রের কাব্যের মূল সুরের মধ্যে আঙ্গিক ও উৎকর্ষ যেন স্যুর রিয়ালিজমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হয়। কবি এখানে ব্যক্তিগত ভাবে স্বীকৃতি দানও করেছেন যে তিনি আদি বিশ্বের বিশৃঙ্খলার ভঙ্গী সৃষ্টি করার জন্য কাব্য রচনা করেন। জন্মলাভ করছে এমনি অবস্থার অবচেতনা থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মনের গহন গভীরে এক দুরতিক্রম্য জগৎ থেকে

জীবনের মূল দর্শনকে আহরণ করেন তিনি। তারপর পার্থিব জগতের সম্মুখে এক কাব্যময় দেহ নির্মাণ করে La evasion hacia el fondo কবিতায়।

১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে রচিত Ambits কাব্যগ্রন্থে প্রচলিত রীতির কাব্যিক গঠনকৌশলকে অনুসরণ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে নিখিল বিশ্বের অখণ্ডতার ভাবাবেশ ও উত্তেজিত দৃষ্টিভঙ্গী নেই; বরং এক বিচ্ছিন্ন অবস্থার প্রতিমা, ছায়ামূর্তির রুদ্ধশ্বাস, উর্বর এবং সুবিন্যস্ত সমাবেশকে প্রত্যক্ষ করা যায়। স্পেনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি রুবেন দারিওৎ'র কাব্যের শব্দগত উপাদান, ধ্বনির উত্থান পতন এবং ছন্দের প্রতি আলেইকজান্দ্রে গভীর ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। তখনই তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ের সুরু। তিনি অনুভব করেন এক নিকারাগুয়ান কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকের বিস্ফোরণ-জনিত আঘাত। ১৮৯২ সালে একদা প্রথমবার স্পেনে দর্শনের শেষে দারিও অনুভব করেন, স্পেন তাঁর কাব্যকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বস্তুত, দারিওর পূর্বে স্পেনের কাব্যজগৎ নিস্তরঙ্গ ছিল।

আলেইকজান্দ্রের কাব্যে গৃহযুদ্ধ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় নি। বরং তা সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর অতীতের মধ্যেই। নিজের স্মৃতির কাছে যা অগ্রাহ্য সেই কুমারী-সুলভ ইডেনের অবাধ আনন্দ এক অদ্ভুত গূঢ় কাতরতার পরিবেশ রচনা করে। তিনি 'সোমব্রা দেল প্যারাইসো' কবিতায় বিশেষভাবে সেই চিত্রকে তুলে ধরেন, যেমন:

> 'দৃষ্টিপাত করেছি পুষ্পস্তবকের অন্তরে,
> উজ্জ্বল উপত্যকায়, পরিবর্তনশীল ডানায়,
> এবং উড্ডীয়মান এক বর্ণাঢ্য পালকে
> প্রদীপ্ত উপহারে যা
> আমাকে প্রমত্ত করে।'

Historia del Corazon ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে রচিত। আলেইকজান্দ্রে এখানে দেহের সূক্ষ্ম বর্ণনার বৃহৎ ঐকতান সৃষ্টি করেছেন। বিশেষতঃ 'Ambits' এর পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর আনুগত্য যেন আবেগপ্রবণ এক কল্পনার জগৎকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, যেমন 'Vagabundo Continuo' কবিতায়:

এখানেই রয়েছে স্তন, উদর
সুডৌল উরু, সুগঠিত চরণ এবং
ওপরে কোমল স্কন্ধ, অভিজাত গ্রীবা
সম্প্রতি অবনত।"

আলেইকজান্দ্রে নিজের মন, অনুভূতি ও সত্তার সম্মিলনের মধ্য দিয়ে রচনায় নিজেকে প্রকাশিত করেন। তখন মনে হয় এ যেন উত্তেজিত অবস্থার এক পুঞ্জ বিশেষ। এখানে অবশ্য যা কিছু পবিত্র এবং অমার্জিত তা অঙ্কুর অবস্থায়ই তাঁকে অবসন্ন করে রাখে। তখন তিনি প্রত্যক্ষ করেন রহস্যময় ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের রূপান্তর। কবির ধারণা, অচিরেই তাঁকে কেউ বিস্মৃত শব্দের দ্বারা তৎপর করে তুলেছে। তাঁর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করে তাসের বিশৃঙ্খলার এক অশ্ব-প্রতিমা এবং ভবিষ্যদ্বাণী। সেখানে আকাঙ্ক্ষার চিত্র যেন দ্রুত ধাবমান। "Fuga a Caballo" কবিতায়

অন্য এক সাম্রাজ্য,
ভালবাসতে বীরোচিত সামর্থ্য,
সব বাক্সের এক অপূর্ব প্রহরী
আদিম ছাপের কাছে বিষণ্ণ।
অঙ্গুরীয়ের অনুভূতিতে গোলাপ
যেন বিপর্যস্ত জাহাজের পাশে এক
মুক্তির সেতু বিচ্ছিন্ন।

কবির মধ্যে ক্রমে যে বিশ্বাস দেখা দিয়েছে তাহলো ভালবাসাকে একীভূত করার সামর্থ্য। সুতরাং স্যুররিয়ালিষ্ট রীতিতে বস্তু এবং প্রাণীর নির্মম দ্রবীভূত অবস্থাকে ব্যাহত করা হয়। বিশেষ করে 'El Mundo esta'bien hecho' কবিতায় কবি এক তীব্র আর্তনাদ অনুসরণ করে চলেন। ঝিঁঝিঁ পোকা এবং ফণীমনসার 'আমাকে ভালবাসে' ঐকতানের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে সর্প উচ্চারিত হিস্ হিস্ চীৎকার 'মর্ মর্'। তখনই যে সত্য আবিষ্কৃত হয় তা হলো এ বিশ্ব সত্যিই সুনিপুণভাবে নির্মিত।

'Pasion de la tierra' এবং অন্যান্য রচনায় আলেইকজান্দ্রে চাবুক ছোরা ও দন্তের পুনরুদয় ঘটিয়েছেন; বিশেষ করে নির্মম বিশ্ব 'যেখানে বিভাজিত ও

প্রত্যাখ্যাত। সেখানে এই বিশ্বই গল্পের ভবিষ্যদ্বাণী রূপে বিরাজমান। প্রসঙ্গতঃ 'Muerte O antesala de Consulta'-র রহস্যময় চরণে প্রদর্শিত হয়েছে উদ্ভট কল্পনার অনুরূপ প্রতিমা। ক্রমে সেই অবস্থা পরিবর্তনশীল সমতল ক্ষেত্রের অনুপ্রাণিত অনুক্রম, খেয়ালী পরিবেশ, অদ্ভুত প্রমাণার্থ প্রকল্প যেন আকস্মিকভাবে সাধারণ বিবরণ রূপে প্রতীয়মান হয়।

'কুয়াসায় গুরুত্বপূর্ণ সময় সমীপবর্ত্তী
আবরণ উন্মুক্ত কমলা সাগরে হেলানো প্রকোষ্ঠ
আমরা তিরস্কার দেখে অস্ত্রছাড়া করব
যদিও কব্জিতে আমাদের
স্পন্দন অনুপস্থিত।
সমুদ্র তিক্ত, তোমার চুম্বন আমার পাকস্থলীর
বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ
সময় সমীপবর্ত্তী।
কপাট উন্মোচিতপ্রায়। শোকার্ত্ত পীত
অনুশোচনা অসাড়তায় পরিবর্ত্তিত।
তোমাকে কোথায় পাব? হে জীবনদেবতা—জীবনের
কি উদ্দেশ্য!
যদি সময় না থাকে।
প্রতিটি আত্মা যীহোভার কণ্ঠস্বরে
দীপ্তিমান শব্দের প্রতীক্ষায়।
প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পর সেই নাম স্মরণ করে
চুম্বনে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো।
রুমালগুলো মাদকতায় পূর্ণ
নিস্তেজ রক্ত যখন অবরুদ্ধ।
সাতটা বেজে দশ। কপাট পক্ষহীন, তবু
উড়ে গেল। যেন প্রভুর দেবদূত
ঘোষণা করে মেরী।
যে প্রথম সেই একমাত্র অন্তরে প্রবেশলাভের অধিকারী।'

আলেইকজান্দ্রে সত্তা এবং উদ্ঘাটিত রহস্যের উপলব্ধি করে পাঠককে তার নিষিদ্ধ বিবেচিত প্রবৃত্তি থেকে অভ্যাসগত বিরতির পর বিশোধিত মানসিকতা নিয়ে এক জটিল বিশ্বে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। বস্তুতঃ Muerte' এবং 'Rio' কবিতা আমাদের মধ্যে যে প্রতিমা স্পষ্ট করে তা হলো এক পরিবর্ত্তনশীল সমতল ক্ষেত্রের দ্রুতগামী কণ্ঠস্বর। এবং তখন বিবর্ত্তনশীল আকৃতির বিশ্বের মধ্য দিয়ে তাঁকে নিজের পথকে বেছে নিতে হয়েছে। সেখানে হস্ত আকস্মিক-ভাবে পর্বতে রূপান্তর লাভ করে। যেমন 'Resaca' কবিতায়, এমন কি 'Blancura'-য় আলেইকজান্দ্রে দেখিয়েছেন উন্মুক্ত ক্ষতস্থান মৌমাছিতে রূপান্তরিত; একটি গোলাপ যেন গতিশীল হয়ে অধিবোধগম্য বাস্তবতার জগতে প্রবেশ করে :

বিশ্বকে ডিমের কুসুম স্পর্শ করে,
গতকাল উন্মুক্ত ক্ষত মৌমাছি হয়েছিলো
আজ গোলাপ, যা ছিলো
অবিচ্ছিন্ন।

পার্থিক আবেগসহ আলেইকজান্দ্রে রমণীর দেহকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত করেন। রমণীর দেহ তখন দক্ষিণ স্পেনের উষ্ণ মৃত্তিকার প্রদর্শিত এক মোহনীয় ভূ-চিত্র। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় ক্রুশের মতো এক দুঃশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন মন! স্বাভাবিক ভাবে রমণীর বাহু এবং পদ চালু করে ঈষৎ ছড়িয়ে :

পশ্চাৎপটে তোমার দেহ আমাকে
স্পর্শ করে
ভূমি-সদৃশ দক্ষিণের ভূ-চিত্র যেন
ক্রুশের মধ্যে উন্মুক্ত।

কবি এখানে রমণী দ্বারা একদিকে সম্মোহিত এবং উপেক্ষিত। তখন দৃষ্টিভঙ্গী সহজ হয়ে আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রূপ ধারণ করে, 'দিগন্ত' 'জৈবদেহ'। আলেইকজান্দ্রে রমণীর দেহের চেয়ে অন্য কিছুই প্রত্যক্ষ করেন নি। বস্তুতঃ তার চোখ যা দেখেছিলো তাঁর হাত যা পরীক্ষা করেছিলো। এমন কি রাত্রিতে তিনি

তার বাহু নিমজ্জিত করে রেখেছিলেন। 'Materia' কবিতায় তিনি অনুভব করেন নারীমাংসের মধ্যে অঙ্গুলীর আহার।

'আমি রাত্রির অন্ধকারে ডুব দিয়েছি
বাহু নিমজ্জিত রাত্রের নিমিত্ত
আমি আঙুলের মধ্যেই
তোমার সান্নিধ্য খুঁজেছি, এসেছি
তুমি তখন মূর্ত্ত।'

আলেইকজান্দ্রের বিশ্বাস 'প্রয়োজনে প্রতিটি শব্দই হয়ে ওঠে কাব্যিক।' তাই অশুভ লক্ষণ হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করেন যে প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি অনুক্ষণ সক্রিয়। 'পাঁজ ষ্য লা তিয়ারা' কবিতায় তিনি বলেছেন 'না আমি একটি শব্দকেও রক্ষা করব না।' অবশ্য সঙ্গীতের মূর্ছনার প্রান্তিতে সেখানে শব্দের ওপর দু'বার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'লাৎ পালাব্রা' কবিতায় তিনি সমগ্র দেহ নিয়ে এক অদ্ভুত প্রতিমার কল্পনা করেছেন। তার মুখ দিয়ে অনর্গল ধূম নির্গত হচ্ছে। যেন দ্রুত শব্দের স্রোত অথবা ধাবমান মুহূর্ত, যা থেকে আবার গতিপথ বদল করার তৎপরতা বেড়েছে। তখন ভাবনায়

বিদীর্ণ অনন্তকাল হিমশীতল স্বপ্নে
জীবন মুহূর্ত্ত মাত্র যেন বলা যেরী
নীরবতা, শুভ্রতা, যে রক্তবর্ণ এখনো সৃষ্টি হয় নি
সেই চুম্বনের স্পর্শ জলের গভীরে
অনুভূতি শূন্য তার সেখানে
দেহ বা তরঙ্গ; সমুদ্র অথবা শেষ প্রান্ত ভাঙছে।

এই অদম্য আবেগপ্রবণতা বারবার আলেইকজান্দ্রেকে বস্তু ও প্রাণীর সূচী আবৃত্তি করতে বাধ্য করেছে। সেখানে এই প্রাণীর সঙ্গে এই নিখিল বিশ্বের সম্পর্ক ও যোগাযোগ যেমনি বর্ত্তমান তেমনি ঘনিষ্ঠ। 'লা পালাব্রা' কবিতায় কবি নিজেকেই যেন দর্শন করেন অদ্ভুতভাবে। ক্ষুদ্র শামুকের চেয়ে তাঁর বিস্ময় এবং উত্তেজনা যেন সৃষ্টির পরিপূর্ণ জটিলতায় পরিবেষ্টিত। এই অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করা যায় কবিতার চরণে :

লৌহ হস্ত তৃণোপরি একটি হৃদয়
বিস্মৃত খেলনা, একটি ঝরনা, একটি মন্থন যন্ত্র,
একটি চুম্বন, এক টুক্‌রো গ্লাস।
তার মধ্যে প্রবাহিত সুর
আমি তা প্রত্যক্ষ করি সমুদ্র, সাত সমুদ্র
এবং অনাদি অনন্ত—

আলেইকজান্দ্রে মূলতঃ মুক্তির কামনায় আবিষ্ট ছিলেন। 'লিবারেতেদ' কবিতায় স্বাধীনতার প্রতি তাঁর মানসিক উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। তাঁর কাছে দেহ ও মনের অবাধ স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র ধ্যান। তখন তাঁর মধ্যে যে উপলব্ধি ঘটে তা হলো অন্তর্জগতে এক অদ্ভুত কল্পনাময় বিশ্বের অবস্থান। ক্রমে যেন তাঁর দৃষ্টির সীমায় এক অপূর্ব চিত্র ফুটে ওঠে। Espadas Como labios কবিতায় তখন কবি আবিষ্কারে মেতে ওঠেন :

আমি কামনা করি শুভ্র প্রতীকের
অথবা সুদৃশ্য দেয়ালের
কে জানে? আমার কামনায়—আমার
কাছে বা
তোমার কাছে অথবা পালিত শোকে
আমি এমন কিছু কামনা করি যা দশটি
আঙুলের
মত হারিয়ে গেছে, ধূমপান করেই বিস্মৃত।

'Suicidio' কবিতার মধ্যে বগলের মধ্য দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ এক আশ্চর্য পরিবেশ রচনা করেছে। সেখানে উদ্ভূত দর্শন লরকা-র Martirio de Santa Olalla'-এর মত সত্যিই ভয়ঙ্কর। একটি দেহ শূন্যে হাওয়ায় ঝুলন্ত, রসনা যারা ক্ষতবিক্ষত যা সারি বেঁধে পিপীলিকা লেহন করে চলেছে। এই পরিবেশেই আলেইকজান্দ্রে রচনা করেন

ভদ্রলোকদের যখন তাদের নিতম্ব বর্জন করে
তখনই তারা প্রত্যেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে
শুদ্ধের দিকে।

কবি এখানে রসিকতা ব্যতিরেকে নিজস্ব দর্শনকে সনাক্ত করতেও ব্যর্থ। বিশেষ করে তিনি দর্শনকে মুক্তির আলোকে চিহ্নিত করেন। মানুষ এক প্রাণান্তকর চেষ্টায় অপসৃয়মান নিতম্ব থেকে ছবির গতি পরিবর্তন করছে তখনই তাঁদের গোঁফের গুরুত্ব মূলতঃ কাব্যিক স্বাধীনতাকেই ব্যক্ত করে। অবশ্য সেই স্বাধীনতায় রয়েছে তাও ক্ষণিক অধিবাস্তবতা (absurdity) যা আঁদ্রে ব্রের্তঁ-র স্যুররিয়ালিজমে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাব্যিক বিশ্বাসে ছিলো, দেহ এবং আত্মা সব কিছুর আধারই যৌনতা, যা আলেইকজান্দ্রেকে বিশেষ করে জৈব পর্যায়ে তাঁর ধারণাকে উদ্দীপিত করে। রমণীদেহের বলিষ্ঠতার মধ্যে তিনি এক অপরূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছেন। কাব্যিক রীতির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন নারীর ধমনীতে প্রবাহিত লাভা স্রোত আনন্দের প্রয়োজনে মৃত্যু কিছুক্ষণের জন্য শুব্ধ হয়ে থেমে রেখেছে।

> আমি প্রেম চাই অথবা মৃত্যু,
> মৃত্যুই আমার একমাত্র কামনা, আমি হতে চাই
> তোমার রক্তকণিকা। সেই লাভা স্রোতের
> গর্জন ক্রমে তোমার অপূর্ব
> দেহসুষমাকে খনন করে চলে
> তার মধ্যেই জেগে ওঠে উপলব্ধি—
> জীবনের অর্থ সৌন্দর্য-সীমায়।

আলেইকজান্দ্রে তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণভাবে অনুভব করেছেন 'La destruccion o el amor কবিতায়। এখানে রমণীর অপূর্ব দেহ সুষমা। রমণীর সুডৌল উরুর ওপর, উদরে, কটিদেশে, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখাবয়বে, স্তনে যে গর্জন অনুক্ষণ প্রবাহিত তা যেন Latunica de Neso-র দোমেনচিনার মত। তিনি তখন জ্বরের ঘোরে দেহের বিশদ চিত্রের এক সুনিপুন সূচী রচনা করেন। অবশ্য কবি গুাইসেন এক রমণীর দেহকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের ধারণায় প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি তারপর প্রেমের মূর্ত প্রতিমাকে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে জড়িত করে রাখেন। বস্তুতঃ তাঁর কাছে প্রেমের সংজ্ঞা যেন নগ্নদেহ সদৃশ। সেই দেহের স্বভাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে উপাদান এবং দুর্নিবার প্রকৃতি। যেমন

এখন একমাত্র নগ্ন গণ্ডোপরি হাসির তরঙ্গ।
আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে।
জল যেন কার পদবন্দনায়
মগ্ন। যেন বুঝি বা বিজিত এক
রাত্রিতে রহস্য আবৃত।
আমি জানি কে ভালবাসে
কে বেঁচে থাকে—
কে মরে অথবা কে ওড়ে—
চন্দ্র অদৃশ্যপ্রায়—আবার উদিত হবে।
আমি দুটো দেহকে জানি, ভালবাসি।
দুটো আত্মা ক্রমে দ্রবীভূত অবস্থায়
অখণ্ড হবে।

পরিশেষে লক্ষ্য করা যায় আলেইকজান্দ্রের বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই ধারণা, নিখিল বিশ্বের ঐক্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা বিভাজনের অবস্থান নেই। তার দুটো কবিতা তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন 'Mar en la turra' এবং 'La Selva y el mar'.

একটি কবিতায় রয়েছে কদর্মক্লান্ত আকাশ। অন্য কবিতায় ধাতুর পালক। বস্তুতঃ নিখিল বিশ্বের ঐক্য মূলতঃ তরল অবস্থার মধ্যেই প্রতিফলিত। অবশ্য মনের আবেগের সঙ্গে দ্রুত ধাবমান হয় আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও পৃথিবী, সৌন্দর্য ও আতঙ্ক, যন্ত্রণা ও উপশম, জীবন ও মৃত্যু। কিন্তু এসব উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিখিল বিশ্ব যেন ক্রমেই রমণীর আশ্চর্য সুন্দর কটিদেশ, কোমল বাহু থেকে মুহূর্তেই গোখরা সাপে রূপান্তর লাভ করে। যা বিশ্বের মূর্ত বিশৃঙ্খলাকে সুস্থির করে রাখে।

বিজয় দেব

নতুন কবিতা

[বাংলা আধুনিক কবিতার জগতে সম্প্রতি সবচেয়ে বড় এবং নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে 'উত্তরসূরি'র পৃষ্ঠায়। গ্রাম বাংলার এবং কলকাতার, শহরতলীর অজস্র অসংখ্য 'লিটল ম্যাগাজিন' থেকে অতি সযতনে কবিতা উদ্ধার করে সম্পাদক প্রমাণ করেছেন, কত ভালো কবিতা অনাদরে অবহেলায় কতকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। বাংলা দেশে কবি হবার জন্য আজ আর কোন তরুণকে বাজারে পত্রিকাগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। বাংলা কবিতার ইতিহাস যেদিন সঠিক লেখা হবে তখন এই নিঃশব্দ বিপ্লব একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে থাকবে।

সম্পাদক : উত্তরসূরি]

নীতীশ বসু

কথা ছিলো

কথা ছিলো ঠিক দুপুরে কবির গাঁয়ে চলে যাবো
কথা ছিলো নদীর ভেতর কবির সঙ্গে খেলা হবে।
বল্গাহীন শব্দ যেমন ছুটে চলে
যেমন করে একটা মানুষ লুকিয়ে থাকে বুকের ভেতর
কেউ জানে না,
সেই রকম কথা ছিলো।

কিন্তু আমার
কথা রাখা হ'লই না আর কবির কাছে

কথা ছিল ঠিক দুপুরে কবির গাঁয়ে চলে যাবো
কথা ছিলো নদীর ভেতর কবির সঙ্গে খেলা হবে।

[বেহাগ, ১১ ঘাটবন্দর, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ]

সমীর রায়

চোখ

দুটো চোখ আমার দিকে স্থির চেয়ে থাকে।
আমি সরে দাঁড়াই। বসে পড়ি। খাটের নীচে লুকোই।
তবু দুটো চোখ চেয়ে থাকে অপলক।
বড়ো ভয় করে এই চেয়ে থাকা।

আমার এই ছিরিছাঁদহীন চেহারা—চোখের কোণে কালি ;
বুকের মধ্যে জমে আছে একরাশ অন্ধকার—
ছেঁড়া গেঞ্জি দিয়ে রাজ্যের দারিদ্র্য চুঁয়ে চুঁয়ে পড়েছে।

অহংকারের দুঃখগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখি
ভাবতে ভাবতে অন্ধকারের দিকে তাকাই
আর দমকা হাওয়ায় দুলে দুলে ওঠে দৃষ্টিপথের নিঃস্বতা।

[পিলসুজ ১১, ওলাবিবিতলা ১ম বাই লেন, হাওড়া ৪]

ফারুক নওয়াজ

না গৃহী না বাউল

আমি গৃহী হতে চেয়েছি বার বার গৃহী হতে চেয়েছি
মাতাল সময় আমাকে গৃহী হতে দেয় নি
আমি বাউল হতে চেয়েছি বার বার বাউল হতে চেয়েছি
উদার সময় আমাকে বাউল হতে দেয় নি।

[দৈনিকের ডায়েরী, শরৎ ১৩৮৪, ২১।১ গড়িয়াহাট রোড পশ্চিম কলকাতা ৬৮]

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়

ছেড়ে চলে গেলে

১

ছেড়ে চলে গেলে
বোঝা যায় কে কে এসেছিল
এতোকাল কাছে কারা ছিল
অথচ যখন যাকে চাই, প্রয়োজন হয়
সে তখন আসে না।

২

ছেড়ে চলে গেলে
বেশ কিছু চিহ্ন থেকে যায়
যার ফলে স্পষ্টতই ফিরে আসা চলে
অথচ যখন কেউ ঝড় হয়ে আসে
নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তাকেও পাই না।

[বালিনের চিঠি, ৭।৩ টেমার লেন, কলকাতা ৯]

দীনবন্ধু হাজরা

সিগন্যাল

তোমার নিস্তার নেই। ব্যাঘ্রমারী অহংকার
মেঘভাঙা জ্যোৎস্নায় ডোবায় গাঢ় চুল;
তুমি শুদ্ধ হাত বাড়াও, সমস্ত থুতকার মুছে ফ্যালো,
কুড়িয়ে নাও রক্তে কর্কট।
কখন ঘোমটা খসে লাগামেও টান—
মাই ওয়ান, মাই ওয়ান, মাই ওয়ান……
স্বভাব সিদ্ধান্ত তুমি জানো, তবু ক্ষমা নেই,
সে আজও তোমারই পথ চেয়ে।

[প্রাতিস্বিক, স্টেশন রোড, বেলমুড়ি, হুগলি]

পীযূষকান্তি নন্দী

ষোলকলা পূর্ণ হলে

ক্রমাগত কড়া নাড়তে নাড়তে খুলে যায় গোপন দরজা
অথচ প্রহরীরা ঘুমিয়ে থাকে, জল পড়তেই থাকে
যেন সদ্য স্নান করে গেছে উত্তেজনায় ঘেমে-যাওয়া যুবক
সবকিছু পরিদর্শিত হলে চলে গেছে উত্তাপ নিয়ে
মাতালের চিহ্ন এখনও আছে কপাটের গায়ে।
চলে যাওয়ার আগে, অত্যধিক সুখেও,
মনে ছিল দরজা বন্ধ করতে হবে।

[দংষ্ট্রা, গ্রাউণ্ড হস্টেল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া]

গৌতম বাগচী

আমাদের অসুখ এখন

প্রতিদ্বন্দ্বী ফিরে যাও, আমাদের অসুখ এখন…
যাবার আগে দেখে যাও আমাদের রাজকীয় ব্যাধি।
মাথায় মুকুট আমরা পাই নি কখনো
তবু ভাখো, রাজকীয় ব্যাধি আমাদের সঙ্গী হয়ে হাঁটে।

মানচিত্রের পাঁচটি বছর পুনরায় ঘুরে যায়।
আমরা আজ রাতে দক্ষিণের হাওয়া থেকে
আগামী কোন এক উজ্জ্বল সকালের সবুজ ময়দানে
প্রান্তিক খেলোয়াড় হবো….
ফিরে যাও প্রতিদ্বন্দ্বী
অসুখ…আমাদের অসুখ এখন।

[ভাবনা, ৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলকাতা ৬]

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঝিল্লীর জন্য

তেমনি একটি লোক প্রতিদিন বাইরে দাঁড়ায়
ঝিল্লীর চিঠি আসবে
হাতের তালুতে ঘাম চোখে নীল উৎকণ্ঠার ছায়া

ক্রমে বেলা বাড়ে মাথার ওপরে ওড়ে কাক
পোস্টম্যান পাশের বাড়িতে ডেকে যায়
চিঠি আছে চিঠি

সেই লোক তবুও দাঁড়িয়ে থাকে অমনস্ক খুব
চোখে তার বৃষ্টির ফোঁটার মত শ্বেত অভিমান

অন্য মানুষজন তাকে
কবি বলে
অথচ ভুলেও কেউ কাছে ডাকে না

[অপাংক্তেয়। শরৎ ১৩৮৪। নালন্দা প্রেস, ফুলভাঙ্গা, বাঁকুড়া]

কবিতার ভাবনা (৭) : উত্তরসূরির শততম সংখ্যা

অরুণ ভট্টাচার্য

হিসেব মতো এটি 'উত্তরসূরি' পত্রিকার শততম সংখ্যা, পঁচিশ বছরের চতুর্থ। এখন যাঁরা তরুণ এবং তরুণতম কবি, এই পত্রিকাটিকে মুখ্যত কবিতার প্রতিনিধি বলেই জানেন, একথা জানলে তাঁরা বিস্মিত হবেন যে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা ছিল শুধুমাত্র প্রবন্ধসংকলন। সে সময় আমরা সবে কলেজ-উত্তীর্ণ, বন্ধুদের কেউ কলেজে, কেউ অফিসে এবং আমরা ক'জন খবরের কাগজে কাজ করি। এই সব বন্ধুদের মধ্যেই আবার, বিশেষ করে আমরা কয়েকজন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভক্ত ছিলুম। অমন একটি বিশ্ববন্দিত এবং বিশ্বনিন্দিত মানুষ! যিনি সোভিয়েৎ রাশিয়ার বাইরে প্রথম কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়লেন মেক্সিকোতে, যাঁকে লেনিন আহ্বান করে নিয়ে গেলেন মস্কোতে সেই তরুণ বয়সেই, যিনি প্রথম পাঁচ জন সোভিয়েৎ নেতার সম্মান পেলেন, আবার পররর্তীকালে যিনি মার্কস্‌বাদের মূল দার্শনিক বক্তব্যকে নূতন আলোকে দেখতে চাইলেন নিজের মত করে—সেই অমিত সাহসী ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি এসে স্বভাবতই আমরা ক'জন নূতন ভাবনা-চিন্তায় উৎসাহী হয়ে পড়ি। তিনি শিখিয়েছিলেন দুটি কথা, কোন মানুষকেই অশ্রদ্ধা কোরো না মতবাদে যত পার্থক্যই থাক, দ্বিতীয়ত, কোন মতবাদকেই আঁকড়ে ধরে থেকো না চিরকালের জন্য—বুদ্ধি দিয়ে, মানবিকতার বোধ দিয়ে, সহৃদয়তা দিয়ে প্রতিটি মন্তব্য যাচাই করে দেখো। এমনি একটা ধারণা নিয়ে আমরা গড়ে তুলেছিলুম 'নিউ থিঙ্কার্স এ্যাসোসিয়েশন।' আড্ডা নানা জায়গায় বসত, তবে প্রাধনত কফি হাউসের তিনতলায় রেনেশাঁস ক্লাবের ঘরে এবং শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকারের (সেন) বাড়িতে। ওঁর বাসায় রাজনীতির পাশাপাশি একটা সাহিত্যের আবহাওয়া বইত। পুণ্যলতা চক্রবর্তী ওঁর মা, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া তিনি। এই সাহিত্য গোষ্ঠীতে মূলত ছিলেন বেহালার সমরেন রায়, কবি অরুণকুমার সরকার ও শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক অঙ্কুর মুখোপাধ্যায়,—'উত্তরসূরী' নামটি ওঁরই দেওয়া, তাঁর অকালমৃত্যু আমাদের জীবনে একটি ঘটনা,—শ্রমিক নেতা যতীন

মিত্রের মেয়ে শোভা মিত্র,—এখনও কি মিত্র রয়েছেন ! জানি না, বহুকাল দেখা হয় না, কোন কলেজে পড়ান শুনেছি। সমরেনের আনুকূল্যেই কালীঘাট পার্কের পাশে একটি ছোট্ট প্রেস থেকে প্রথম সংখ্যাটি বেরোয়, ঝকঝকে বই। আমরা প্রায় সবাই লিখেছিলুম। বিশেষ করে চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও অঙ্কুরদার প্রবন্ধ দুটি এখনো আমাদের ভাবায়।

এত খরচ করে পত্রিকা প্রকাশ করা হলো বটে, কিন্তু সমরেনের পক্ষে একা এতো ভার বওয়া সম্ভব ছিলো না—আর আমরা তো প্রায় বেকার। খবরের কাগজে বা কলেজে তখনকার মাইনে শুনলে এখনকার উঠতি সাংবাদিকরা এবং তরুণ অধ্যাপকেরা আঁৎকে উঠবেন। যাই হোক, যা হবার তাই হল, পত্রিকা বন্ধ হ'ল। কিন্তু 'উত্তরসূরী' নামটি বাংলা সাহিত্যে থেকে গেল। সুতরাং কয়েক বছর বাদে আবার এই পত্রিকাটিকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হলো। তবে দলে একটু রদবদল হলো। এবারে কল্যাণীদি এবং সমরেন এর সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। আলস্যপ্রিয় অরুণকুমার সরকার রইলেন, কিন্তু কবি হিসেবেই শুধু। শান্তিপ্রিয় এবং শোভা অধ্যাপনা নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। এলেন প্রধানত বিমল কর, গৌরকিশোর ঘোষ, শিবনারায়ণ রায় এবং নারায়ণ চৌধুরী। প্রথম তিনজনই অবশ্য মানবেন্দ্রনাথের ভক্ত। আমি প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের সেতুবন্ধ। এবারে-কবিতার প্রবেশ। শিবনারায়ণ রায় ডাক-সাইটে প্রাবন্ধিক হলেও অন্তরে কবিতা ভালবাসেন, একথা বাংলাদেশের পাঠকদের অজানা নয়। তার ঠিক পরবর্তীকালেই আমি যখন একক ভাবে উত্তরসূরী প্রকাশ করেছি, আগ্রহ সহকারে আমি তাঁর কবিতা প্রকাশ করেছি। এ প্রসঙ্গে জানাই, 'কথারা তোমার মন' বলে শিবনারায়ণ বাবুর যে কাব্যগ্রন্থটি আছে, কলকাতা থেকে আমি তার দায়িত্ব নিয়ে প্রকাশ করি, শিবনারায়ণ তখন মেলবোর্নে।

সুতরাং কবিরা এলেন একে একে পত্রিকায়, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে। শিবনারায়ণ বাবু অবশ্য জীবনানন্দের চেয়ে সুধীন্দ্রনাথকে বড় কবি বলে মনে করতেন। আমি এবং অরুণকুমার সরকার উভয়েই, সুধীন্দ্রনাথের ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, জীবনানন্দের কবিতার প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ বোধ করতুম। প্রবন্ধ লিখলেন অন্নদাশংকর, বুদ্ধদেব ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও গানের ওপর লিখতে থাকলেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। গল্প লিখলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র,

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বিমল কর। তখন নরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত লেখক। গৌরীশঙ্করও পরিচিত, কিন্তু তরুণতম বিমল করের একটি মাত্র গল্পই, 'ইঁদুর', তাঁকে বাংলা গল্পের আসরে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। মনে পড়ছে, শ্যামবাজারে ট্রাম ডিপোর পেছনে টেম্পল প্রেস-এ বন্ধুবর মিহির মুখোপাধ্যায়, 'আনন্দিনী' এবং 'মাষ্টার মশাই'র লেখক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নাতি, আর যোগেন বসুর উৎসাহ। মেশিনের পাশে সারা রাত দাঁড়িয়ে বিমল কর এবং আমি শেষ ফর্মা ছাপা শেষ করে বাড়ি ফিরলুম। উত্তরসূরী বেরুলো। গৌরকিশোরও উত্তরসূরীর জন্য যথেষ্ট করতেন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত রাধাকান্ত নী। আর উৎসাহী ছিলেন দেবদাস পাঠক। সে সময় তিনি তো কাঁচা থেকেই খারাপ লিখতেন না। কবিতার জগৎ থেকে তাঁর এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন অন্তত আমাকে পীড়া দিয়েছে। তাঁর থেকেও পরবর্তীকালে অনেকে ভালো কবিতা লিখেছেন, কিন্তু অমন একটি মার্জিত কবি-মন আমি বেশী দেখিনি, আজও। উত্তরসূরী প্রকাশে কলকাতা শহরে লেখক মহলে একটা নাড়াচাড়া পড়ল। কিন্তু যা হবার এবারও তাই আবার ঘটল। চারটি সংখ্যায় বন্ধ করে আমাদের নিজের নিজের বাড়ির দরজায় ফিরতে হ'ল।

কয়েক বসন্ত গেল। বসন্ত বলছি, তখনো জীবনের বসন্ত ছিল, উৎসাহ ছিল। কিছু একটা করবার জন্য ছটফট করত মন। আর টেম্পল প্রেস-এ বসে যোগেন বাবু মিহির বাবুর চা সিগ্রেট ধ্বংস করে কেবল প্ল্যান করতুম। হঠাৎ একদিন মিহির বাবু প্রস্তাব দিলেন, আকস্মিক এবং অযাচিত, উত্তরসূরী প্রকাশ করুন না কেন, একলাই করুন। অনেকে মিললে সব সময় কাজ হয় না। আমি বললুম, টাকা। মিহির বাবু বললেন, প্রেসের বিল যখন ইচ্ছে দেবেন। শুধু কাগজটা কিনে দিন। যোগেন বাবু শুনছিলেন, মনে মনে হাসছিলেন, ঘন ঘন সিগ্রেটে টান দিচ্ছিলেন। আমি কোথা থেকে একটা সাহস পেয়ে গেলুম-একটা উত্তাপ, পদার্থবিদ্যায় একেই বুঝি বলে লেটেণ্ট হিট্‌! তথাস্তু।

সে সময় আমি সিঁথি থাকি। কবিতা-পাগল বন্ধু সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্মেলন-প্রিয় সদা হাস্যোজ্জল মুরারি সাহা, আমার পরম স্নেহভাজন নবেন্দু চক্রবর্তী, পিসতুতো ভাই ডু নম্বর সমরেন রায়, বন্ধুবর হিতেন্দ্র মিত্র, বর্তমানে অধ্যাপক, এঁরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করলেন, বিশেষ করে নবেন্দু। আমার সঙ্গে

অক্লান্ত ভাবে কাগজের স্টলে 'উত্তরসূরী' বিলি করেছে। বিজ্ঞাপন জোগাড় করে এনেছি, অম্লানবদনে নবেন্দু ব্লক নিয়ে এসেছে। এমন একটি প্রাণকে আমাদের মধ্য থেকে কে যে নির্মম ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। ওঁর পিতা সুরেশ চক্রবর্তী, প্রখ্যাত উত্তরা-সম্পাদক, যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। কলকাতায় এলেই জিজ্ঞেস করতেন, এখন যা বিজ্ঞাপন পাচ্ছো তাতে কাগজ চলবে তো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দু এক জায়গায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অহিভূষণ মালিকের আঁকা শুধুমাত্র 'উত্তরসূরী' লেখাটি এই পত্রিকার চরিত্র স্থির করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে কবি-শিল্পী মলয়শংকর দাশগুপ্ত সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এখন পর্যন্ত। আর ধন্য টেম্পল প্রেস্ এর দুই বন্ধু! সাত, আট বছর চালাবার পর 'রবীন্দ্র সংখ্যা' প্রকাশ করে যখন সব দেনা শোধ করলুম, ওঁদের দুজনার মুখে কি নির্মল প্রশান্তি। এই দীর্ঘ বছরে, একদিনের জন্যও ওঁরা প্রেসের বিল আমাকে দেন নি, কোনদিন ঘুণাক্ষরেও টাকার কথা বলেন নি। আজ উত্তরসূরীর অগণিত কবি, প্রাবন্ধিক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী—কিন্তু একসময় এই দুটি মানুষ যেভাবে নিজেদের ক্ষতি স্বীকারের সম্ভাবনা জেনেও এই পত্রিকার ভার টেনে চলেছেন, জানি না প্রতিদানে আমি তাঁদের এখন পর্যন্ত কী দিতে পেরেছি।

উত্তরসূরী নতুন করে প্রকাশ শুরু করেই একটি অভাবনীয় ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেল, যার স্মৃতি আমি এখন পর্যন্ত বহন করে চলেছি, হয়ত বহন করব শেষ দিন পর্যন্ত। সংকোচ বশত অনেক দ্বিধা নিয়েই জীবনানন্দের কাছে আবেদন জানালুম একটি কবিতার জন্য। রোজই বাড়ি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করি, কোন চিঠি এসেছে জীবনানন্দের? আমার স্ত্রী জানান, না এখনো তো উনি কিছু লেখেন নি। আশা মনে মনে যে, লিখবেন দেখা করবার জন্য অথবা বলবেন, এখন তো লেখা নেই, হলে পাঠাবো। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেই আমার স্ত্রী জীবনানন্দের একটি চিঠি দিলেন। জীবনানন্দ একটি কবিতা- পাঠিয়েছেন, কবিতাটি মহাগোধূলি[১]। তখন আমার বয়েস কত হবে? তিরিশ-অনুর্দ্ধ। একটিমাত্র চিঠিতেই জীবনানন্দের কবিতা এলো, এর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আরো একটি বিরাট বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে হ'ল এবং সেই ঘটনাটিই এখানে উল্লেখ দরকার। বিকেলের দিকে আমি চৌরঙ্গী

ধরে ফিরছিলুম, সম্ভবত তার দু তিন দিন বাদেই। জীবনানন্দকে আমি কী জবাব দেবো এটা ভাবতে ভাবতেই আমার দু তিন দিন কেটে গেল। ঠিক কলকাতা যাদুঘরের সামনে। তখনকার দিনে প্রাইভেট ৫ নম্বর বাস হাওড়া থেকে বালীগঞ্জ যেতো এবং যাদুঘরের সামনে একটি বাস-স্টপেজ ছিল। উত্তরমুখো হাঁটছি, দক্ষিণমুখো একটি বাস যাদুঘরের সামনে থামলো। হঠাৎ কানে এলো 'অরুণ বাবু, অরুণ বাবু শুনছেন'! ফিরে তাকালুম। দেখি, বাসের ধারে বসে কে যেন হাত নাড়ছেন ক্রমাগত। একটু দ্রুত পায়ে স্টপেজের কাছে গিয়ে দেখি সেই চির-পরিচিত সদা-বিষণ্ণ সদা-ক্লান্ত অথচ উজ্জ্বল দুটি চক্ষুতারকার মালিক জীবনানন্দ ডাকছেন আমাকে। তড়িঘড়ি জিজ্ঞেস করলেন, 'কবিতাটি পেয়েছেন তো!' বিমূঢ় ভাব কোন রকমে কাটিয়ে উঠতেই বললুম, 'হ্যাঁ, আপনাকে চিঠি লিখতে যাচ্ছিলাম।' তারপরই আচমকা অথচ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবিতাটি আপনার ভালো লেগেছে তো!' সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দিলো। আমি কোন জবাব দেবার আগেই দ্রুত এই নিষ্ঠুর ৫ নম্বর বাসটি উর্দ্ধশ্বাস গতিতে পার্ক স্ট্রীট পেরুলো।

জীবনানন্দ, তখন তাঁর খ্যাতির উচ্চ শিখরে। সে সময়েও কিন্তু বড় বড় পত্রিকগুলি—যারা বর্তমানে জীবনানন্দের ব্যবহৃত 'দাড়ি কামাবার সেট' পেলেও বোধহয় ফটোগ্রাফ করে ছাপাতে আগ্রহী—এই কবি সম্বন্ধে সে ধরণের কোন আগ্রহ দেখাতে বোধহয় অস্বস্তি বোধ করতেন। মনে আছে, পরবর্তীকালে আমি এবং কয়েকজন 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় কবি সমর সেনের কাছে দরবার করেছিলুম, কেন জীবনানন্দের মৃত্যুসংবাদে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা একান্ত নিরুত্তাপ ছিলো। সমর বাবু তখন উক্ত দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। যুক্ত ছিলেন সুধীন্দ্রনাথও। যাই হোক। সেই জীবনানন্দের কী গভীর আগ্রহ একটি কথা জানবার জন্য! তাঁর কবিতাটি আমার কেমন লেগেছে? কী আসে যায় জীবনানন্দের, আমার মত একজন অখ্যাত কবির মতামতে। দীর্ঘদিন এই একটি কথা আমাকে ভয়ানক বিব্রত করেছে। প্রবল ধাক্কা খেয়েছি এই কথা ভেবে, কোন্ জগতে বাস করলে নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সত্তার মধ্যে নিজেকে এমন ডুবিয়ে রাখা যায়! সম্ভবত একথা ভেবেই 'জীবনানন্দ স্মৃতি-সংখ্যায়' লিখেছিলুম: যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন এ তাঁরা প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন, তিনি সর্বদাই

অন্যমনস্ক থাকতেন। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে, যত সহজই তা হোক, উত্তর দিতে তাঁর অনেক দেরী হোত।...যে কবি যে সমালোচকের নাম তিনি জীবনে শোনেন নি তাঁদের সামান্য বিরূপ মন্তব্যেও ছেলেমানুষের মত ব্যথিত হতেন।...তাঁর কাছে কবি অর্থ ছিল 'প্রাণময় বা মনোময় শরীরের ঊর্ধ্বে নিজ বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তায় অধিষ্ঠিত' থাকা। আজকের দিনে আমাদের কাছে, এই সমস্যা-বিজড়িত পৃথিবীতে এ কথায় আস্থা রাখা, নিজেদের জীবনে এমত আচরণ শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অবাস্তবও বটে। [উত্তরসূরী, জীবনানন্দ স্মৃতি-সংখ্যা ২য় বর্ষ, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১]

এই ধরণের একটা যুক্তি তখন তখন দাঁড় করিয়েছিলাম আমি জীবনানন্দ সম্পর্কে। 'মহাগোধূলি' কবিতাটি তরুণতম পাঠকদের কাছে এ সুযোগে আবার উপহার দিই :

সোনালী খড়ের ভারে অলস গরুর গাড়ী—বিকেলের রোদ পড়ে আসে।
কালো নীল হলদে পাখিরা ডানা ঝাপটায় ক্ষেতের ভাঁড়ারে ;
শাদা পথ ধুলো মাছি—ঘুম হ'য়ে মিশেছে আকাশে ;
অস্ত সূর্য গা এলিয়ে অড়র ক্ষেতের পাড়ে পাড়ে
শুয়ে থাকে, রক্তে তাঁর এসেছে ঘুমের স্বাদ এখন নির্জনে ;
আসন্ন এ ক্ষেতটিকে ভালো লাগে--চোখে অগ্নি তার
নিভে নিভে জেগে ওঠে ;—স্নিগ্ধ কালো অঙ্গারের গন্ধ এসে মনে
একদিন আগুনকে দেবে নিস্তার।
কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন প্ল্যান ক্ষয় হয় ;
কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব :
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
ক'রে চুপ হয়েছিল-আজও সময়ের কাছে তেমনি নীরব।

এ প্রবন্ধে জীবনানন্দের কাব্য-সমালোচনার স্থান নেই, রয়েছে কিছু উজ্জ্বল চিত্র, যা কবিকে বুঝতে সাহায্য করবে। তখন আমরা কয় বন্ধু 'নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' করি। মুরারি সাহা, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, সুহৃদ রুদ্র, পরিমল চন্দ্র, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বর্তমান চতুরঙ্গ-সম্পাদক, অরুণকুমার সরকার, বীরেন সেন, বঙ্গ সংস্কৃতির প্রথম সম্পাদক মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি। মূলত

বক্তৃতা-মালার ব্যবস্থা করা, সংগীত শিল্পী কারা কারা হবেন ঠিক করা এসব ছিল আমাদের কাজ। বিডন স্কোয়ারে সুহৃদের বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় মুড়ি চা তেলেভাজার অম্লান স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব কলকাতার শিল্পসাহিত্যের হিসেব নিকেষ করতুম। সন্তোষ এবং আমার মাথায় এলো, জীবনানন্দকে 'নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' থেকে অভ্যর্থনা দেওয়া যাক্ না কেন। প্রস্তাবটি অরুণকুমার সরকার এবং মুরারি সাহা লুফে নিলেন আনন্দের সঙ্গে। সব বন্ধু এক হয়ে গেলাম এমন একটি ব্যাপারে। জীবনানন্দকে মহাজাতি সদনের সাজানো স্টেজ-এ বসানো হ'ল। সেদিন আমরা ক'জন ছাড়াও নরেশ গুহ ছিলেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সুহৃদ রুদ্র পুরস্কারের কথা ঘোষণা করলেন। তখন অনুরোধ এল—এবং ঠিক করাই ছিল আমাদের, জীবনানন্দ কবিতা পড়বেন। এখনো মনে আছে, জীবনানন্দের হাত রীতিমত কাঁপছিল। ওঁর দু পাশে আমরা সবাই বসেছিলুম স্টেজ-এ। কবিতা পড়তে হবে উনি জানতেন। তা সত্ত্বেও মহাজাতি সদনে বসে উনি রীতিমত 'নার্ভাস্' হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের বললেন, এত লোক আমার কবিতা শুনবে, বলেন কি ? যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না। আমরা জোর দিয়ে বললুম—হ্যাঁ, আপনার কবিতার জন্যই এঁরা এসেছেন। নিজের এই জনপ্রিয়তা তিনি বোধ হয় এর আগে কোনদিন টের পান নি; পরে আর একবার জেনেছিলেন সেনেট হাউস কবি-সম্মেলনে, আলোক সরকার, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য ডি-কের[২] সহযোগিতায় যা আয়োজন করেছিলেন। বহুল প্রচারিত দৈনিক সাপ্তাহিকের প্রচার ব্যাতিরেকেও যে কবি হওয়া সম্ভব জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ সেকথা প্রমাণ করে গেছেন[৩], তরুণ তরুণতম কবিদের জন্যই এই কথা ক'টি বলা প্রয়োজন মনে করি। এই দুটি আসরেই জীবনানন্দের কবিতাপাঠ সহস্রাধিক কবিতাপ্রিয় তরুণ শুনতে পেয়েছিলেন—তুমুল অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁকে। সেনেটের সেই আসরে আমরাও কবিতা পড়েছিলুম—নীহাররঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করেছিলেন—এখনকার কবিদের কাছে তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ধরা থাকবে। জীবনানন্দ সম্বন্ধে এমনি কত কথাই যে মনে পড়ছে—তাঁর জীবনের কত খুঁটিনাটি ধরা রয়েছে শিল্পী অনিল ভট্টাচার্যের মনের খাতায় (ঈশ্বর তাঁকে শান্তি দিন), আমার অন্যান্য বন্ধু অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র[৪] নরেশ গুহ বা নিরুপম

চট্টোপাধ্যায়ে[৫] কাছেও তাঁর অজস্র দিনলিপি ধরা থাকতে পারে। ত্রিদিব[৬] জানে তাঁর কথা, জানে সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। ট্রামে বাসে চিৎকার করে জীবনানন্দের লাইন মুখস্থ বলে সেকালে তরুণীদের আচমকা ঘাবড়ে দেওয়া—জীবনানন্দকে নিয়ে সন্তোষের এইসব পাগলামি আমাদের সহ্য করতে হয়েছে দুস্তর। সেই জীবনানন্দ, আমাদের সকলের দুরন্ত যৌবনের প্রতিবিম্বিত মুখ যেন।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্য ধাঁচের মানুষ। তাঁর পারিবারিক আভিজাত্যে এমন একটা উনবিংশ শতকীয় দূরত্ব থাকতো যে চট্‌ করে তাঁর সঙ্গে সহজ হওয়া যেত না। কিন্তু আমার এবং অরুণকুমার সরকারের একটি বিশেষ সুবিধে ছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন, চিন্তার ক্ষেত্রে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দোসর। তাঁকে মানবেন্দ্রনাথের শিষ্য বললে ঠিক বলা হবে না, তবে একথা সত্য মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর কাছে ছিলেন 'friend, philosopher and guide', এই সূত্রে আমরা তাঁর কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেয়েছি। তাঁকে কবিতা লেখার জন্য নিরন্তর তাগাদা দিতে হোত, কিন্তু সেই প্রশান্ত নির্মল হাসি, এখন আর লিখতে পারছি না। অবশেষে স্তেফান মালার্মে-র 'আজুর' কবিতাটি অবলম্বনে একটি অতি সুন্দর, দৃঢ়-নিবদ্ধ কবিতা দিলেন। নীলিমা। এই কবিতাটির শেষ পংক্তি ছিল :

নীলিমানিমগ্ন আমি; চতুর্দিকে নীলিমা নীলিমা।

শেষ পর্যন্ত কাব্য-পাঠক একটা আচ্ছন্নতা বোধ করবেন—আর কবিতার প্রথম দুটি পংক্তি সুধীন্দ্রনাথের ঋজু ভঙ্গিমার যেন প্রতিরূপ

নিরপেক্ষ নীলিমার নির্বিকার, নির্মম বিদ্রূপ,
মদালস পুষ্প যেন। সাংঘাতিক সৌন্দর্য ছড়ায় :

এই পংক্তিতে 'সাংঘাতিক' শব্দটির আচমকা ব্যবহার সত্যিই সাংঘাতিক। ভাবতে মজা লাগে কী অনায়াসে এমন একটি অপ্রত্যাশিত শব্দ তিনি ঠিক টিপ্‌ করে মালার ফাঁকে সাজিয়ে দিলেন। আর এই দুই কবিদের সঙ্গে ছিল সঞ্জয়দার কবিতা। অভিমানী, তীব্র আবেগপ্রবন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আত্মবিশ্বাসী, উঁচু-মাথার কবি, দাম্ভিকও মনে হতে পারে দূর থেকে। আমার বন্ধু কবিদের মধ্যে, মনে হয়, অন্তত দুজন, তাঁদের কাব্য-প্রতিষ্ঠার মূলে সঞ্জয়দার কাছে ঋণী। তাঁরা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আর আমি তো বটেই,

সেকথা আগের একটি লেখায় উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই অভিমানী কবির লেখায় ছিল এক অনন্য স্বাদ। অন্য কারো কবিতার সঙ্গে তা মিলিয়ে পড়বার দরকার হ'ত না। তাঁর শব্দ-ব্যবহার, ডিক্শন, ছবি এবং গানের সুর সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরণের :

তোমার মসৃণ ত্বকে তিন বর্ণ ইশারা দেখায়
ঈষৎ অজানা আর বাকি সব যেন জানা, সোনার রুপোর
উজ্জ্বলতা, যাকে মুছে বারবার ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে
নিয়েছি মাটির রঙ, যে-রঙে আকাশ-চন্দ্র-সূর্য ওঠে কেঁপে।

সঞ্জয়দার কবিতায় সমুদ্র, আকাশ, নীহারিকাপুঞ্জ, প্রেম-অপ্রেম ইত্যাদি বারবার এসেছে। মনে রাখা দরকার, প্রেম-অপ্রেম এই যুগ্ম শব্দটি আজকাল বহু কবি অনায়াসে ব্যবহার করছেন, কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্যই প্রথম বাংলা কবিতায় এই যুগ্ম শব্দটি এনেছেন।

এই সংখ্যাটিতেই, অর্থাৎ ২য় বর্ষ আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৬১র উত্তরসূরীতে আমার প্রিয় দুই অনুজ কবির কবিতা ছিল। আর ছিল সুনীল মুখোপাধ্যায়ের একটি অসাধারণ প্রবন্ধ, 'কাব্যবিচার'। অকালে সুনীল বাবুর মৃত্যুতে একজন প্রকৃত পণ্ডিত এবং প্রকৃত ভদ্রলোকে আমাদের মধ্য থেকে হারালুম। কবি দুজন হলেন আলোক সরকার এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। বলতে দ্বিধা নেই, এখনো পর্যন্ত, এই দীর্ঘ চব্বিশ পঁচিশ বছর পরেও এই দুজনের মত নিষ্ঠাবান কবি আর ক' জন বাংলা কাব্যের আসরে রয়েছেন আমার ঠিক জানা নেই। এঁরা জনপ্রিয় নন, জয়ঢাক বাজে নি এঁদের জন্য, কিন্তু সময় কাউকে ভোলে না। যখন পারিপার্শ্বিকতার গ্লানি কেটে যাবে, দূর থেকে সহমর্মিতার সঙ্গে বাংলা কাব্যের সুস্থির বিচার হবে সেদিনের জন্য রইলেন এই দুই কবি। এই চব্বিশ বছর ধরে এঁরা উত্তরসূরির সঙ্গে রয়েছেন এটা আমার ব্যক্তিগত শ্লাঘার কারণ। অনুজ এঁদের এই দুজনকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি। এঁরা সৎ কবির চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট হন নি জীবনে এবং আচরণে,—আরো অনেকেই হয়ত হন নি। অলোকরঞ্জনের 'যৌবনবাউল' বাংলাভাষায় একটি অসামান্য কাব্যগ্রন্থ। উত্তরসূরীতে প্রকাশিত কবিতাটি থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করি :

জাগো, ওরে জাগো, যদি বেলা যায়
পাখিরাও যদি অপরাহ্ণেই
বিষাদের হাট আকাশে সাজায়
বলো, তবু বলো : অবসান নেই।

অবসান নেই। জানি বেলা যায়
ঘরে ঘরে জমে অপ্রাচুর্য
তবু সে ব্যথার ব্যাপ্ত আভায়
অনন্ত হবে কণকসূর্য।

আর আলোক সরকার লিখছেন :

যে-সুর বেজেছে তাকে একান্ত নিজের করে রাখি।

তিনি এই দীর্ঘ সময় পেরিয়েও নিজের একান্ত করেই রেখেছেন তার কবিতার সুরকে। চিনতে দেরী হলেও একদিন ঠিকই চেনা যাবে, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। তাঁর কবিতা পরবর্তীকালে বহু পরিণত হয়েছে, কিন্তু চব্বিশ বছর আগে আত্মবীক্ষায় যে কথাটি বলেছেন তার সততা এখনো তর্কাতীত। প্রচারের যুগে বহু অকবি কবির সম্মান পাচ্ছেন এটা দুঃখের তো বটেই, কিন্তু সত্য। প্রচার-সর্বস্বতার যুগে এই নির্মম তথ্যকে স্বীকার করেই কবিকে স্বধর্মে আস্থাবান থেকে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্লেকের ভাগ্যকে, যিনি জীবিতকালে মাত্র 'engraver'এবং 'designer' এর সম্মান পেয়েছিলেন, সংবাদ-পত্রে যে ছোট্ট খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর, তাতে ঘুণাক্ষরেও জানা যায় নি যে ব্লেক একজন কবি। সমকালের সমালোচকদের, বিশেষত রবিবাসরীয় এবং সাপ্তাহিকের সবজান্তাদের তুখোর কাব্য বিচারবোধ শুধু সেকালে নয়, একালেও মাথা চাড়া দিচ্ছে, দিচ্ছে আরো প্রবলভাবে; তাঁদের ঢাক নিত্য বাজে, আমদের কানে তালা লাগে, কয়েকটি মুষ্টিমেয় দলীয় নামের কাড়া-নাকাড়া শব্দ-ধ্বনি অনবরত শুনতে শুনতে। একথাও মনে রাখতে হবে আমাদের, রবার্ট সাদের মত নেহাৎই মাঝারি পদ্য লেখক রাজকবির সম্মান পেয়েছেন আর কীটস্ ছিলেন তাঁর জীবিতকালে বায়রনের করুণার পাত্র!

এসব তিক্ত কথা লেখবার সময় আমার আর একজন কবি-বন্ধুর কথাই মনে আসছিল, যিনি 'উত্তরসূরী'র কবি অথচ যিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান এখনো পেলেন না। তিনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবি হিসেবে আমার বন্ধু এবং বয়সী মাত্র দুজন কবিকে আমি ঈর্ষা করি। তাঁরা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অরুণকুমার সরকার। বীরেন্দ্রর গভীরতা, স্পষ্টতা, এবং উচ্চকিত হলেও কোমল হৃদয়ের উত্তাপ আমার কাছে ঈর্ষনীয়। সমান ঈর্ষনীয় অরুণকুমার সরকারের দক্ষতা, শব্দের ওপর তাঁর অসাধারণ মুন্সীয়ানা এবং আশ্চর্য গীতি-ধর্মিতা। অরুণকুমার সরকার অবশ্য গান শুনলে গান্ধার মধ্যম স্বর চিনতে পারবেন না, আমি যতদূর তাঁকে জানি। কিন্তু তাঁর অন্তর গীতিময়। সেখানে শুধু গান, যে-গানে কোমল ঋষভ আর তীব্র মধ্যম চেনবার দরকার নেই। সমস্ত জগৎ এক মহান বেদনার গানে উদ্বেল মনে হয়। এই কবিদের কবিতা থেকে উত্তরসূরীতে প্রকাশিত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করি :

১. ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলঙ্কার
খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে
তিন ভুবনকে ঢেকে ;

সে সময়ে আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ, যায়
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিরুদ্দেশে
দেখি আর ঘুম পায়। : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষ চারটি পংক্তির তুলনীয় পংক্তি খুঁজতে অনেক কবির অনেক বই ঘাঁটতে হবে, এবং তারপরও নিশ্চিতভাবে তুলনীয় পংক্তি উদ্ধার করা যাবে কি না সন্দেহের বিষয়। আর এবারে আমার অন্য বন্ধুটির কবিতার কয়েকটি পংক্তি পড়া যাক্।

আমি তোমায় ভালোবাসি, প্রেমিক, আমায় ভাখো।
হৃদয় জুড়ে গন্ধ আমার, পূর্ণ আমার প্রাণ,
বুকের মধ্যে টকটকে লাল রঙ

ওদের শুধু দেখতে আসা, ভাসতে আসা নয়।
এই যে আমি রুদ্ধ জোয়ার, প্রেমিক আমায় নাও।

: অরুণকুমার সরকার

তৃতীয় এবং চতুর্থ পংক্তি দুটির অসামান্ত আবেদন আমাকে বহু রাত্রিদিন ভাবিয়েছে যদিও শেষ পংক্তিটি অপেক্ষাকৃত জোলো। কী আসে একটি দুর্বল পংক্তিতে যখন সারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি, শিরায় শিরায় প্রত্যক্ষ করি যে ভালোবাসা হচ্ছে 'বুকের মধ্যে টকটকে লাল রঙ'। বাংলা কবিতার অন্যান্য পাঠকদের মত আমারও একটি আফশোষ, এই কবি অত্যন্তই পরিশ্রম-বিমুখ। একটি কবিতা লেখার পরিবর্তে ইনি শিবকিঙ্কর[৭]-ত্রিদিব[৬]-অশোক[৫]-সমরেন[৮]-গৌর-[৯] ইত্যাদির আড্ডা-চক্রে জমে যেতে বেশী ভালবাসেন, যদিও এই আড্ডা-চক্র মুখ্যত কাব্যচর্চা এবং শিল্প-চর্চা প্রসঙ্গেই হয়ত।

এ সময় বিশেষ করে কল্যাণ সেনগুপ্তের কবিতা আমাকে কাছে টানতো। উত্তরসূরির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল আদর্শগত, এবং রুচিগত। তিনি বেশ কিছুদিন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার লিখছেন, এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অত্যন্তই আনন্দের। পত্রিকার সংখ্যা কটি বার করতে না করতেই এলো জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যু, রাসবিহারীতে এখন যেখানে লেক মার্কেট, তারই কিছু পূবে ট্রামের ধাক্কায় তিনি আহত হলেন। গুরুতর অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কয়েকদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করবার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার তরুণ কবি-সমাজ যে ভাবে বিহ্বল হয়েছিল তা এখনও স্মরণ করলে চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, সেই সব যুবক কবিদের প্রথম প্রেমিক যেন তাদের ছেড়ে কোন দূরান্তরে চলে গেল। রাসবিহারী ধরে মৌন মৃত্যু-মিছিলে শুধু কবিরাই, কবিতার অনুরাগীরাই—জীবনানন্দের কবিতার পর কবিতার পংক্তি যাঁদের মুখস্থ ছিল—তাঁরা জলভরা চোখে শ্মশান অবধি গেলেন।

বুদ্ধদেব 'কবিতা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলেন, অতি চমৎকার শ্রদ্ধা-নিবেদিত সেই পত্রিকা। অতি তরুণ কবিরা স্নেহাকর, ভূমেন্দ্র, জগদীন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশ করলেন 'ময়ূখ'[১০]। আমরা বার করলুম 'উত্তরসূরীর' বিশেষ সংখ্যা। সেই সংখ্যাটিতেই 'উত্তরসূরী' বাংলার সাহিত্য জগতে আলোড়ন তুলেছিল।

জীবনানন্দের একটি অপ্রকাশিত কবিতা তাঁর অনুজ অশোকানন্দ দিলেন, 'উপলব্ধি'। জীবনানন্দ, তাঁর বাবা ও মার শ্রাদ্ধবাসরে একটি রচনা তৈরী করেছিলেন, সেই পারিবারিক পরিচয়টুকু তাঁর লেখায় সুন্দর ভাবে বিধৃত হয়েছিল। সেটি প্রকাশিত হলো। অনুজ অশোকানন্দ তাঁর দাদার স্মৃতিচিত্র লিখলেন। আমাকে-লেখা জীবনানন্দের একটি চিঠি প্রকাশ করেছিলুম। তাতে তিনি লিখেছিলেন 'আপনার মতন অল্প কয়েকজন পাঠক থাকলেও আমি নিজেকে সার্থক মনে করব'। কত অল্পে খুশি হতেন জীবনানন্দ। আমাদের কাছে এসব কথা গল্প মনে হয়। সঞ্জয়দা, কল্যাণীদি, আমার স্বর্গত বন্ধু সদাহাস্যোজ্জ্বল রথীন (অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়) ত্রিদিব, কবি বটকৃষ্ণ দাস, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিপ্রিয়, মুরারি এবং আমি জীবনানন্দের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করলুম। সঞ্জয়দা বাদে তৎকালে আমাদের কারুরই খুব একটা সাহিত্য-পরিচিতি ছিল না, কিন্তু প্রতিটি লেখার আন্তরিকতায় এই সংখ্যাটি এখনো উজ্জ্বলচিহ্নিত হয়ে আছে। বিমল রায়, সরকারী চারু ও কারুকলা কলেজের অধ্যাপক, একটি সুন্দর 'lively portrait' এঁকেছিলেন। পরবর্তীকালে বহু দেশী বিদেশী গবেষক এই সংখ্যাটির জন্য আমার কাছে এসেছেন, বাড়িতে বসে জীবনানন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, এই সংখ্যাটি থেকে 'নোট' নিয়েছেন। এটা আমাদের গর্বের বিষয় হয়ে রইল।

তারপর থেকে এপর্যন্ত, এই দীর্ঘ দীর্ঘ বছর উত্তরসূরি চলছে। শততম সংখ্যার পরও আর চলবে কিনা জানি না। বয়স বাড়ছে। কাঁধে ঝোলা নিয়ে লেখক, প্রেস, স্টল এবং বিজ্ঞাপনদাতা বন্ধুদের অফিসে অফিসে সিঁড়ি ভেঙে যেতে যেতে সত্যি ক্লান্ত লাগে। তাঁদের দেখা পেলে অবশ্যই ক্লান্তি কেটে যায়, তাঁদের আন্তরিকতা উত্তরসূরির প্রতিটি পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। সম্পাদক হিসেবে আমার শেষতম গর্ব, বাংলাদেশের বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত বহু লেখক এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সকলেরই কবিকৃতি সম্বন্ধে আমার ক্রমশ লেখবার বাসনা রয়েছে। পাড়ার ছোট ফুটবল ক্লাব থেকে আজকে তাঁরা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলছেন, বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আমরা কিন্তু সেই এরিয়ান্স এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নই থেকে গেছি, তাই থাকতে চাই। সে কারণে 'উত্তরসূরি'র কবির তালিকায় সর্বকনিষ্ঠ কবির বয়স এখন সতেরো। মনে রাখতে হবে সেই কবিদের তালিকায় রয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী,

মণীশদা (মণীশ ঘটক) অন্নদাশংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র। এই পত্রিকার বয়স কোন সীমারেখা নয়, রাজনৈতিক মত বাধা নয়, সাহিত্যিক দলাদলি কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি কোনদিন। 'উত্তরসূরি'র শততম সংখ্যায় শরতের আকাশে আমরা কিছু রৌদ্রকরোজ্জ্বল বক পাখিকে যেন হালকা মেঘের তুলোর মধ্য দিয়ে দিয়ে উড়ে যেতে দেখি।

পাদটীকা

১। 'মহাগোধূলি' কবিতাটি উত্তরসূরী ২য় বর্ষ, অশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৬১তে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে অরুণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'বারো বছরের বাংলা কবিতা' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। ডি. কে. অর্থাৎ দিলীপ কুমার গুপ্ত, যিনি সিগনেট প্রেস থেকে কবিদের বই পর পর প্রকাশ করে বাংলা কাব্যজগতে এক যুগান্তর এনেছিলেন। সম্প্রতি লোকান্তরিত।

৩। সকলেই জানেন জীবনানন্দের বেশীর ভাগ কবিতাই, যা তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে, বুদ্ধদেব সম্পাদিত 'কবিতা' এবং সঞ্জয়দা সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ মূলত তাঁর সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় এবং পরবর্তীকালে 'কবিতা'য় লিখেছেন। তার মানে এই নয় যে তাঁরা অন্য কোথাও লেখেন নি, কিন্তু পরিচয় (পুরনো), কবিতা এবং পূর্বাশার জন্যই এই দুই কবির প্রতিষ্ঠা বলেই আমার মনে হয়েছে।

৪। খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র; ইনি কবিতাকে প্রচণ্ড ভালবাসেন, অথচ বিশেষ কিছু লেখেন না, এটা আমাদের কাছে পরিতাপের বিষয়।

৫। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক দিল্লীতে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেসের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের বন্ধু নরেশ কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দুরন্ত দুপুর' এর জন্য। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক।

৬। ত্রিদিব ঘোষ, প্রাবন্ধিক এবং আমাদের এক সময়কার দিনরাতের আড্ডাবাজ বন্ধু। একটি প্রবন্ধ লিখতে হলে তিনি চার পাঁচ মাস লাইব্রেরীতে যাতায়াত করেন, এবং শেষ পর্যন্ত লেখাটি হয়ে ওঠে না। প্রকৃত পক্ষে, ত্রিদিবের বুকের কাছে বন্দুক উঁচিয়ে রেখে তাঁকে দিয়ে আমি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখিয়েছি।

৭. শিবকিঙ্কর মিত্র, ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। উত্তরসূরিতে সমালোচনা বিষয়ে একদা প্রবন্ধ লিখেছেন। পুলিশ বিভাগের বড় কর্তা, জয়েন্ট আই. জি; সম্ভবত সেকারণেই লেখার সময় পান না, যে জন্য আমরা মনে মনে দুঃখবোধ করি।

৮. সমরেন রায়, এঁর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, উত্তরসূরীর প্রথম প্রবন্ধ সংকলন এঁরই আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। বেহালার একদা ভূম্যাধিকারী। বীরেন রায়, প্রাক্তন এম. পি, এঁর বড় ভাই। মানবেন্দ্রনাথের অনুগামী। বেশ কিছু গবেগণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন।

৯. গৌরকিশোর ঘোষ কৃতী গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, এবং ডাকসাইটে সাংবাদিক। আমাদের ছোটবেলার বন্ধু, যাঁর জীবনের বহু কাহিনী এখন কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত, গৌরের চিত্তাকর্ষক জীবনে এমন বহু ঘটনা আমাদের জানা যা সরল ভাষায় লিখলে best seller উপন্যাসকেও হার মানাতে পারে। সম্ভবত গৌর নিজেই সেটা কোনদিন লিখবেন। মানবেন্দ্রনাথের অনুগামী হিসেবেও তিনি একদা শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন, উত্তরবঙ্গে। সম্প্রতি তাঁর আন্তর্জাতিক সম্মানলাভে আমরা গৌরবান্বিত।

১০. 'ময়ূখ' পত্রিকাটি কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 'জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা'র জন্য এই ক্ষণজীবী পত্রিকাটি এখনো আমাদের স্মরণে আছে। পত্রিকাটি একসঙ্গে পরিচালনা করতেন, যতদূর মনে আছে, ডাঃ ভূমেন্দ্র গুহ, বর্তমানে পেশায় ডাক্তার, শেঠ সুখলাল কার্ণানি হাসপাতালে কর্মরত, স্নেহাকর ভট্টাচার্য, ভারত-সংস্থা পরিচালিত একটি ব্যাঙ্কের জনসংযোগ অধিকর্তা এবং ড. জগদিন্দ্র মণ্ডল, ফলিত মনস্তত্ত্ব বিভাগে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ভূমেন্দ্র লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। স্নেহাকর আবার লিখছেন, একটি কাব্যগ্রন্থ কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, জগদিন্দ্র অধ্যাপনা ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত, তথাপি মাঝে মধ্যে কবিতা লেখেন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাত তিন-প্রহরের কবিতা

(বিষ্ণু দে, শ্রদ্ধাস্পদেষু)

আপনার কুশল জানি আমাদের কুশল। আমরা তো
ছিলাম একান্নবর্তী পরিবার ; এখন প্রবাসী।
তবু আপনার চিঠি পেলে ভাল লাগে, আর, যখনই নিজের ঘরে আসি
পিতার মতোই দেখি আপনাকে। একদিন যে সবিতাব্রত

আমাদের ভোরবেলায় শুনেছি আপনার কণ্ঠে, আজ আবার শুনতে হয় সাধ।
সে আনন্দ গভীর, অগাধ। হয়তো তাই আমাদের মনুষ্যত্ব।
তবু ভয় লাগে—
মানুষের রহস্যের শেষ নেই—মাঝেমধ্যে আপনাকেও বড় বেশী ক্লান্ত মনে হয় ;
যা আমার ভগ্নস্বাস্থ্য, ছিন্নমূল কবিতার গভীর বিষাদ।

১/২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

ফুটপাতের কবিতা

ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়।

যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা।
ফুটপাথে আজ জেগেছে জ্যোছ্‌না :
চাঁদ হেসে তার কপালে চুমু খায়।

লুকিয়ে মোছেন চোখের জল, মা।

ভয়

ভয় ঢুকেছে পাড়ায় :

বুড়ো জোয়ান-ছেলেকে বলে, 'চুপ'।
জোয়ান ছেলে বউকে বলে, 'চুপ'।
মায়ের বুকে শিশু দিয়েছে মুখ—
'চুপ! একটুও শব্দ না।'

ভয় ঢুকেছে ঘরে :

হাসতে শব্দ, কাঁদতে শব্দ—
শিশুকে নিয়ে কী যে করবেন মা?

স্পর্ধা

('বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি…')

স্পর্ধা করো কবি-কে; যে কবি
লুটোপুটি খেয়েছে নিজের রক্তে! তুমি
যেই হও ; সংস্কৃতির মঞ্চে
দু'দিনের কুলীন, অথবা বিদূষক ;

(জানি তুমি অধ্যাপক নও, তবে
সমালোচক তো বটে—)

জেনে রাখো : নপুংসক বামনের ঈর্ষা, ইতরতা
কবিকে করে না স্পর্শ। তার জন্য
আকাশের অনন্ত নক্ষত্রবীথি তারই মতো
বেদনায় নীল, প্রেমে জ্যোতির্ময়।

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

চিত্ত ঘোষ

অলৌকিক প্রতিবিম্ব

বাইরের পুরু পর্দাটা সরালে
ভেতরের অলৌকিক ছবি দেখা যায়।
অনেক দিনের পুরোনো আকাশের তারা দেখা যায়।
সে-তারা দূরবর্তী এক করুণ আগুনের
নিবে আসা তাপের মতো, ছায়াময় মুখের মতো,
মৃত গুটি পোকার মতো
যার গায়ে ছড়ানো অসংখ্য রেশমের সোনালী সুতোর ভাঁজ।
বর্ষার দিনে ভেজা বাতাসে হঠাৎ কখনো
লেবুফুলের গন্ধ পাওয়া যায়।

মনে পড়ে
সন্ধ্যা হলে যখন শঙ্খের শব্দ
উঁচু হয়ে মেঘের শরীর স্পর্শ করত
ধূপধুনো দেওয়ার সময় তখন
মায়ের হাতে ফুটত আরতির মুদ্রা।
আর গাছগাছালির জড়াজড়ি অন্ধকারে
আগুনের রহস্য ফোটাত অসংখ্য জোনাকি।
এখন ঘনিষ্ঠ জলের বুকে
অনেক দিনের পুরোনো আকাশের তারার মতোই
ভেতরের সেই দৃশ্যগুলো
অলৌকিক প্রতিবিম্ব হয়।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

কেন এলে

সেদিন আচমকা ঘুম ভেঙে দিলে
তোমার উজ্জ্বল মুখ ঘিরে ছিল কঠিন কুয়াশা
ছিঁড়ে ফেলে সেদিন আচমকা চলে এলে
কেন এলে

তোমার দু'চোখে এতো তাপ ?
সূর্যের অম্লান পরমায়ু নিয়ে তুমি
ছুটে এলে,
হরিণীর বুকে যত সাধ নিয়ে এলে
কেন এলে ?

ছিলে স্বপ্নে অগোছালো। এলোমেলো ভালোবাসা ছিল।
মেঘ শুধু বৈশাখের নামে গর্জে মরে
এমনি অঢেল ভালোবাসা এলোমেলো মরে যায়
সেদিন আচমকা ছুঁয়ে গেলে
কেন গেলে
সবি তো আচমকা জ্বলে ওঠে
তারপর অনন্ত সময় তার যন্ত্রণার কাল
আগুনের পরেও আগুন স্বচ্ছ শরীরে কোথাও ঠিক থেকে যায়
মৃত্যুর পরেও মৃত্যু কুঁড়ে খায় মৃত্যুর শরীর

তুমি কি এসব কিছু বোঝো ? জানো ?
ঘটেছে কখনো ওই কোমল শরীরে ?
কাকে ছুঁলে বৃষ্টি হয়, গলে যায়, ভেঙে যায় বিশাল পাহাড়
তুমি কি এসব কিছু বোঝো ? জানো ?

এই জীর্ণবাসে ঢের অন্ধকার ছিল নিরিবিলি
ছিল কিছু ভাঙা হাড়িকুড়ি কিছু গানের অঞ্জলি
তুমি যমুনার স্রোতে কেন এলে পাগল বাউল
কেন এলে
কেন শেষে এলে!

মানস রায়চৌধুরী

ক্ষোভ

সমুদ্র গুটিয়ে নিলো নীলাভ চাদর
পানীয়ে এখন ছায়া নেমেছে কী ঘোর
গর্বিত আকাশ থেকে নেমে আসে স্বর্গীয় সুষমা
প্রায় ধর্মগ্রন্থ যেন, এইভাবে ঢেকে ঢুকে চলা
যতো ক্রোধ হোক তবু বলতে হবে, ক্ষমা
ভিতরে ভিতরে সব দাহ নিয়ে তীব্র, তীব্র জ্বলা।

একদিন তো এসবের হবে অবসান
বাল্য কেটে গিয়ে আসবে যুবকের স্পর্দ্ধার দুপুর
পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে দেখা দেবে প্রাণ
মন উড়ে গেছে মহাশূন্তে, শূন্তে তার শেষ অভিযান
তারপর বৃষ্টিতে আকুল হয়, দূর
যবনিকা উঠে গিয়ে তোমাকেও শিশু করে তোলে
জানো সেই ছায়া ঘিরে তোমার সর্বস্ব ছিলো বলে
আমিও ফিরিয়ে নিই আমার কুয়াশাভরা লোভ
রৌদ্রে সব মুছে যায়, না মুছলে ভালো ছিলো এইটুকু ক্ষোভ।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ওই আসছে

আমি তো জেগেই আছি
দেখছি সব মানুষের ক্রিয়া ও কলাপ।
কলাপে বিভ্রান্ত হায় মুখাপেক্ষী মানুষ বেচারা
ওরা যে কী চায়
ঠিক নিজেরা জানে না। তাই
এক পতাকার থেকে অন্য এক পতাকার নিচে
ক্রমশ ভ্রমণ করে,
ঘেমে বাড়ি ফেরে, ফিরে শোনে
পতাকা ওদের কিছু দিল না, দেবে না।

বিপ্লব ঘনিয়ে ওঠে মেঘের মতন
বিপ্লব সশব্দ হয় কিছুক্ষণ বোনাসের আগে
তারপর বৃষ্টি নামে
ক্রোধ ধুয়ে যায়,
অসহায় মানুষের জন্যে আরো অসহায় মানুষেরা মিলে
বন্ধ গাড়ি ঠেলে, চাঁদা তোলে।
আপাতত ত্রাণ, ফের আগামী বছরে
রুখে উঠতে হবে।

কোথায় কে রুখে উঠবে?
অপমান সহ্য করা তার চেয়ে ভালো।
ঘুমের ট্যাবলেট খাও, ওই আসছে মনোরম শীত
ক্রমশ অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে রবীন্দ্রসংগীত।

দিব্যেন্দু পালিত

আবির্ভাব

নিমন্ত্রিতেরা সব চ'লে গেছে; দূরে
শোনা যায় শেষ ব্যক্তির
ক্রমশ হারানো গলা, সদরের চোখ-ধাঁধানো আলো
এইমাত্র নিবে গেল, ম্লানমুখ ভিখারী বালক
চোষ্যচোষ্য খেয়ে গাড়ি-বারান্দায় শোবার তাগিদে
চ'লে যেতে যেতে ভাবছে কাল
যেন কোনো গৃহস্থের অঙ্গন সত্যিই ওঠে ভ'রে।
তাকেই দেখতে দেখতে চেরা চোখে দারুণ সন্দেহে
আব্রু নষ্ট হলো ভেবে উঠল সধবা কুকুর—
সেইমাত্র হাওয়া
ডিউটি বদলে এসে প্রথম কর্তব্যে হাত দিল।

একটি শুকনো পাতা চ'লে যেতে চায় বহু দূর—
যেন ডানা-ভাঙা পাখি, একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে যায়
আবার এগোয়—
যাওয়াটাই মনে আছে, জানে না কোথায়, কোনদিকে!
সেদিকে তাকিয়ে
হাওয়ায় অল্প হেসে আনমনে দুঃখ এলেন।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রেম অপ্রেম

একদিন দু'ঠোঁটের ফাঁকে কোনো উচ্চারণ ছিল না
তবু বুকের ভেতর থেকে ঠেলে আসা কথাগুলি
কেমন শব্দপুঞ্জ হয়ে আর এক চোখে ধ্বনিত হতো

উজ্জ্বল দু'চোখ শুধু বিস্ফোরিত হয়েছে আবেশে
বুঝতে পারতাম অবলীলাক্রমে
নিমেষেই তুমি শব্দহীন বাক্যের
ভাবমূর্তি স্পর্শ করেছো
দু'চোখের ভাষা অতঃপর হৃদয় ছুঁতে ছুঁতে
একদিন প্রেম হয়ে যায়

তারপর ক্রমশ দিন গভীর হলে সঞ্চিত শব্দপুঞ্জে
অস্থির হাওয়ায় সেই তুমি
ক্লান্ত হয়ে ওঠো উচ্চারিত
দিনযাপনের কথামালায়
কিছু শোনা এবং কিছু না-শোনা,
ভুলে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে
একদা ঘনিষ্ঠ উচ্চারণ দগ্ধ হয় তাপে

এবং অতঃপর সেই আমরা কি
ডুবে যাই না অপ্রেমে !

কালীকৃষ্ণ গুহ

জল

জল আসে
কোথা থেকে আসে রাগী ও বিষণ্ণ জল!
মৃতের শরীর ভেসে আসে, ভেসে আসে কাঠ, তুলো, স্তিমিত গর্জন
আর মানুষেরই লুপ্ত সর্বনাশ!
কোথা থেকে আসে এতো জল! জল!

মানুষের লক্ষ লক্ষ চোখ জল দেখে সারাদিন সারারাত জল দেখে—
লক্ষ লক্ষ পাথরের মতো স্থির চোখ!

সেই কবি

ক্রমেই একা থেকে আরও কঠিন একা হ'য়ে যায় সেই কবি।

আমরা তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করি,
তার জন্মদিন
স্তিমিত আলোর মধ্যে অজ্ঞাতসারে ঝ'রে যায়।

তবু তার পুনর্জন্ম আছে!

জন্মদিনের কিছু ধুলো তার বিষণ্ণ শরীরে এসে লাগে, চোখে-মুখে লাগে।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

জ্বরের রাতে

সত্তা কাঁপে তৃষ্ণায় অস্থির
জ্বরে জ্বলে অলক্ষ্য সর্বাঙ্গ
ভালোবাসা কোথায় ডাক্তার?
আশা নেই তবে কি স্বস্তির?
ভোর আসে, একটি তারার
অনামী পালা কি হবে সাঙ্গ?

নক্ষত্র কি ঘুমের নাগাল
পাবে ? আধো ঘুমে জাগরণে
নানা ইচ্ছা জোড়াতালি দিতে
আমি ডালি শিরিকো শাগাল,
প্রতি মুহূর্তের স্বপ্নায়নে
কত স্বপ্ন মরে পৃথিবীতে।

স্বপ্ন ? নাকি বোধ এক অনন্ত ?
জ্বরে তপ্ত আঁধারে পেলাম
কার ছোঁয়া, স্নিগ্ধ শাঁখা-হাত
ভালোবাসা,
তুমি বাকি রাত
কোটি পূর্ণচন্দ্রের লাবণ্য।
বেদনা প্রেমের অন্ত নাম ॥

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ফেরাবে দখলে

আমি বিদ্যুতের তারে ধরি মুখ। আঙুলে বিদ্যুৎ
ছুঁই, চুপ, শব্দহীন—ও মুখ তোমার ভালবেসে।
বন্দী কাঁটাতারে, ছেঁড়া, রক্তে ভাসা—চাবুকে অদ্ভুত
আমি এইধারে।...তুমি দাঁড়িয়েছ ওইধারে এসে।

সাক্ষাৎ-শেষের ঘণ্টা। কথা নেই। শুধু দেখি চোখ,
চোখের আগুনে তীক্ষ্ণ কোন্ ভাষা এনেছ এবার।
গরাদে রেখেছ হাত সাড়া দেয় মাংসে চাপা ন'খ,
যাও মাটি, জন্মভূমি ফিরে যাও আড়ালে আবার।

শিকড়ের জন্ম তুমি, তোমারই অনন্ত শেষ কাজ
করে যাব তাই ঘুম ছিঁড়ে রাত গোপন শাবলে
সুরঙ্গ বানিয়ে ক্ষিপ্র সকলের মুক্তি আনি আজ।

জানি তুমি আমাদের ভালবাসা ফেরাবে দখলে।

প্রাসঙ্গিক

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল যে মেয়েটি—তার নাম 'মাটি'। নানাভাবে অন্তরীণ, বন্দী বা দণ্ডিত এইসব মানুষ আর তাদের সঙ্গে দেখা-করতে-আসা-মেয়েরা পৃথিবীর মানচিত্রে গেছে আজ।—সমস্ত বিশ্বজগৎ বলে যা কিছু, তার আয়তনটা আজ ১৯৭৮ এর শেষ ভাগে দেখছি আমরা, অনেক ছোট হয়ে এসেছে, ফলে, যে-দেশের আদৎ মুক্তিসংগ্রামকেও আর সুদূর বলে মনেই হয় না। ঐ ছেলেটি-মেয়েটি তাই আমাদের দেশ থেকে ছড়িয়ে গিয়ে বাইরের দেশ থেকে আমাদের হয়ে গিয়েছে।

ঐ রকম দুজন'কে নিয়েই মহাকাব্য লেখার যে পরিহাস বা প্রহসনে নামতে যাচ্ছিলাম, তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা খণ্ড, সাংকেতিক খুচরো কবিতার (কবিতা হয়েছে কি?) চেহারার বাইরে আর আনা গেল না—ঐ বারোটি পংক্তির মধ্যেই সংযত থেকে গেল। আর আশ্চর্য, কি-রকম একধরনের অস্বস্তি আর লজ্জা যেন আমার আজীবন কালের যা-কিছু সামান্যতম অভিজ্ঞতা ছিল—তার মূল ধরে টান মেরে ঝট্‌কায় উপড়িয়ে ফেলে দিয়ে গেল। আমারও ধৃষ্টতার সীমা নেই, তা নইলে ও ভাবে ব্যাপারটাকে খুলে ধরতে গিয়ে বেশ যুৎসই অন্ত্যমিল-টিল আর উচ্ছ্বাস-দুঃখ-আবেগ টাবেগ দিয়ে বারো পংক্তির একটা কবিতারচনার কাজেই শেষমেস হাত দিলাম? মূর্খ আর কাকে বলে?…কেননা, খবর না পেলেও, এটুকু জানতে কোনো

অসুবিধেই নেই যে, এসব ছেলেমেয়েরা ভালবাসার দিনগুলোকে বাজি ধরে, মৃত্যুর মারাত্মক আঘাতকে একেবারে তুচ্ছ করে দিয়ে, জীবনকে ছিনিয়ে-আনার-দিগন্তে দিকে হাঁটে!...এদের মহান বর্ণনা দিতে গেলে যে অধিকার আয়ত্তে থাকা দরকার, তা ক'জনের আছে?

তবু, মূর্খরাও তো কখনো-কখনো একেবারে নিজের কথাই বলে—কিছু বলতে চায়! আমি অবিশ্যি কখনোই কোনো বক্তৃতার মধ্যে না-গিয়ে, নিঃশব্দে একটু-আধটু লেখালিখির চেষ্টা করেছি মাত্র। আমি অজ্ঞ। অন্ধ। এবং এখনো, মানে, আজকের তারিখ পর্যন্ত খতিয়ানে আমি হয়তো আগাগোড়াই একটা অঘোষিত কাপুরুষের ভূমিকায় থেকে গিয়েছি। বদলাই নি নিজেকে, বরং বদ্‌লে যেতে ভয় পেয়েছি। এটা সত্যি।—কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে এই স্বীকারোক্তি করার সাহস আমার আছে যে, আমি মূর্খ বটে—কিন্তু, অযথা-গর্বিত, আত্মসন্তুষ্ট, অজস্র অর্বাচীনদের হাঁটা-রাস্তায় চলাফেরা তো দূরের কথা, দুঃস্বপ্নেও পা ফেলি নি। এবং, আমার সাধ্যমত নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধির কসরৎ সম্পর্কিত এক্তিয়ার বা এলাকার সীমা অযোগ্য ভাবে ছাড়িয়ে-বেরিয়ে-যাওয়ার সব অভিযোগও আমি সর্বাঙ্গ দিয়ে শুনতে চাই, বুঝতে চাই···অনবরত অপমানের মধ্যেও অন্তহীন সংগ্রামরত অমর মানুষের কাছে হাঁটু ভেঙে এই তালিম আমি নিতে চেয়েছি বহুবার।

আরেকটুখানি না বললেই নয়। সেটা হল—যে কোনো লেখা শুরু করতে-করতেই আমার মনে হয়, এইটাই আমার শেষ লেখা—হয়তো-এর-পর আর কিছুই লিখে বলবার সুযোগ পাবনা!... মৃত্যু, মস্তিষ্ক বিকৃতি, অপঘাত বা নিদেন পক্ষে 'অনিচ্ছা'র শিকার হতে কতক্ষন লাগে?—তাই অসংখ্যবার নিজের অনেক লেখা-ই শুরু হতে-না-হ'তেই কিংবা, আধাআধি অবস্থায় পৌছনোর আগেই নিকেশ করে দিয়েছি। আবার, বহু রচনাই ছাপতে দিয়েও খুঁত খুঁত করেছি, এমনকি ছাপা-হয়ে ছড়িয়ে গেলেও অসন্তুষ্ট থেকে গিয়েছি—যেন অপরাধ-করার-পরের মন নিয়ে পালিয়ে বেরিয়েছি।

আমার জীবনযাপনটাই এরকম। খালি খালি মনে হয়, গোটাটাই ফাঁকি দিয়ে কেবল চালাকির ওপর আছি, জনগণের বোধবুদ্ধিকে ঠকাচ্ছি কবি

সেজে।—তাই ঐ ছোট্ট লেখাটার প্রসঙ্গে এত ব্যাখ্যা বিবৃতি দিয়েই আমি যে-কে-সেই উদ্বিগ্ন আর ব্যাকুলই থেকে গেলাম। 'লিখে দিয়েই খালাস' হতে আমি, পারি না। 'কি' 'কেন' আর 'কার জন্যে'—এই তিনটে প্রশ্ন চিহ্নকেই আমি আমার উত্তরণের দিক্‌চিহ্ন বলে মনে করি।

শান্তিকুমার ঘোষ

চার নগর : মস্কো

যখন বিপ্লব চত্বর পার হ'য়ে আমরা পৌছলাম রেড স্কোয়ারে
স্তম্ভের চূড়ায় জ্ব'লে ওঠে নি নিশ্চিত লাল তারা
গাম্ভীর্য ও গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মসৃণ কালো
আর লাল পাথরের স্মরণ-সৌধ
বিশাল জনতার হৃদয়াবেগ অবনত সোপান পংক্তিতে
ওধারে নীলের বিরুদ্ধে জেগে রয়েছে বর্ণাঢ্য গম্বুজমালা
লতাপুষ্প বেড়ে উঠছে থামগুলি ঘিরে
পলক পড়ে না স্তম্ভিত চির-সৌন্দর্যের সমুখে
কবে থেমে গেছে মহৎ ঘণ্টার ধ্বনি প্রাসাদ-চত্বরে
সারিবদ্ধ ফার তরু নব হরিৎ তৃণশষ্প নির্বাণহীন অগ্নিশিখার
সুযোগ্য পশ্চাদ্‌ভূমি

টীকা :
পূর্ব ইউরোপের চারটি নগর নিয়ে শান্তিকুমার কবিতা লিখেছেন। প্রথমটি ২৫ বর্ষ ২-৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এবার মস্কো-বিষয়ক, এর পরে বাকি দুটি কবিতা যাবে। : সম্পাদক

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

সে লিখবে

রাস্তায় আলো থেকে এক চিলতে এসে পড়েছে বারান্দায়
কাজ সেরে মেয়েটি গভীর রাত্রে সেই আলোয় গল্প লিখতে বসল।
সে লিখবে, জীবনের কাছ থেকে সে একদিন দুর্লভ উপহার পেয়েছিল
জীবনই সে উপহার আবার কেড়ে নিয়েছে।
তার নালিশ, যদি দিলে—কেন কেড়ে নিলে
একবার স্বাক্ষর হলে আর কি অজ্ঞতায় ফিরে যাওয়া যায়?
সে লিখবে, ঈশ্বরী হয়েও ভিখারি
প্রার্থিত হয়েও সে চিরপ্রার্থী কেন।

মেয়েটির খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন
সে নিজেকে কাঁদতে দেখল
আর তখনই বেমক্কা লোডশেডিং
পাড়া জুড়ে আছড়ে পড়ল
বিশাল ঠাট্টার মতো।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতা তিনটের নাম দিলাম নবীন গৌড় বাংলা

মাথার সমস্ত চুলই একেবারে সাদা, তবুও নবীনতা আজও ঘুচল না। একি বিড়ম্বনা এই বাহাত্তর বছর বয়সেও। কেননা সত্যি এখনও আমি নিয়মিত 'নববর্ষ সংখ্যার জন্য ভগ্নদূতে নবীনেরা ছোট কবিতা পাঠান।' এ ধরনের বিজ্ঞাপন কোথাও দেখলেই, দুটো চারটে শব্দ সাজিয়ে গুছিয়ে কবিতা একটা করে বানিয়ে, ছুঁড়ে মারি সম্পাদকের কাছে, 'নিন মশায়' একখানা। সম্ভবত আমিও এক ভূত। অন্ধকার জগতের থেকে, আত্মমগ্ন, স্বপ্নমগ্ন-দূত। চৈত্রের আকাশ ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে, মরণ।—অবশ্য মরণ। জলন্ত বৈশাখ বরণ? কৃষ্ণচূড়ার শূন্য শাখা কি তাই সহস্র সহস্র ডাকিনীর নখের মত নিষ্ঠুর হয়ে হৃদ্‌পিণ্ডকে

থামচে থামচে ছিঁড়ে খেয়ে নিতে চাচ্ছে? আমার রক্ত কি দেখব ওরই অজস্র লাল লাল ফুলে।—কেননা কোথাও মেঘ নেই; জল নেই এতটুকু। অথচ আশ্চর্য, এবং দুঃসাহসও বটে, ওই প্রাচীন, ভাঙা পোড়ো বাড়ীটার, (আর আমার কপালের মত) কঠিন মসৃণ শ্বেত পাথরের উঠোনের চত্তর ফুঁড়ে ছোট্ট একটা অশ্বথের চারা মাত্র তিনটে পাতাকে নিয়ে নাচাচ্ছে বালক আনন্দে; তির তির। তির তির। তির তির। সিদ্ধান্তেও কি স্থির, বাচ্চা চারাটা (অশ্বথটা) নির্জলা পাথর চত্তরে!—কিনা একদিন চারাটা বড় হবে। অশ্বথ ছায়া দেবে। —পথচারীরা বসবে ওর তলে, আর কিনা হাজার পাতায় হাওয়া দেবে ঝির ঝির ঝির ঝির ঝির ঝির। পাখীরা ওর ডালে কিনা করবে কিচিরমিচির, কিচির-মিচির। খাসা গল্প একখানা, সাদা চুল মগ্নদূতের; গাছটা পাগলা গাছ নিঃসন্দেহে! গাছটা সত্যিই পাগলা। তবু পাতা তিনটের নাম দিলাম 'নবীন' 'গৌড়' 'বাংলা' ওদিকে অন্নদা শঙ্কর রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, আর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—ওঁরা পশ্চিমবঙ্গের নতুন নামের নামে, যেমন খুশী করুন গবেষণা। এখন আমার সামনে নাচুক 'নবীন' 'গৌড়' আর 'বাংলা' ধীরে ধীরে না হয় আমার স্বপ্নের মধ্যেই বড় হোক, ঝড় জল বজ্রাঘাতকে অতিক্রম করে—'নবীন গৌড় বাংলা'।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ছুটি সংক্রান্ত

১. ছুটে যাই সব কাজ ফেলে,
মাঝে মাঝে ইস্কুলের ঘণ্টা বাজে শুনি,
পাখিরা তখন ওড়ে দূরবর্তী জলের কিনারে,
ঘুমের আলস্য ভাঙে ভোরের বনানী।

২. পাঁজিতে রয়েছে লেখা, সূর্যোদয় পাঁচটা পনেরোয়
তবুও ভাঙে নি ঘুম, অন্ধকার জেগে আছে জলঝীর জলে।
পাখিরা ওঠে নি ডেকে, ঘুমের সময়
বাড়িয়ে দিয়েছে মেঘ অপূর্ব কৌশলে।

জগদীন্দ্র মণ্ডল

বুকের ভিতর বড় অন্ধকার

মানুষের বুকের ভিতর বড় অন্ধকার,
ভীষণ রুদ্র, অনন্ত পিপাসার তীরে
এই নির্বেদ পিপাসার তীরে, একবার দাঁড়াতে দাও।
ঐ কালো ঘোড়া চাবুক খেতে খেতে যাক বহুদূরে।
নখদন্ত সজ্জিত মানুষ, এবং এক ভয়ঙ্কর চীৎকার;
দ্বার বন্ধ,
কেবল আমারই মুখ—আমার আমার।
এখানে ভীষণ অন্ধকার; তবু যদি পাই গোলাপ,
গোলাপের মুখ দেখে পরিশুদ্ধ ভোরবেলার রহস্য।

বাসুদেব দেব

চেনা জানা

আমাদের পোষাক আশাক ধোপা বাড়ি চলে গেছে
ঘড়িও সারাতে গেছে চশমার কাচ বদলাতে
দোকানে দিয়েছি কলে দাঁত কটি পরিষ্কার জলে
খুলে রাখা গেছে আজ
আজ ছুটি আজ এসো
ঘর নয় ঘরে চুনকাম হবে বুকে নয়
বুকের প্লাস্টারে একবিংশ শতাব্দীর অদ্ভুত তারিখ
চলে এসো কাছে দেখাশোনা চেনা জানা হবে
কি করে তা হবে আমাদের নামগুলো গতকাল রাতে
বদলানো হলো সব, তবু এসো অচেনা মানুষ
ভালো লাগে, ঐ ভালো লাগা শুধু, ভালোবাসা
বানাতে দিয়েছি গতকাল।

শরৎসুনীল নন্দী

প্রতিশ্রুতি রাখো

প্রতিশ্রুতি রাখো,
যৌবন প্রহত হয় ঢেউ তোলে
অথচ পদ্মের মতো পাপড়ি মেলে,
সময় জাগে না।

সে আমাকে বলেছিল—নষ্ট প্রহরের শেষে
রক্তিম মুহূর্ত মেলে চোখ
মোহময় আর একটি জীবন
সেই অপেক্ষায়
আজো বুকের ভিতর শব্দ ধ্বনিময় আবর্তিত :
প্রতিশ্রুতি রাখো।

দেবপ্রসাদ ঘোষ

জর্ণাল '৭৫

রাজা, তোমার সেনাপতিকে বলো
সঠিক বিন্দুতে সাজাতে বন্দুক।
সব থেকে নৃশংস এবং হিংস্র।
নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পৌছবো ঠিক,
সঠিক বিন্দুতে সাজাও বন্দুক
সব থেকে নৃশংস এবং হিংস্র।
আত্মা, বোধি, চৈতন্য সত্তা সব দেবো
ঠিকঠাক তালিম দিও। বন্দুক যেনো না হয় বিকল।

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

সময়হীন

সেতারের তারে নাচল তোমার আঙুল থরথর
এ কি আগুন আগুন আগুন
শব্দ জ্বলে ফুল্‌কিগুলো নেচে বেড়ায় বাতাসে।
সময় কি আজ বন্দী স্থির অপরিবর্তন
সমন্বয়ের মৌলিক উৎসবে।

নাকি, সেতার জুড়ে ত্রিকালজয়ী ঝঙ্কার।

কবিরুল ইসলাম

পুনশ্চ

তেমন ভালো এখন আর কিছুই না
অসুখের পর প্রথম দিনের পথ্যে তেতো খেতে যেরকম ভালো
একদা যেমন ভালো ছিল
তোমার মূল চিঠির চাইতেও পুনশ্চের সেই সব অমূল ডালপালা
প্রথম বয়স দুহাত উপুড় করে বলে, নাও,
আমাকে লুণ্ঠন করো
আজ আমি শুধু অনভিপ্রেত সাক্ষী হয়ে পড়ে আছি
সে যা দেয়, বেলা ঘুরে যেতে না যেতেই কেড়ে নেয়
তার হাজার গুণ বেশি
ফলত, সে চিঠি নেই, সে পুনশ্চও আর নেই।

দেবী রায়

খুঁজতে-খুঁজতে, আমি একদিন

খুঁজতে খুঁজতে, আমি একদিন ঠিক-ই
পেয়ে যাবো তাকে
অন্তরের নিহিত শান্তি, পরমার্থ…
আবাল্যের সহচর, এলাকা ভিত্তিক
যা ছিলো নিবিড় ভালোবাসা
স্মৃতির মহিমা ও ঐশ্বর্য্য…

কৌমার্য্য…… ?
যা ছিলো, হৃদয়ের তাকে ।

প্রদীপ মুন্সী

মন মানে না

সব কিছু ধুয়ে মুছে জল চলে যায়
জলে কিছু থাকে না কখনো
তবে কার ওই ঠোটের ক্লান্ত দাগ
জলে লেগে আছে
অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে জলে
কে এসেছিল একা একা
হাওয়া কিছু জমিয়ে রাখে না কখনো
তবে হাওয়ার গভীরে কার শেষ নিশ্বাস
চুপ হয়ে আছে
অনন্ত শূন্যতা নিয়ে হাওয়ায় কে
এসেছিল একা একা
আঁধারে একলা ঘরে মন মানে না

প্রদ্যুম্ন মিত্র

ইচ্ছা

ইচ্ছে হয় জানাশোনা থাক
এমন একজন মহিলার সঙ্গে
সারাদিনের বিরামহীন উদ্‌ভ্রান্তির পরে
যাকে মনে হতে পারে
ঘরের চুল্লীর ওপরে জ্বলতে থাকা লাল আগুনের মত।
যেন কেউ তার খুবই কাছাকাছি বসে পড়তে পারে
চারপাশে গোধূলির রক্তিম নিস্তব্ধতা নিয়ে
আর সত্যিসত্যিই পেতে পারে উপভোগের আনন্দ
ভালবাসা দেখানোর ভদ্র চেষ্টা
এক পরিচিত হবার মানসিক উদ্যম ছাড়াই ;

যেন কোনও রকম ঠাণ্ডা লাগিয়ে
তার সঙ্গে কথা বলা, কথা বলে যাওয়ার মতন।

মুরারিশংকর ভট্টাচার্য

ঝড়

কখনো সখনো ঝড় ওঠে
তছনছ হয়ে যায় ফুলের বাগান
ভেঙে যায় ডালপালা
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়
সমস্ত কুসুম।

কখনো সখনো ঝড় ওঠে
নাটমঞ্চে নিভে যায় আলো
নায়কের পীতবাস পড়ে থাকে
অন্ধকারে, প্রতিশ্রুতিহীন।

গোকুলেশ্বর ঘোষ

অজ্ঞাতবাস

কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস
যেমন পাণ্ডবগণ সূচ্যগ্রভূমি না পেয়ে
বারনাবতে আশ্রয় নেন ;
জতুগৃহ দাহ হলে
আবার যুদ্ধের মহড়া।
নির্জনে ফুলের প্রস্তুতি
কুঁড়ির সমাদরে মন ওঠে না
ঠোঁটে হাসি
সুতরাং, ফুল ফোটাবার জন্য
প্রস্তুতি বদি নিতে হয়—
রাসায়নিক সার দিতে হবে
ফুলের সমারোহ বাড়বে
ফুল বড় হবে।
সেই ফুল, বলাই বাহুল্য, পুজোর নয়, টেবিল সাজাবার।

পরেশ মণ্ডল

উপনিবেশ

আমরা সবাই প্রবাসী। ঘর গড়েছি। নদীর জলে স্নান সেরে রোদে কাপড় শুকিয়েছি। ফল আর মাংসে খিদে মিটিয়ে গালগল্পে মেতে আছি। সুযোগ মতো হাতিয়ে নিচ্ছি অপরের জমি।

নিজে মানি না, সবাইকে উপদেশ দিই। আমরা সবাই প্রবাসী। মুখোসে ঢেকে রাখি মুখ। কথায় ঢেকে রাখি কথা। গান দিয়ে ঠকিয়ে দিই মনকে।

জোর দিয়ে রুখে দিই যুক্তিকে। নাম দিই ধর্ম। নাম পাল্টে বলি রাজনীতি। রীতিনীতি এরকম।

আসলে আমরা ভালোমানুষ। আসলে পৃথিবী এক উপনিবেশ। আমরা আগন্তুক। আমরা সবাই প্রবাসী।

বিমান ভট্টাচার্য

তুমি চলে যাবার পর

তুমি চলে যাবার পর
বাতাসে ঝড় উঠলো
তুমি চলে যাবার পর
মুখ ভার করে মেঘ এলো!

তারপর, তুমি এলে
মজলিস জমানোর মতো
এমন অনেক কিছু অনাহূত চলে আসে
অথচ তোমার পায়ের শব্দে
রং বদলায় মুহূর্ত পরিবেশ।
ফুলের মতো তুমি ফুটে ওঠো সকালবেলা
কার জন্য
আর বিকেল হলে কান্নার মতো ঝরে যাও!

অমল ভৌমিক

এখন আমি রাজার মতো

এখন আমি রাজার মতো। অন্ধকারে
গোটাকয়েক বালিয়াড়ি পার হয়ে যাই
এখন আমি অনেকখানি
সাহস রাখি বুকের ভিতর
নিজের জীবন নিজে নিজেই নিজের জন্যে খুঁজে বেড়াই
এখন আমার ভয় করে না অন্ধকারে
আগুন জ্বালি
যখন তখন জ্বালতে জানি
চোখের আগুন মনের আগুন বুকের আগুন
বুকের মধ্যে জ্বালতে জানি।
সাত সমুদ্র তেরো নদী, তেপান্তরের মাঠের শেষে
এখন আমি সঙ্গীবিহীন চলতে জানি নিরুদ্দেশে
বজ্রবাহন বন্ধু আমার তাও চলিনে তাহার সাথে
কালপুরুষের হাতের ধনুক এখন আমার নিজের হাতে।
সূর্যপাতের এই প্রভাতে সিনান করি। অহংকারে
আলগে রাখি ময়ূর সিংহাসনে
এখন আমি রাজার মতো।
জীবন দিয়ে পূর্ণ করি
বুকের ভিতর নিজের জীবন।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি

খাতার ওপর ঝুঁকে আছেন
পলক নেই চোখে,
একটা শব্দ কেঁদে উঠলে
একে সরিয়ে ওকে
যত্ন ক'রে শোয়ান।

চমৎকৃত হবার ভয়ে
চোখ রেখেছেন কানে,
কানকে পাছে অন্ধ করে
নিরবয়ব গানে,
রাতের ঘুম খোয়ান॥

জয়ন্ত সান্যাল

আজ একা

মৃত্যুর হাত ধরে সময় ডিঙিয়ে পাশাপাশি দুল্‌কি চালে
নির্বিকার হেঁটে যেতে পারে ইচ্ছেরা ছায়াছন্ন বিন্দুর মতো
বহুক্ষণ, যেন সমতলে রাস্তা পরিষ্কার, মসৃণ সরল সোজা
চলে গেছে স্বর্গের কাছাকাছি, কোথাও হোঁচট্ খাওয়ার
এতটুকু ভয়টয় নেই, খুশীমতো বিশ্রাম চাইলে মহীরুহ
আছে, একটু সময় বসবার জন্ত ছায়াতল বেদী, সূর্যকে
আড়াল করে গুটিকয় পান্থশালা।—
জ্যোৎস্না অথবা চন্দ্রালোক, সবকিছু ঠিকঠাক আছে
জোনাকি একটিও নেই, সেই কবে তুমি পথ চিনিয়ে
স্বর্গ ছুঁয়েছিলে, আজ ইচ্ছেরা একা।

শান্তা চক্রবর্তী

দক্ষিণের দিকে

কোন কোন ব্যক্তি, সে যুবাই হোক প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ
তাকে দেখলে শ্রদ্ধা কেমন জল হয়ে যায়।
কোন কোন সময়, দিন কিংবা রাত তা যতই অল্প হোক।
হৃদয়কে অনায়াস দ্রব করে ফেলে।
সারাটা জীবন ধরে আমি এমন ব্যক্তি বা সময় খুঁজেছি।
সমুদ্রে
আকাশে
মাটিতে
আর মনের ভিতরে।
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমের জানলায় জানু ভেঙে বসি।
চোখের জমিতে অন্ধকার, সব জল শুকিয়ে গিয়েছে।
সেই ব্যক্তি সেই সময় এসে নাকি কে জানে কখন
ফিরে চলে গেছে দক্ষিণের দিকে।

মধুমাধবী ভট্টাচার্য

সুদূর প্রাচ্যে কোনদিন যদি

গলিটার পথ-শেষে এ বাড়ীটার খোঁজ আছে
জেনে, আরও কত আঁক-বাঁক
শহরের উপপ্রান্ত ঘুরে
বছরকার ইতিহাস কেটে যায়।
তবু চলা
সুদূর প্রাচ্যে কোনদিন দেখা হতে পারে বুঝিবা।

কেমন অসহায় দেখ।
রাজপথ বিস্তীর্ণ এলাকায় আমি নিষিদ্ধাচারী
অথচ,
এতটুকু দরজা ফাঁক কোথা—দেখতে পেলে
যাওয়া যায়।
অতএব সেই সুদূর প্রাচ্যে কোনদিন যদি…

অনুপ মতিলাল

দিগন্ত থেকে কেউ

সব ডাকে পিছু ফিরে তাকাতে নেই
তবু তুমি অস্পষ্ট, তোমার নাম ধরে
পাখি ডেকে ওঠে। সাড়া দাও
কেন বালিকা? একবার এমনই এক
দুপুরে ধূ ধূ দিগন্ত থেকে কেউ
ডেকে ওঠে, সাড়া দেয়, আর
সামনে ফিরে তাকায় না বালিকা

অয়নান্তে দেখা গেল সে অস্ত গেছে।

বাসুদেব গুপ্ত

লাল ফিতে

আমাদের দুপুরবেলা, চিকটুপটাপ নীল পুকুরে মাছি তাড়াচ্ছে মরা মাছের কান্‌কো।

বড় ঝিমঝাম এই আড়া দুপুর, অন্তঃপুরে টেনে নিচ্ছে ভাবনার সব রং
তিরতিরে মথ রোদের গায়ে পৃথিবীটা হেলে যায় অবল ইথারে
অথচ গুঞ্জন স্পষ্ট, বড়ই উজ্জ্বল, কলাবতী চুল দুলে যায়
ধানের শীষের মত দুগ্ধবতী অহংকার, দুধে নয় বিষে।
একবার হৈ হৈ করে ফর্সা গেঞ্জী পরে নাগরদোলায় দুপাক খেয়ে
মোয়াওলার চারদিকে লাল ফিতে ওড়াবো কি ?

এখন দুপুর।

বোকাসূর্য চোখবন্ধ হেঁটে যাচ্ছে চারিদিকে,
বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ে অদৃশ্য ফেরিওলা—
ফিতে চাই—লাল ফিতে মাইল মাইল .....

অশোককুমার মহান্তী

মেঘের রহস্য

মৃত্যুও অসম্ভব নয় একথা জেনেই মেঘের রাজ্যে পাড়ি দিল
সেই এক সহস্র শকুন
ওরা যখন দলবদ্ধ হয়ে আকাশে তাদের প্রথম ঝাপ্টানি তুলল
তখন মর্ত্যের মাটি থেকে তিন হাত উঁচু পর্যন্ত বাতাস
আপন আপন স্তরসীমা অতিক্রম করল,
প্রথম স্তরের বাতাস ঝাপ্‌টানি ফেলো দ্বিতীয়ে
দ্বিতীয়—তৃতীয়ে এবং অনুরূপভাবে

একের পর এক···

ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে এবং অনন্তকালের জন্য

ঠিক সেই সময়ই তিনযোজন পথ অতিক্রম করার পর

সহস্র শকুনির সঙ্গে আরো এক বৃদ্ধ শকুনের সাক্ষাৎ হল

তিনি আশ্চর্য দু'টি চোখ মেলে যাত্রার ছন্দ এবং ছন্দের তালে তালে

নৃত্যরতা কচি মেয়েটির পাগল-পারা হাসির

ত্রিদিব বিমোহন শক্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন।

অথচ বাধা দিলেন না সেই অভিযাত্রীদের একটিকেও।

একমাত্র কবি ছাড়া আর কেউ হয়তো এই রহস্য অবধান করলেন না।

হিমাংশু বাগচী

নির্জন দুপুরে শোকসভা

তোমার নিজস্ব ছায়ার পাশে

মিলিয়ে নাও পুরাতনী সুর

ভাখো, এই নির্জন দুপুরে

তুমি এবং তোমার ছায়া কিংবা উপছায়া

কতো আর্দ্রমমতা বুকে নিয়ে

বেড়ে উঠছে নতুন ভঙ্গিমায়

তুমি ফিরিয়ে নাও আয়নায় মুখ

ভাখো, কত শোকসভা বয়ে যায়

নিজস্ব অনুভূতির অন্তরে

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

আবহমান

তুমি ফিরে আসছ, ফিরে যাচ্ছ
আবহমান কাল ধরেই তোমার
চলা দেখছি
এমনি তোমার অস্থিরতা আরো
অস্থির করেছে
হয়তো কখোনো অপেক্ষায় ছিলো অতল গভীর।
দুঃখের মালা ছিঁড়ে অজস্রবার
আমার কাছেই ফিরে আসছ, ফিরে যাচ্ছ।

সুমন্ন জোয়ারদার

বিষণ্ণ কাতর সব রাত

মেঘের বুকের থেকে সংগোপনে
ঢেকে রাখি
বিষণ্ণ কাতর কোন
মায়াময় বীথি
বিরক্ত দুপুর যেন ফিরে যায় অলৌকিক।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাকে তুমি মুক্তির তার পাঠাও

মাঝে মাঝেই খ্যাপাটে বাতাসে ঝড়ে পড়ছে নিম ফুল
কালো পিচের রাস্তায়
ঝড়ে পড়ছে রাশি রাশি চুম্বনের শব্দ বাতাসে
নির্জন এপ্রিলের দুপুর
চোখের জল আর বুকভরা বিষণ্ণতায়
তাকে তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়তে ব'লো না
ভালোবাসার নতুন সমুদ্রতীরে
জোয়ারের মত উদ্বেল, একা একাই
যেখানে তার ঝড়ের দিনের সঙ্গী
অপেক্ষা করছে ভাঙ্গা নৌকায়
তুমি তাকে সেইদিকে পা ফেলবার সাহস দাও
হে সুদূর রৌদ্রমুখর আকাশ
বাঁধন-ছেঁড়া গানের ঐশ্বর্যে
তাকে তুমি মুক্তির তার পাঠাও

উদয়ন ভট্টাচার্য

সে এসেছিল একদিন

ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত সে আমার কুটীরে
জ্বালালো আগুন প্রকাশ্যে
এবং তার ভিতরেও যে তখন পুড়ে যাচ্ছিল আগুনে
ভেঙে যাচ্ছিল দ্বিধায়
আমি তা জানি।

সুব্রত সান্যাল

নিঃসঙ্গ রাজা

তুমি চলে গেলে অন্ধকারে
নিঃশ্বাস নিই মুক্ত বাতাস, তুমি
বলে গেলে আমি রাজা, আমি
খুঁজি ঘরের আনাচে কানাচে, কোথায়
লুকিয়ে আছে শৈশবের খেলার সাথী আমার।
তুমি ভালবাসলে মনে হয়
ঘরের কোণে দুই বিড়ালছানার লুকোচুরি।
হাসলে মনে হয়,
তুমি রাজা, আমায় দেবে
কঠিন শাস্তি এবার।
তুমি ভাবলে, আমি ভেবে দেখি।

পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান

সুন্দরের ভাঙা শব্দাবলী

রৈ রৈ করে যাচ্ছে হাওয়া উত্তর অরণ্য থেকে দক্ষিণ সাগরে
ঘূর্ণি ঝড়ের সমর্পিত বুকে ক্ষয়ে যাচ্ছে হলুদ ধানের ক্ষেত
আমার পরিচয় জানতে চায় না বাতিঘরের লাল-নীল আলো।
লঞ্চের বাঁশি, ফেরিঘাটের নৌকোর মাঝি
আমাকে ক্ষমা করো, আমি বলতে পারি না চক্রবৃদ্ধি সুন্দরের
ভাঙা শব্দাবলী

আত্ম-প্রতারণা নয়, বুকের ভেতর জমা আছে
যে কোন শীত-ভোরের নির্জন প্রবাস, নিষ্প্রদীপ গ্রীষ্মাবাস,
সম্মোহন, আরো কতকিছু।

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গত বছরে

গত বছরে এখানে এসেছিলে
তাই এসেছি এই বছরে।

গত বছরে তোমার হাতে বৃষ্টি ছিলো
বৃষ্টির গন্ধ মেখে নিয়েছিলাম
চুলের ঢালে নদীর মায়া
হলুদ শস্যের ভেতরে লুকিয়ে বলেছিলে
খেলবে চোর-বুড়ি?
অগ্নি পদ্মবন, নৌকোর সারি
এঁকেছিলাম আকাশ, তারা, চাঁদের ঢেউ
এক ইজেলে গত বছরে।

গৌতম গুহ

কোথায়

শহর থেকে চলে গিয়ে
গাছ-গাছালির ছায়ায় ছিল ভাল
ফুটপাতে
ভীড়ে
অস্থির চাওয়া-পাওয়ায়
কী অসহ্য যন্ত্রণা
ডানায় শূন্যতা
তাই কি বাণিজ্য আমার

রূপোর টাকাটা রূপ-ঝলসায় বিশাল আকাশে
আমাদের মুখগুলো দুর্লভ কী যেন খোঁজে
পাগল দাঙ্গা করে
মাটি থেকে উঠে আসে না কেন
আমৃত্যু-স্বপ্নে-দেখা-জীবন।
শরীর অবস, পাঞ্জাবি ছেঁড়া
নোঙর ছাড়া স্টিমারের মতো শূন্য মুঠি নিয়ে
চলেছি—
শহর থেকে ছুটে গিয়ে
নিজের বাড়ি উঠব এই আশা
হায় বাড়ি
কোথায় তার সাদা রং, সবুজ জানালা
কোথায় ডাক কার ডাক
গোটা বাড়িটাই লুপ্ত।

রক্তাক্ত তিতিরের চিৎকারে আমি ডাকি
কোথায় স্থির হ'ব
ভাসমান পাখির মতো আকাশে ?
পশুর মতো নিরেট মাটির উপর ?
কিটের মতো মাটির ভিতরে

আমার বাহু প্রেরণা চলে যায়
বুঝি না, কানে কানে কেউ বলে দেবে কিনা
আমার ঠিকানা।

শ্যামল বসু

বায়স

যে যেদিকে পারেন জায়গা করে নিন।
হাত কাঁপলে স্পর্শ কিছু বিচলিত হবে
নগর পরিক্রমণে সংকীর্তনের দল
গায়ে গা বাঁচিয়ে চলছে।

হে আমার মহান প্রেমিকা,
দরজায় খিল তুলতে তুমি বাধা দিও না
তোমার শরীর নিয়ে খেলতে খেলতে ঝাউবন
অবিশ্রাম পরিশ্রমে
থমকে যেও না।

হে আমার প্রপিতামহ অতীত,
কাল তুমি কালকে চেনালে,
ম্লান দেহে আরো যদি একবার ফের ডেকে ওঠো
আমার আয়নায় মুখ দেখতে দেবো না।

হে আমার সন্তান,
এই তো বেশ আছো
আশীর্বাদ করি অথবা দীর্ঘ দুঃখের পথে
আমি তোমার কাণ্ডারী।

যে যেদিকে পারেন জায়গা করে নিন
কিছু কাঁপলে কিছু বিস্মরণ।

নিখিলকুমার নন্দী

কিছুক্ষণ চুপচাপ : তারপর

তোমার কথা ভাবছিলাম আজ ; প্রায়ই ভাবি
ঘর একটা পেয়েছিলাম, দরজা ছিল বন্ধ ; চাবি পাই নি

পথে একদিন পাশাপাশি চলেছিলাম
কত কথাই দাবিদাওয়ার বলেছিলাম।

অথচ আজ পথ এনেছে পথ-বিপথের চতুরালি
হতাহতের বেড়াজালে বৃথাপচয়, ভয়ে ভারী
অনেক জীবন রুদ্ধকারায় ছেঁড়াতালি
কাঁথায় কাঁপা মুমূর্ষুরা মুক্ত বটেই !
আমরা তবু ক্রুদ্ধ হই না নরনারী !

সেই তো শুরু পথের বাঁকে ম্লান পলায়ন
মিলেমিশে ভালোবাসায় ছিল শুধু অহঙ্কারই।

আজকে এমন জরুরি যে পথসভা, শোভাযাত্রা,
তাও মনে হয় দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ !

তোমার কথায় ভাবছিলাম তাই
আমাদের এ-অন্ধকারে গুমোট খোলা বন্ধ গলি
মটকা-মেরে-পড়ে-থাকা ঘরের দফারফায় কেন
ছিট্‌কে আছে দরজাটাই
দাবিদাওয়া দায়সারা ছল দায়িত্বহীন ; অমিল হ'লো চাবি !

তোমার কথা ভাবছিলাম আজ ; প্রায়ই ভাবি।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

ভালোবাসা

ভালোবাসা এক খঞ্জ বুড়োর মতো
বিগতচরণ, (শুধু) অমল সুধার রাতে
সূর্যের সাথে হাঁটে।

ভালোবাসা বুঝি প্রায়ান্ধ এক মাছি
দৃষ্টিবিহীন, (শুধু) বনকেতকীর ঝাড়ে
লাফায় ঝাঁপায় মাঠে।

ভালোবাসা যেন বিষপতঙ্গ এক
গলিতদন্ত, (শুধু) বৃষ্টিক্লান্ত প্রাতে
ফুলের শরীর কাটে।

দাউদ হায়দার

প্রশ্রয়ের গান

অভ্যাসবশতঃ আমি জ্যোৎস্না পার্কে একা একা ঘুরে বেড়াই।
ঝিলমিল আলোয়
বাতাসে ফুলের দহন। আমার ফিরে আসা-না-আসার প্রশ্ন তখন।
আসলে ওটা
আত্মহত্যার পূর্ব-প্রস্তুতি। কিংবা তুমি যাকে অধঃপতনের শেষ প্রশ্রয়
বলে মনে করো।
আমার আকাশে যে নক্ষত্ররাজি, নিশ্চিত জানি ওটা কবিতার
অক্ষম হাতিয়ার।

তবু আমি নিজস্ব নিয়মে বাইরে যাবো, পুনর্বার ফিরে আসবো।
মধ্যরাত্রির চিৎকার

—বেলীরোডের রমণীগণ হাতে নেবেন রিলকের মরণাস্ত্র গোলাপ,

গোলাপভুক পাখি

সভা-সমিতির দুই একটা বকুল ,—কিন্তু কবিবর দাঁড়াবে না স্থির।

গ ইস্থ্য জীবন

তাঁর মোটেই ভালো লাগে না।

—শর্তহীন ভালোবাসায় কেউ কোনদিন প্রকৃতির মতো সাড়া দিয়েছে

প্রতিবাদহীন ?

আলোছায়ার ঈষৎ জটিলতা, নিঃসঙ্গ, স্বাধীন মানুষজন, জলপ্রপাত—

কখন যেন বন্দী স্বপ্নের মধ্যে জ্বেলে দিচ্ছে নিশ্চিত কুশল

বিনিময়। মূলতঃ

অবিচ্ছিন্ন শিকড়ে অ'বহমান কৃষ্ণের বাঁশি

যা আমাকে জাগ্রত রেখে সৌন্দর্যের বিবাগী করে প্রতিদিন!

কমলেন্দু দাক্ষিত

ঈশ্বর এবং আতরওলা

রাস্তার একপাশে বুড়ো আতরওলা

শিশিগুলো সাজিয়ে সারাদিন বসে থাকে,

যখনি দেখা হয় আদর করে হাতে তুলে দেয়

কাঠির ডগায় তুলো, আতরে ভিজিয়ে ;

শুধোই—আর কতদিন কাটাবে এভাবে ?

মুলুকের কথা, বিবি ছাওয়ালদের কথা মনে পড়িয়ে দি।

বলে, বাবুসাব্, জীবনের শেষ কটা প্রহরে একটাই সাধ,

শুনেছি যেখানেই ঈশ্বর

সেখানেই সুগন্ধ,

তাই আতর ফিরি করি।

যদি কোনোদিন তাঁকে হঠাৎ পেয়ে যাই।

পবিত্রভূষণ সরকার

জলস্রোত

জলে ডুবছে সব ডুবছে ফুল
পাখি
অরণ্যের হাসি
জল ঢুকে যাচ্ছে মস্তিষ্কের ভেতর
মৃত মানুষের রক্তস্রোত বইছে দেশে দেশে।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

কবিতার সন্ধানে

ফিরে যাচ্ছি শৈশবে
মনে হোলো একমাত্র শৈশবই অতি পুরাতন, অতি প্রগাঢ়
যেমন বাতাস আলো এবং নদীর জল
অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হ'য়েও
আজও নবীন, উচ্ছল এবং স্বচ্ছ
কৌতুক-প্রবণ
অথচ অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতায় নিপুণ

আমার মনে হোলো আমি সেই প্রগাঢ় কবিতার সন্ধান
পেয়ে গেছি
যার তপস্যায় আমার রাত্রি কেটে গেলো
দীর্ঘ অথচ লঘু পদক্ষেপে।

অজয় দাশগুপ্ত

এখন যা আছে

বিগত দিনের কথা ভাবি
যখন শরৎ ছিল রোদ্দুরে সোনায় ;
মন ছিল কানায় কানায় ভরা,
তোমার স্মরণে মননে প্রেমে,
চোখে ছিল উজ্জ্বল মুখের প্রতিমা।

আজ শীত ; নুয়ে পড়ছে সময়ের চাপ ;
গাছেদেব পাতারা অসার ঝরে।
বিকেলে হাড়ের ভেতর কাঁপে কঠিন বাতাস।

যা আছে আপাতত সব
দূরক্ষণের স্মৃতির প্রলেপ।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

দুপুরের গান

সারা দুপুর গান ঝরে পড়ছে
যত ওপর তত বেশি সুরধারা ছড়িয়ে যায়
ইঁট কাঠ দেওয়াল পেরিয়ে
ভীষ্মদেব সুরের আচ্ছন্নতায় বাতাসে আমের বোল
ফুটিয়ে তুলেছেন
অভাবিত স্নানের সুরভি কোন কালো চুলে

আমি তাকে বলেছিলাম
কথা বোলো না
ডুবে যেতে দাও
প্রদীপ ভাসাবার মত
একটি নৌকোকে কূল ছেড়ে যেতে দাও
সমুদ্রে, মহাসমুদ্রে এখন
সারা দুপুরের গান দিগদিগন্তরে ভেসে যায়।

রাম বসু

আয়োজন যথাযথ ছিল

বেলা হলে বোঝা যায় নষ্টফল আমাদের মন।

আয়োজন যথাযথ ছিল
কিউরিয়ো, যামিনী রায়ের ছবি
বাঁকুড়ার ঘোড়া, ধানের ছড়া ও পট
সম্ভ-কেনা বিলিতী কেতাব
মনে হয়েছিল
করতলে বিশ্ব, আমলকি।
বেলা হলে বোঝা গেল
চৈত্রের মাঠের প্রান্তে নিষ্পত্র গাছের মতো একা
ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি
আশে পাশে জলরেখা নেই
আছে শুধু বালির ঝাপট
বেলা হলে
এই বোধ এলে
সারা গাছে মেখে নিয়ে সময়ের বিষাক্ত চুম্বন

তাকাই আকাশে
নক্ষত্রের জন্ম আর মৃত্যু দেখে দেখে
পাখির মায়ের মতো ভারি হয়ে উঠি।
নষ্ট ফলে জল জল করে
এক কুচি জল।

গোপাল ভৌমিক

সাফল্যের চাবিকাঠি

সাফল্যের চাবিকাঠি কথা কিংবা কাজে
অথবা তা উভয়ের সংমিশ্রণে
তলিয়ে দেখতে চেয়েও হদিস মেলে নি
যেহেতু পাই নি তাকে হাতের মুঠোয়,
বিশ্লেষণে চুল-চেরা বিচার করার
মেলে নি সময়।
দেখেছি দু চোখ মেলে মনে নিয়ে ভয়
কেউ তর তর করে কাঁটা-গাছ চূড়ায় উঠেছে
সুকৌশলী জাদুকর যেন
আর কেউ অভীপ্সার জ্বালা নিয়ে বুকে
দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায় সে গাছের নীচে
অথবা উঠতে গিয়ে কণ্টকিত করেছে শরীর।

এক গাছে দুই জন ভিন্ন আরোহীর
চড়ার প্রয়াসে দেখে ভিন্ন ফলাফল
বুঝেছি সাফল্য নয় গাণিতিক সূত্রের দোসর
এবং সে হয়তো বা রমণীর মত লীলাময়ী
বিজয়ী যে হয় সে তো স্বাধিকারে বাণী দিতে পারে
পারে না সে সাফল্যের চাবিকাঠি হাতে তুলে দিতে।

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

ভ্রমর ও আমি

ফিটফাট সেজে যতবারই তাঁর নিকটে দাঁড়াই—
চুপি চুপি পা ফেলে,
আমার বীণাধ্বনি শোনাবো ব'লে,
দেখি, সে পাশ ফিরিয়ে নেয় মুখ।
পাথায় বিচিত্র রং-এর ঢেউ ছড়িয়ে
কারুকার্যময় গানের ঠমকে-ঢঙে
ভ্রমর বারবারই যায় ফুলের কাছে
পাপড়ি বুজিয়ে, মৌনবতী, ঘুমে আলো নিভিয়ে
হ'য়ে রইলো অন্তঃপুরিকা—
ছলা-কলায় বা কি সে
জাগা থেকে ঘুমে নিঝুম কে—বলবে!
তার অকূল অবহেলায়
ভ্রমর ও আমি—আমরা কী করবো?
বীণা ও গানের কথাকলি ছিঁড়ে ফেলবো?
না, কি বিবাগী হ'য়ে যাবো?

মার্কিন উপন্যাসের ভাবনা

আমি সাহিত্যের ছাত্র নই—সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে অর্থনীতির ছাত্র। উন্নয়নগত অর্থনীতি (Development Economics) বিষয়ে গবেষণা, লেখা, পড়া করতে গিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে ভাষা, সাহিত্য, ভৌগোলিক পরিবেশ, উৎপাদন কৌশল ও উপকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আমার মনে আলোড়ন তুলেছে। উত্তরসূরিতে (২৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় (১৩৮৪) পরিমল চক্রবর্তী মহাশয়ের মার্কিন উপন্যাসের ভাবনা প্রবন্ধ এই প্রশ্নগুলিকে সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানীদের বৈঠকে তুলে ধরবার একটা সুযোগ করে দিয়েছে। এজন্য সম্পাদক মহাশয় ও লেখককে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই।

'মার্কিন উপন্যাসের ভাবনা' প্রবন্ধটি পড়ে ভাল লাগল। লেখাটি শুধু আমেরিকা নয়, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের (তথাকথিত চারটি newly-settled countries) এ সব দেশে য়ুরোপীয় আগন্তুকদের সাহিত্য এবং সেই অর্থে জীবন-জিজ্ঞাসা দিয়ে পরোক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছে।

প্রশ্নগুলিকে দুই ভাগে সাজানো যায়। প্রথমভাগের প্রশ্ন হল : একটা বিশেষ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিবর্তিত জীবনের প্রকাশ হিসেবে যে ভাষা গড়ে উঠেছে সে ভাষা কি অন্য দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিতে সেই দেশের মহৎ সাহিত্যের বা সেই অর্থে শুধুমাত্র সাহিত্যের মাধ্যম হতে পারে ? অর্থাৎ আমদানী-করা ভাষা কি একটা দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতির সার্থক মাধ্যম হতে পারে ? কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়ে রাখি। প্রথম থেকেই মার্কিন ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা আমেরিকা মহাদেশের মাতৃভাষা হিসেবে গড়ে ওঠে নি কেন ? আমেরিকা মহাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষের জীবনের তাগিদে রেড-ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, জীবনচর্যারিত উদ্ভব ও বিকাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেমন

বাংলা দেশে (উভয় বাংলার কথাই বলি) বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির জন্ম বিকাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদিও সেই স্বাভাবিকতার ভাঁটা পড়েছে। কেননা এদেশের মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে নিজস্বতা হারিয়ে পশ্চিমের নকল বাসিনী প্রাধান্য লাভ করেছে।

উৎপাদক কৌশল, উৎপাদক উপকরণ সব কিছুই প্রথাগতভাবে বিদেশের সূত্রে পাওয়া, আর তার প্রভাব ভাষা সাহিত্য, জীবনযাত্রাকে বিকৃত করে চলেছে। মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যোগসূত্রের মধ্যে দিয়ে জীবিকার উপকরণ, উৎপাদক কৌশল গড়ে ওঠে তা ভাষাকে, সাহিত্যকে সাংস্কৃতিকে নিজস্বতায় সৃষ্ট করে বলেই'ত জানি। আমাদের মত দেশগুলিতে এ যোগসূত্র আদান প্রদান শুরু হয়ে গেছে দীর্ঘ দিন (এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ক্রান্তি, শারদীয় গণবার্তা, চতুষ্কোণ পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি অলমিতি বিস্তারেণ)। জাপানে এদিক থেকে একটা বড় দৃষ্টান্ত। অর্থনীতিক উপকরণ ও উৎপাদকের দিক থেকে আজ জাপান পৃথিবীর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু তার নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে (১৮৬৮-৭৫) পর আর এগোয় নি। গত প্রায় একশ' বছর ধরে জাপানের নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবন পশ্চিমী অনুকরণের প্রলেপের অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে। আজকের জাপানের অর্থনীতিক উৎপাদন কৌশল পশ্চিমের উৎপাদন কৌশলের অনুকরণে সমৃদ্ধ।[১] তবে আশার বিষয়, তরুণ জাপানীদের মধ্যে identity সংকট প্রবলাকার ধারণ করেছে। এপ্রসঙ্গে জাপানী গবেষকরা লিখছেন : Japan in not as westernised as she may appear. Westernisation is only facade but the subsistence Japanese civilization has hardly changed after Japan's contact with the West. "(T. Umesao, Tokyo Keijai, December, 1973)" আমাদের দেশের মত জাপানের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, উপকরণ antique এর রূপ নিয়ে বিদেশী

---

১ এ প্রসঙ্গে প্রিয়তোষ মৈত্রেয়র "Underdevelopment Revisited" Firma KLM, 1977 ও প্রকাশিতব্য 'Economic Development with or without the Industrial Revolution'; London, 1978.

ট্যুরিস্টদের দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্থান নিয়েছে। (প্রতিষ্ঠিত লেখক বিকাশ বিশ্বাস মহাশয়ের 'উদিত ভানুর দেশ জাপান' বইতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)

অধ্যাপক ডোর লিখেছেন, The Japanese could concentrate on adopting more efficiently the details of imported technology and education to their own system rather than devising major emotions of their own. (আমাদের মত আমদানী-করা শিল্পায়নের দেশগুলির পক্ষেও একথা প্রযোজ্য—তবে পার্থক্য এই যে আমরা জাপানের মত সার্থক হ'তে পারি নি আর্থিক উন্নয়নের দিক থেকে—এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'Underdevelopement Revisited : Firma KLM দ্রষ্টব্য) আমেরিকায় স্থানীয় মানুষ রেড-ইণ্ডিয়ান বা সেই অর্থে কানাডার এস্কিমো, অস্ট্রেলিয়ার আদি মানুষ এবং নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিদের প্রসঙ্গে এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

আমেরিকাতে ফিরে যাই। য়ুরোপীয় আগন্তুকদের আসবার আগে আমেরিকার ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য সেই দিনের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই উন্নত ছিল—ইন্‌কা, মায়াদের সভ্যতা ইতিহাসে বিখ্যাত। এদের ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি নিজস্ব পরিবেশে ইতিহাসের প্রয়োজনে জীবিকার তাগিদে গড়ে ওঠা। তারপর এল পশ্চিমের মানুষ, সঙ্গে করে আনল তাদের পরিবেশে ইতিহাসের প্রয়োজনে জীবনের তাগিদে গড়ে-তোলা উৎপাদন কৌশল। উপকরণ, ভাষা, সাহিত্য, জীবনচর্চা ও চর্যা। এদের রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক ক্ষমতার চাপে রেড ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব ইতিহাসের গতি স্তব্ধ হয়ে বিকৃত হতে থাকল। তা যাক্—কথাটা হ'ল, এই নতুন দেশের (আগন্তুকদের অর্থে) ইতিহাসে ও প্রাকৃতিক পরিবেশে য়ুরোপ থেকে আনা ভাষা জীবনবোধের, জীবন-জিজ্ঞাসার সত্যিকারের মাধ্যম হতে পারে? আর তাতে কি স্থানীয় মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনবোধের প্রকাশ থাকা সম্ভব? অস্বীকার করছি না, য়ুরোপীয় আগন্তুকদের আসবার পর অনেক সাহিত্য, সংগীত এদেশে লেখা হয়েছে ও হচ্ছে—কিন্তু তা কি প্রকৃতই আমেরিকার নিজস্ব এবং সেটা কি সম্ভব? য়ুরোপ থেকে আমদানি-করা যন্ত্র-কৌশল ও উপকরণে এ দেশের আমদানী-করা অর্থনীতি ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে

উঠেছে। আজ ধনতান্ত্রিক জগতে শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রধানতম হ'য়ে দাঁড়াল, কিন্তু পাশাপাশি আমেরিকার নিজস্ব অধিবাসী অর্থনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক ইতিহাস বিপর্যস্ত ও বিকৃত হয়ে অনুন্নত থেকে গেল, যেমন অনুন্নত থেকে গেল তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। বেঁচে থাকবার তাগিদে এদের মধ্যে য়ুরোপ থেকে আনা ভাষা সাহিত্য, জীবনচর্চায় অনুকরণ প্রচেষ্টা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে, এই নকলনবিশীর পদ্ধতি রেড ইণ্ডিয়ানদের (এবং সেই অর্থে, এস্কিমো, মাওরি বা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের) মধ্যে আজ তীব্র identity সংকটের (অর্থাৎ নিজেদের পরিবেশে, ইতিহাসে আমদানী করা বিদেশী জীবনযাত্রায় নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সংকট) সৃষ্টি করেছে। ফলে এ সব দেশে সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ (integrated) সমাজ এসব দেশে গড়ে উঠছে না, বরং দিনের পর দিন সাংস্কৃতিক সংঘাত বড় হ'য়ে দেখা দিচ্ছে।

অপর দিকে, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের য়ুরোপীয় অধিবাসীদের সাহিত্য সংস্কৃতি য়ুরোপের তুলনায় দুর্বল ও কৃত্রিম। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইংরেজী সাহিত্য নাটক চলচ্চিত্রে যে বলিষ্ঠ জীবনবোধের প্রকাশ লক্ষণীয়। তার তুলনায় উল্লিখিত চারটি দেশের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের আজ কদাচিৎ তুলনীয়। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অধিকার সাহিত্যসমালোচকদের আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

এবার প্রশ্নের দ্বিতীয়ভাগে আসি। পরিমলবাবু তাঁর প্রবন্ধের সূত্রপাত করেছেন মার্কিন দেশের সাহিত্যের প্রথমাবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা দিয়ে, লিখেছেন 'নব-আবিষ্কৃত বিরাট মহাদেশের অতীত স্বীকৃতি পায় নি সাহিত্যে।' এইটেই কি স্বাভাবিক নয়? আজও কি এঁদের সাহিত্যে সে স্বীকৃতির স্বাক্ষর আছে? য়ুরোপের এই আগন্তুকদের সঙ্গে-করে-আনা ভাষা, জীবিকার উপকরণ ও উৎপাদন-কৌশল নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশে কি সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি কখনও সম্ভব করতে পারে এবং সেই সাহিত্যে কি নতুন দেশের স্বাভাবিক জীবনবোধ জীবন-জিজ্ঞাসার স্বীকৃতি পাওয়া যেতে পারে? পরিমলবাবু নবজাগ্রত মার্কিন চেতনার কথা লিখেছেন। নবজাগ্রত মার্কিনী চেতনা যা আধুনিককালের মার্কিন সাহিত্যে প্রকাশিত বলে পরিমলবাবু লিখেছেন তার সঙ্গে কি আধুনিক য়ুরোপীয় চেতনার মৌলিক কোন প্রভেদ আছে? এবং থাকা সম্ভব কি? যে প্রভেদ

লক্ষণীয় তা নিতান্তই বাহ্যিক—অর্থাৎ একই পানীয়ের বিভিন্ন রঙের বোতলে পরিবেশন।

পরিমলবাবু অন্যত্র লিখেছেন, আধুনিক মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা একান্ত ভাবেই সমাজ-সচেতন। কথাটা কি শুধু এদেশের আগন্তুক য়ুরোপীয় সমাজ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়? এই দেশের স্থানীয় মানুষের কি এই সমাজ অন্তর্ভুক্ত আর তাই দিয়ে তাহলে এদের জীবন-জিজ্ঞাসা আধুনিক মার্কিন য়ুরোপীয় সাহিত্যে ধরা পড়ল না কেন? স্থানীয় মানুষ ও আগন্তুকদের জীবন-জিজ্ঞাসা কি এক হতে পারে? পরিমলবাবু তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন এই বলে, 'আদি পর্বে মার্ক টোয়েন এবং উত্তর পর্বে সিনক্লেয়ার লিউইস্ ও হেমিংওয়ে তাঁদের উপন্যাসকে মহত্তর মর্যাদা দিয়েছেন সার্বভৌম মানব চেতনা ও গভীরতর জীবনবোধের গুণে।' কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—এঁদের সাহিত্যকে কি আমেরিকার নিজস্ব সাহিত্য বলা চলবে?

অর্থনীতি বিভাগ
ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়
ডানেডিন, নিউজিল্যাণ্ড

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

ল্যাংস্টন হিউজ

মুলতুবি স্বপ্নে

মনি রে সম্ঝে চল—
বলি আমার মনিকে।
না না না, কাৎরায় সে—
ছাড়ো পথ। ছেঁড়ে সিকে।
        একটু তো থাকেই
        দৌড়নো ছুটনো
        মুলতুবি স্বপ্নে
হীরের আংটি চাই
লুলুর বায়না ছোটে
মাথা নাড়ে লেওনার্ড
মিলবে ঘণ্টা ঘটে
        একটু তো থাকেই
        বিয়োগের অঙ্ক
        মুলতবি স্বপ্নে
চাই যে—পরাণে মরি
চাই তোমাকে এখনি।
পাবো বাঁধা আছি তবে
সেদিন নেই রে মনি।
        একটু তো থাকেই
        নির্বিষ দর্প
        মুলতবী স্বপ্নে
এক রাতে পর পর
তিনটে নিমন্ত্রণ
মনি বলে শেষটিতে
মশাই আমার নন
        একটু তো থাকেই

তালগোল পাকানো
মুলতুবি স্বপ্নে
এ-নদী ও-নদী ঘুরে
ও-শহর সে-শহর ক'রে
বাড়ে জট—পায়ে পায়ে
স্বপ্নের ফুটবল ঘোরে ॥

(Same in Blues)

রূপান্তর : পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

[ল্যাংস্টন হিউজ (১৯০২—১৯৬৭) সম্পর্কে একটুখানি মন্তব্য দেওয়া আছে উত্তরসূরির বৈশাখ আশ্বিন ১৩৮২, ‍২৩শ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যায়]

ব্রায়ান প্যাটেন

অরণ্যের সঙ্গে সংলাপ

একদিন সন্ধ্যেবেলা তোমার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে
যখন তুমি আশ্রয় দিতে চাইলে
সর্বস্ব তখন ছিল বৃষ্টিতে ভিজে সপ্‌সপে

আমি দেখলাম তোমার পাতাঝরা ডালপালার ফাঁক দিয়ে
কেমন বেড়ে উঠছে উপকণ্ঠ, এবং
বৃষ্টিতে সশঙ্ক,

ধূসর খরগোসগুলোর উদ্ধত চলাফেরা
দূরের প্রান্তরে ; এবং সেখানে সম্পূর্ণ একা
আমি ভাবি নি কিছুই নিজের পদচিহ্ন ছাড়া

পরিপূর্ণ ভরাট, আর ভালোবাসা, লোকজন ছাড়াই
মুক্ত স্বাধীন, ঠিক তখুনি
অরণ্য কথা বললো আমার সঙ্গে।

রূপান্তর : অর্ণব সেন

পাদটীকা : ব্রায়ান্ প্যাটেন লিভারপুলের ইংরেজ কবি। জন্ম ১৯৪৬ সালে। চোদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছেড়েছেন। ঘুরেছেন নানান্ দেশ। লিখেছেন নানান ধরণের কাগজপত্রে। তাঁর বর্তমান জীবিকা কবিতা পাঠ করে শোনানো। বি বি সি রেডিও এবং টেলিভিসনের মাধ্যমে তিনি প্রায়ই কবিতা শোনান। বেশ ক'খানা কবিতার বই বেরিয়েছে। কবিতায় রোমান্টিক ধারাকে ফিরিয়ে আনতে চান তিনি।

এডুয়ার্দ মোরিকে

প্রার্থনা

পাঠাও, হে নাথ, যা তোমার ঈপ্সিত
মনোলোভা বা অমনোলোভা উপহার
আমি মনে-মনে খুশি, দুটোই তোমার
অবিরলধারে দুহাতে উৎসারিত।
দুঃখে সুখে এমনতরো
যেন আমায় কভু না করো
আবেগী থরথর
সানুগ্রহ পর্যন্তও
মধ্যপথে রয়েছে জড়ো।

রূপান্তর : সুনীথ মজুমদার

এড্‌না সেন্ট ভিনসেন্ট মিল্লে

বসন্ত

বসন্ত তুই কিসের জন্যে ফিরে আসিস বারবার ?
আসলে সৌন্দর্য জিনিসটা প্রয়োজন-মাফিক নয়।
সরু ডালের ছোট ছোট পাতায় লাল্‌চে আভার সাথে
আমায় শান্তি দিস্‌নে।
আমি যা জানি তা জানি।
আমি লক্ষ করি ক্রকাস ফুলের গুচ্ছ যেন সূর্য
আমার ঘাড়ের ওপর জ্বলছে।
পৃথিবীর গন্ধ অতি পবিত্র হলেও
স্পষ্টত এখানে কোনো মৃত্যু নেই।
কিন্তু এর দ্বারা কী বোঝায় ?

মানুষের মস্তিষ্ক শুধুমাত্র মাটির নিচেই লুকানো নয়
তাতেও অবলীলায় ঘুণ বসেছে।
জীবনের অন্তর্গত জীবন
কিছুই নয়,
একটা ফাঁকা পাত্র, এবড়ো-খেবড়ো সিঁড়ি ধরে ওঠা,
প্রতি বছর এটাও চাহিদা-মাফিক নয়, এই পাহাড়ের সানুদেশে
বসন্ত
একটা বোকার মতো আসিস, ফুলগুলোকে আধো আধো
বোল শিখিয়ে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে দিস।

রূপান্তর : অভিমান সরকার

মাননীয় সম্পাদক,

উত্তরসূরি,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

উত্তরসূরি-র ২৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় শ্রীঅমলেন্দু ভাদুড়ী মহাশয়ের 'গুস্তফ্ ফ্লবেয়ার' সাধুবাদ জানাই। তাঁর পাণ্ডিত্য বিষয়বস্তুর গভীর অতলকে স্পর্শ করেছে। তবে প্রবন্ধের নাম যখন 'গুস্তফ্ ফ্লবেয়ার' তখন আমার মনে হয়েছে, বহু প্রশ্নকেই তিনি তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন নি। গুস্তফ্ ফ্লবেয়ার উনিশ শতকীয় ফরাসী তথা ইওরোপীয় সাহিত্যে একটি সর্বাত্মক আলোড়ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং একটি মাত্র উপন্যাসেই তিনি উপন্যাস-সাহিত্যের মান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই উপন্যাসকে সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় ব্রেকথ্রু বলা যায়, যা হচ্ছে মনের পটভূমিকে অনুসন্ধান। কোন্ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেষ্টনে (Socio-political milieu) তিনি লালিত, তাঁর ওপর সামসাময়িক সাহিত্যের প্রভাব তাঁর জীবন-ভাবনার খুঁটিনাটি, তাঁর আন্তর সংঘাত প্রভৃতি নিঃসন্দেহই আলোচ্য হয়ে পড়ে। প্রতিটি শিল্পীর ওপরই তাঁর সমকালীন যুগমানসের দ্বিরায়তনিক ছায়াপাত অবশ্যম্ভাবী। সেই আলোকে ও আরও কিছু আনুষাঙ্গিক প্রশ্নে আমার এই নিবেদন।

ফ্লবেয়ার যে-বছর জন্মগ্রহণ করলেন সেই ১৮২১-এই ফরাসী দেশের অন্য এক প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চার্লস বোদলেয়ার। সেটা রোমান্টিক যুগের শেষ পর্যায় এবং সাহিত্যে ও কাব্যে প্রত্যাখ্যান ও পরিগ্রহণে জর্জরিত এক নৈরাজ্যের সূচক-কাল ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রবহমানতা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে প্রায় অবলুপ্তির পথে। রোমান্টিকতা মুখোমুখি হয়েছে রিয়ালিজম্-এর। সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ তখন স্তেঁধাল, বালজাক, জর্জ সাঁদ, ব্যানভিলে, লাকোঁত দ্য লিলে, ব্রোঁতস, ম্যাথু আর্নল্ড। সবাই এঁদের নামকরণ করলেন 'রেড রোমান্টিক'। সমস্ত দিকে ব্যাপ্ত হ'ল আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত জীবনবোধ। জাগতিক মূল্য জ্ঞানকে গৌণ করে, নৈরাজ্য ও নৈরাত্ম্য এই দুটি শব্দের অর্থ বৈষম্য বিস্মৃত হয়ে, লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠা হ'ল সাহিত্য বোদলেয়ার বা ফ্লবেয়ার কেউই এই তরঙ্গ-বহির্ভূত হলেন না। (প্রসঙ্গত, মনে পড়ছে হারম্যান ব্রখ-এর যুগান্তকারী উপন্যাস 'দি স্লিপওয়াকার্স' এর কথা, যেখানে তিনি স্পষ্টত চিত্রিত

করেছিলেন কি-ভাবে ব্যক্তি-প্রধান সমাজ অখণ্ড ধ্রু দী আদর্শকে অব্যবহার্য ভেবে জীবনের মধ্যে বস্তু আর আত্মার দ্বিত্ব আনলো। আর সেই ভেদবুদ্ধির ছিদ্র পথে প্রবেশ করল আত্মহনন আর নিঃসঙ্গতার শনি। সাহিত্যে সেই যে দ্বিধা, তা যখন সবার সয়ে গেল, তখন শতধাতেও আর আপত্তি রইল না। এঁদের উভয়ের জীবনেই লোকায়তিক পরিবেষ্টনের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমসামায়িক রাজনীতিক ভাবনার মধ্যে কূট পোলেমিকস্-কে গ্রহণ বর্জনে দ্বিধা এবং শিল্প ও জীবনের সমীকরণের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। বোদলেয়ার রাজনৈতিক সমাজবাদ-কে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে অসম্মত হলেও বুর্জোয়া মূল্যবোধও তাঁকে আশ্বস্ত রাখে নি। আবার ফরাসী উদারবাদীতাও (French Liberalism) তিনি নিঃশঙ্কে গ্রহণ করতে অসমর্থ, কারণ সেটা অ্যাগনস্টিক। (স্মর্তব্য যে উভয়েই এমন একসময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেটা ফরাসী দেশে বিপ্লবের যুগ)। অন্যদিকে ফ্লবেয়ারও জন্মসূত্রে বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত নির্বন্ধতার ওপর তাঁর অসীম ঘৃণা। সেই ক্লিশে-আক্রান্ত সামাজিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁর মন নিয়তই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তবু তিনি যখন কলম ধরলেন মাদাম বোভারি-র জন্য, তখন চিত্রিত করলেন সেই বুর্জোয়া সমাজেরই চিত্র, যতদূর সম্ভব অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গীতে, কিন্তু কোথায় যেন অচেতনে রয়ে গেল চরিত্রগুলির প্রতি নীরব সহানুভূতি। একটা 'বুর্জোয়া ফেনোমেনম' সারাজীবন তাঁকে তাড়িয়ে ফিরেছে। প্রতিদিন সকালে দাড়ি কামানোর আয়নায় একটা গ্রটেস্ক অটোমেটিজম্ যখন ধরা পড়ে যেত, তিনি বিপদগ্রস্ত হতেন, মনটা আন্তর-বিরোধে জলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তাই বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিরুদ্ধ জেহাদ থাকা সত্বেও র‍্যাঁবো বোদলেয়ার সম্পর্কে বলেছিলেন যে তিনি 'lived in too artistic a milieu' আর ফ্লবেয়ারের মাদাম বোভারি-র ইংরেজী অনুবাদক অ্যালান রাসেল গুস্তফ্ সম্পর্কে বলেন একই কথা 'Flaubert's artistry was pre-eminently of the ivory type......' আবার শিল্প ও জীবনের সমীকরণের অন্বয়ে বোদলেয়ার যেমন ছিলেন ব্যর্থ, ফ্লবেয়ারও তাই। রোমান্টিক ফ্যালাসির বৈশিষ্ট্যই হ'ল জীবন ও শিল্পের মধ্যে শ্রেয়কে নির্বাচন। উভয়েই জীবনকে গৌণ করে, শিল্পকে মুখ্য মর্যাদা দিয়েছেন। উভয়েই কাঙ্খিত পারফেকশনের সুরম্য প্রাসাদে প্রবেশের স্বপ্ন দেখেছেন। হয়তো কোন ঐশী অতৃপ্তির ফলে সেখানে

তাঁদের জীবদ্দশায় প্রবেশ করা হয় নি, তবু, ঐ মরীচিকার পেছনে উভয়েই ধাবমান ছিলেন।

আর একটা প্রশ্ন হ'ল, ফ্লবেয়ারই কেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিকতা-বিরোধী উপন্যাস লিখতে সমর্থ হলেন? আমার মনে হয়, এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে তিনি নিজে একই সঙ্গে উন্মাদ রোমান্টিক ছিলেন আবার রোমান্টিকতার উন্মাদনায় যে ত্রুটি তা তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। তাই বোধ হয় তাঁর কল্পগুরু ছিলেন উগো আর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন মোপাসা। তাঁর মধ্যে দুটি ভিন্নমুখী ধারার এই সম্মিলন পরিস্ফুট হয় তাঁর একটি চিঠিতে (১৬ই জানুয়ারি, ১৮৫২-য় লেখা। এ সময় তিনি মাদাম বোভারি রচনা শুরু করেছেন): "I am, quite literally, two different persons, one of whom is intoxicated with bombast, lyrical outpourings, highsounding, phrases and noble thoughts; other a person who burrows into the truth as persistenly as he can, who loves to unearth little facts no less than great ones, who wants to make you feel, almost physically, the objects which he brings to light.' দেখতে পাই, তাঁর মননের পট-ভূমিতে রোমান্টিকতার প্রভাবই অপেক্ষাকৃত জোরালো। তিনি যৌবনে গ্যেটের অনুভাবে আপ্লুত। ক্রঁয়া-তে খোলা আকাশের নীচে গ্যেটের কবিতা পড়তে পড়তে, সুর-ছন্দ যখন গীর্জার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মিশে যায় ফ্লবেয়ার তখন উন্মাদপ্রায়। আবার সচেতনে তিনি মানবজাতির সহজাত নির্বুদ্ধিতা, ইডিয়টিক কমনপ্লেসের ঘোরতর বিরোধী, সেখানে রিয়ালিস্ট বিদ্রোহী তিনি। তাঁর দুই প্রেমিকা মাদাম শ্লেসিঞ্জার ও লুইস কোলের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়াও এই দুটি ভিন্নমুখী মননের পরিচায়ক। 'দি সেন্টিমেন্টাল এডুকেশন' ও 'দি টেম্পটেশান অফ্ সেন্ট অ্যানথনি'-এই দুটি উপন্যাসে তিনি সচেতন হয়েছিলেন তাঁর জীবনের ঐ দুটি ধারাকে একটি একটি করে গেঁথে ফেলতে, একসূত্রে। কিন্তু ব্যর্থ ফ্লবেয়ার, রোমান্টিক ফ্লবেয়ার বলছেন: "Never again shall I indulge in those ecstasies of style which I allowed myself through eighteen tremendous months. With what love did I shape the pearls of my necklace! There was only one thing I forgot—the thread!"

(দ্বিতীয়োক্ত উপন্যাসটি ফ্লবেয়ার ১৮ মাসের প্রচেষ্টায় লিখেছিলেন—প্রবন্ধকার বলেছেন তিন বছর ধরে লিখেছিলেন। আর ঐ উপন্যাসটি লেখার প্রথম প্রেরণা পান তিনি ব্রিউঘেলের একটি বিখ্যাত সুররিয়ালিস্ট ছবি দেখে)। এই সময়েই তাঁর দুই বন্ধু ম্যাক্সিম ডু ক্যাম্প. ও লুই বুইলহেট তাঁকে এই ধরণের প্রচেষ্টায় নিরুৎসাহিত করেন ও স্থানীয় একটি চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী ঘটনাকে থিম্ হিসেবে গ্রহণ করতে বলেন। ফ্লবেয়ার ইতিমধ্যে উপলব্ধ হয়েছেন যে রোমান্টিক-রিয়ালিষ্ট সংমিশ্রনের মধ্যে রয়েছে অনিবার্য দৌর্বল্য। সত্যনিষ্ঠা আর সত্যকল্পনার মাঝামাঝি এক অবস্থায় তাঁর মাদাম বোভারি রচনার সূত্রপাত। তিনি বুঝলেন ও বললেন 'what seems to me truly worth doing, what I want to do, is to write a book about nothing, a book without external attachments, which can stand firm on the internal solidity of its style, as the Earth keeps its place in the air without any visible means of support...'। তিনি হয়ে উঠলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁর সৃষ্টিকে আভ্যন্তরীণ অবৈকল্যের উপর স্থাপন করে, কারণ অখণ্ড শিল্প-সামগ্রী কোনও অভিমত বিশেষের সত্যাসত্যের ধার ধারে না, সে স্বাবলম্বন গুণে সংঘাতের দুঃখ আর পক্ষপাতের গ্লানি কাটিয়ে ওঠে। মাদাম বোভারি তাই হয়ে উঠল শেফ্ দ্যভ্র, মাষ্টারপীস্।

উপন্যাসটি লেখার পর ফ্লবেয়ার বলেছিলেন, Madame Bovary, c'est moi বা Madame Bovary is me। এসব অদ্ভুত মন্তব্যের পেছনে কি রহস্য লুকিয়েছিল? ফ্লবেয়ার তাঁর নিজস্ব ব্যর্থতার গ্লানি সংস্থাপিত করেন তাঁর সৃষ্ট নায়িকার ওপর। মাদাম বোভারি উপন্যাসের পাতায় পাতায় চিত্রিত 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই'-এর হাহাকার। জীবনের মধ্যে থেকে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার অদম্য বাসনা, কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কি মর্মান্তিক প্রতিঘাত! রোমান্টিক ফ্লবেয়ারও এমন স্বপ্নিত জীবনে প্রতারিত বার বার। লুইস কোলে-র সঙ্গে প্রণয়ে, প্রাচ্যদেশ ভ্রমণে এবং সেণ্ট অ্যানথনি-র শিল্পচাতুর্যে তাঁর রোমান্টিক মন আহত। তাই বোধহয় এম্মাকে আবদ্ধ করলেন বাস্তবের কারাগারে, সেই অবসরে নিজের প্যাশানকে শুদ্ধ করার প্রয়াসে। 'বোভারিজম্' ইংরেজী অভিধানভুক্ত হল, যার অর্থ হ'ল মানবমনের সেই অবস্থা যাতে মানুষ 'See

themselves, in imagination, as other than they are.' এম্মা-র চরিত্রের অঙ্গে এই সংজ্ঞা একাত্মীকৃত। ফ্লবেয়ার বললেন, 'The real subject of Madame Bovary is the ever widening gap between his circumstance of real life and those of a dream world.'। এম্মা স্বপ্ন দেখে কোন ত্রিস্তান বা লান্সেলটকে সে প্রেম নিবেদন করবে। কিন্তু বাস্তবে তার কাছে আসে দরিদ্র রোডলফ বা নগণ্য লিও। মনে পড়ে, য়েটস্-এর যৌবনে লেখা কাব্য 'আইল্যাণ্ড অফ্ স্ট্যাচুস্' এর কথা যেখানে একটি ফুল এমন রোমান্টিক স্বপ্নের দ্যোতক। সশ্রদ্ধ দূরত্বে তার গুণগান ভাল কিন্তু ফুলটিকে ছুঁলেই অনিবার্য মৃত্যু। ফ্লবেয়ারও এম্মা-কে শাস্তি দেন তার স্বপ্ন দেখার জন্য নয়, সেই স্বপ্নিত জীবনকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার জন্য। ভারতীয় মিষ্টিক দার্শনিকের মত ফ্লবেয়ারও বুঝেছিলেন জীবনটা মায়া বা মোহ ছাড়া কিছু নয় এবং জীব-মুক্তির উদ্দেশ্যে ঐ মোহবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই একমাত্র পন্থা।

মাদাম বোভারি-র জন্য ফ্লবেয়ারকে তদানীন্তন ফরাসী দেশের সরকারী অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। তবে কি মাদাম বোভারি অশ্লীল সাহিত্য, নীতি-বিগর্হিত শিল্প? এই ঘটনার আলোকে সে-কালে সাহিত্যে 'নীতি' বা 'সাধুতা-র প্রশ্ন নিয়ে আলোড়ন হয়েছিল। ফ্লবেয়ারও এ বিষয়ে নিজে কি ভাবতেন তার অনুল্লেখ তাঁর সম্পর্কে কোন রচনাকে পূর্ণতা দেয় না, এ বিষয়ে তাঁর অনুগত মন্ত্র-শিষ্য মোপাঁসা-র বক্তব্য স্মরণীয়: 'রীতিমত চটে যেতেন ফ্লবেয়ার যখন আর্ট সমালোচকরা সাহিত্যে 'নীতি', 'সাধুতা'-র দোহাই পাড়তেন। তিনি (ফ্লবেয়ার) নিজেই বলেছেন, যবে থেকে মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে, সব মহান্ লোকই তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে এই সব ক্লীবদের সদুপদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।' (Dumesnil, Correspondance অনুবাদ: সৈয়দ মুজতবা আলী)। ফ্লবেয়ার বুঝতেন যে সুষ্ঠু, প্রতিষ্ঠিত জীবনের জন্য সুনীতি অপরিহার্য হলেও সাহিত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য, মানুষের প্রকৃতি, তা সু বা কু, যাই হোক্, পর্যবেক্ষণ করে সেগুলির যথাযথ বর্ণনা। উদ্দেশ্যমূলক কোন গ্রন্থ আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে না। কোন সার্থক গ্রন্থ যদি সুশিক্ষা বা সুনীতি দানে সমর্থ হয় তবে সেটা লেখক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে নয়, সেটা 'in spite of the author'। অর্থাৎ 'আনকন্

টমস্ কেবিন' যদি দাসত্ব প্রথাকে নির্মম আঘাত দিয়ে থাকে বা এমিল জোলার 'জা ক্যুজ' মিলিটারি স্বৈরতন্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করে থাকে তবে তার কারণ ঐ উপন্যাসদ্বয় অনুভূতি সঞ্চারণে এমনই কৃতকার্য হয়েছিল যে আর্টের উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছিল। কিন্তু শিল্পী ফ্লবেয়ার এত সব ভাবলেও তাঁর শিল্পের জঘন্য বিচার তাঁর রোমান্টিক মন সহ্য করতে পারে নি। তিনি বলছেন, 'How can I write anything that will be more inoffensive than my poor Bovary who has been dragged by the hair, like a common strumpet, through the courts ?' এই ঘটনার পর তিনি গুণমুগ্ধদের ছেড়ে তাড়াতাড়ি তাঁর গ্রাম ক্রয়া-তে ফিরে যান বড় অশান্ত মনে। কেন যান ? "...to fit new strings to that poor guitar of mine which has been so bespattered with mud"। তবু তাঁর সমসাময়িকরা তাঁকে ভুল বোঝেন নি। আদালতে মাদাম বোভারি-র বিচারের পর উগো তাঁকে লিখছেন, 'you, Sir, are one of the leading spirits of your generation. It is for you to keep the torch of art burning, add to hold it high before our eyes. I am now in the shadows, but the love of light is still alive in me. By which I mean that I love you.' বৃদ্ধ উগো জানতেন যে সকল মত নির্বিশেষে ফ্লবেয়ারের ছিল সেই দুঃসাহসিক ভাবুকতা যাকে লরেন্স বলেছেন 'থট অ্যাডভেঞ্চার'।

আমার মনে হয়েছে ফ্লবেয়ার সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর জীবনের এই সব দিকগুলির উল্লেখ রচনাকে আরও সুডৌল করতে সক্ষম হ'ত। তাই এসব বিস্তারিত আলোচনা। আমি মূলত ইতিহাসের ছাত্র। সাহিত্য-ভাবনা আমার শখ। সে কারণে বিষয়ান্তরে প্রবেশের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।

বিনীত

অনুপ মতিলাল

শর্বরী রায়চৌধুরী

এ যুগের অন্যতম বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীশর্বরী রায়চৌধুরীর নাম শিল্পীমহলে বিশেষভাবে পরিচিত। শিল্পীর জন্ম ১৯৩৩ সালে, পূর্ববঙ্গে। বাল্যকাল থেকেই শিল্প সম্পর্কে এক বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় শিল্পীর মধ্যে। ১৬ বছর বয়সে তিনি শিক্ষানবিশী শুরু করেন অন্যতম প্রখ্যাত ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাছে, ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে কলকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে ভাস্কর্য বিভাগে প্রথম হয়ে পাশ করেন। এরপর ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে বরোদাতে শ্রীশঙ্খ চৌধুরীর অধীনে শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে পাঠ সমাপ্ত করে ১৯৬০ সালে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। এই সময় প্যারিসে বিশ্ব দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়। শ্রীরায়চৌধুরী ১৯৬২ সালে ইতালি সরকারের বৃত্তি পেয়ে ফ্লোরেন্স নগরীতে ভাস্কর্য শিক্ষার জন্য যান। এই সময় ইউরোপের তৎকালীন বিখ্যাত ভাস্করদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত এবং কাজ করবার সুযোগ পান। শ্রীরায়চৌধুরী ইতিমধ্যে ভাস্কর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর কাজের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্ক শহরে তাঁর একটি একক প্রদর্শনী বেশ সাড়া জাগায়। তাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্য বিশ্বের বিখ্যাত প্রদর্শশালাগুলিতে এবং বিখ্যাত ভাস্করদের শিল্পশালায় স্থান পেয়েছে।

তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ক্যালিফোর্ণিয়ার লঙবীচ ষ্টেট কলেজ অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু শ্রী রায়চৌধুরী বিশ্বভারতীর কলাভবনে রীডার হিসাবে যোগদান করে স্বদেশেই থেকে যান। এখনও পর্যন্ত তিনি কলাভবনে যুক্ত আছেন। শিল্পী শ্রীরায়চৌধুরী কাজ করেন নিঃশব্দে। তিনি আজ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রদর্শনীগুলিতে যোগদান করেছেন প্রত্যেকটিতে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৬৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব তৃ-বার্ষিক প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়ে বিশ্বের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। ১৯৭৭ সালে মহারাষ্ট্রে FIE ফাউণ্ডেশন তাঁকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন।

শিল্পী শ্রীশর্বরী রায়চৌধুরী কেবলমাত্র ভাস্কর নন। একজন সঙ্গীত প্রেমিকও। তিনি গান শুনতে ভালবাসেন। তাঁর ভাণ্ডারে হিন্দুস্থানী রাগ সংগীতের প্রচুর রেকর্ড ও টেপ সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় সংগীতের বিশিষ্ট সংগীতকারদের কণ্ঠ বা রেকর্ড বা অন্য কোন সূত্রে যা যা সংগ্রহ সম্ভব সেগুলি সংরক্ষিত আছে তাঁর ভাণ্ডারে, এ ছাড়াও বর্তমান কালের অনেক বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীদের মূর্তি তিনি তৈয়ারী করেছেন যেগুলি ইতিহাসের দলিল হিসাবে কেবল নয়, শিল্প হিসাবে অতুলনীয়।

অসীম কুমার ঘোষ

[কৈরাজ খাঁ বা আলি আকবরের দরবারী আলাপ শুনতে শুনতে শর্বরীবাবু ঘুমিয়ে পড়েন, কালেংড়া বা ললিত শুনে ঘুম থেকে ওঠেন। এবং এটা প্রতিদিন। এমন সংগীতপ্রেমিক গাইয়েদের মধ্যেও ক'জন আছেন আমি ত' জানি না। [সম্পাদক : উত্তরসূরি]

উমা দেবী

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা উমা দেবী ১৮৯১ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ৫নং বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন, শৈশবে লিলি নামে তাঁকে ডাকা হত। সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত শিল্পকলায় যথেষ্ট অনুরাগিনী ছিলেন। পিতা অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে রঙ্গীন সুতোর নকশী কাঁথা বুনে এবং নানা ধরনের সেলাই এর কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসবিখ্যাত বহু সাংস্কৃতিক উদ্যমের সঙ্গে তিনি ছিলেন যুক্ত। অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পটিতে নাট্যরূপ দিয়ে তাঁরই পরিচালনায় নিজের নাতি নাতনী এবং পল্লীর শিশুদের দ্বারা অভিনয় করিয়ে সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

অবনীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে অবনীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 'ক্ষীরের পুতুল' প্রথম অভিনয় হয় রবীন্দ্রভারতী সোসাইটীর রথীন্দ্রমঞ্চে। পরে রবীন্দ্র সদন, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, সি, এল, টি ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ স্থানে অভিনয় করিয়ে উমা দেবী ভূয়সী প্রসংসা লাভ করেন। উমা দেবী রচিত 'বাবার কথা' গ্রন্থে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বহু স্মৃতি কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সারা জীবনই তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। নানা ধরনের ছুঁচ সুতা দিয়ে বিভিন্ন রকমের নকশী কাঁথা ও ছবি তৈয়ারী করেছেন, আবার কখনও কুরুশ কাটির সাহায্যে লেস বুনছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—চুপ্ চাপ্ বসে থাকা নয়। মৃত্যুর প্রায় দু মাস আগেও তাঁকে দেখেছি আপনমনে কাজ করে যাচ্ছেন। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে পরকে আপন করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্পর্কিত ভাগ্নে এবং শেষ বিলাত যাত্রার সহচর নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উমারাণীর বিবাহ হয়। একমাত্র কন্যা রবীন্দ্র সঙ্গীত খ্যাত মেনকা ঠাকুর পাঁচ পুত্র এবং অন্যতম শুভ মুখোপাধ্যায়। সাতাশী বছর বয়সে ১৯৭৮ সালের ৩০শে মে মঙ্গলবার তিনি পরলোকগমন করেন।

নির্মল দে

উদয়ভূষণ ভট্টাচার্য

উদয়ভূষণ ভট্টাচার্যকে অবহেলিত খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ সঙ্গীতের নবরূপকার বলা যেতে পারে। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টায় ধ্রুপদসঙ্গীতের বিশিষ্ট ধারাটি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্যই সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

উদয়ভূষণ ভট্টাচার্য বাংলা ১৩২৩, ইং ১৯১৬ সালে উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকোর নিকটবর্তী পৈত্রিক বাসভবনে জন্মলাভ করেন। পিতা সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য মহাশয়ের আদি বাড়ী বর্ধমান জেলার কাটোয়া—আমদপুর অঞ্চলের মিত্রটিকুরী গ্রামে। কৃষ্ণধনবাবু বাল্যকালেই পিতার সঙ্গে কলকাতার বাড়ীতে আসেন। তৎকালের বিখ্যাত খেয়াল ও ঠুংরী গায়ক জগদীশ মিশ্র মহাশয় এই বাড়ীতেই বাস করতেন। মিশ্র মহাশয়ের নিকট বিশিষ্ট গায়কবাদক ও গুণীজনের আগমন ছিল। প্রায়ই উক্ত বাড়ীতে সঙ্গীতের আসর হ'ত। কৃষ্ণধনবাবু ঐ সমস্ত গুণীদের সঙ্গীত শুনবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই থেকে সঙ্গীতের প্রেরণা পেয়ে শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহী হন। কিন্তু গায়ক মিশ্র মহাশয় কার্যবশতঃ ঐ বাড়ী ছেড়ে সুদূর নেপাল দেশে চলে যাওয়ায় তাঁর কাছে তালিম নেওয়া সম্ভব হয় নি।

কৃষ্ণধনবাবুর পিতা রামচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় পুত্রের সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ দেখে অবশেষে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শিক্ষার জন্য পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী তৎকালে একাধারে ধ্রুপদী, বীণকার এবং বহুভাষায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পুত্রের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গুরুর অশেষ কৃপায় শিক্ষালাভ করে কৃষ্ণধনবাবু সুকণ্ঠ ও গায়কীর জন্য অল্পদিনেই সুধীসমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করেন।

খাণ্ডারবাণী ঘরানার ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রচার ও শিক্ষার জন্য ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেন এবং 'রাগ পরিচয়' নামে ৭ম খণ্ড পর্যন্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ধীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রচেষ্টার সঙ্গে একটি মাত্র খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। নানা কারণে অবশিষ্ট ছ'টি খণ্ড এখনও অপ্রকাশিত।

উদয়ভূষণ পিতার চতুর্থ পুত্র। শৈশব থেকেই সঙ্গীতের পরিবেশের মধ্যেই বড় হ'ন। পিতা কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শিক্ষা লাভ

করেন। পিতার অবর্তমানে 'ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের' পরিচালন ভার গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন।

খাণ্ডারবাণী ঘরানার ধ্রুপদ সঙ্গীত রীতিকে তিনি সুমধুর বাণী সম্বলিত ও মাধুর্য দিয়ে এক নতুন শৈলীর উদ্ভাবন করেছিলেন। সমবেত কণ্ঠে ধ্রুপদ সঙ্গীত পরিবেশন এবং পৃথক পৃথক কণ্ঠে সুরের বিন্যাস, বাট-বাটোয়ারা ও তালের বৈচিত্র্য সব মিলিয়ে এক অপূর্ব সৃষ্টি—যা সুধী সমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উদয়ভূষণ ১৯৫২ সালে নেপাল সঙ্গীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন। নেপাল রাজদরবারের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উদয়ভূষণ নিজে ধ্রুপদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং ছাত্রছাত্রীরাও উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তৎকালের নেপালের মহারাজা ত্রিভুবননারায়ণ এবং সমবেত সুধীজনের ভূয়সী প্রসংসা লাভ করেন।

বারানসী সঙ্গীত সম্মেলনেও খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিনি খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ সঙ্গীত প্রচারের জন্য তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, বারানসী ইত্যাদি বহু স্থানে সঙ্গীতানুষ্ঠান করে অকুণ্ঠ প্রসংসা লাভ করেন। আকাশবাণীর সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। আকাশবাণী পরিচালিত ধ্রুপদ সঙ্গীতের বহু অনুষ্ঠানে উদাহরণ স্বরূপ তত্ত্বগত বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের পরীক্ষক হিসাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। উদয়ভূষণ শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন। অল্পকাল রোগ ভোগের পর উদয়ভূষণ কলকাতার বাসভবনে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, শনিবার রাত্রি ১০-৪৫ মিনিটে ৬২ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

নির্মল দে

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।